চাঁদমামা
সেরা উপন্যাস সমগ্র

চাঁদেমামা

সেরা উপন্যাস সমগ্র

১

সম্পাদনা

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

Chandmama Sera Uponash Samagra vol 1

প্রথম প্রকাশ : অগাস্ট ২০২১

সম্পাদক : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ : কামিল দাস

ফ্যালকন-গ্রুপ এর পক্ষে সঞ্জয় কুমার সিং ও সঞ্জীব কুমার সিং কর্তৃক ৮১/বি, ব্লক সি, নজফগড় রোড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, নয়াদিল্লী, ১১০০১৫ থেকে প্রকাশিত
মুদ্রক : ফ্যালকন ডিজিটাল, নয়াদিল্লী, ১১০০১৮

সূচি

যক্ষপর্বত

কয়েক হাজার বছর আগের কথা। নর্মদা নদী তীরের অরণ্যসমূহে পাহাড়ি জাতের লোকেরা বাস করত। ওদের মধ্যে এক এক জাতের লোকের একজন করে নেতা অথবা রাজা থাকত। সেই সবাইকে পরিচালনা করত। ওদের মধ্যে ঐক্যমত না থাকায় ওরা একের বিরুদ্ধে অন্যে লড়তে লাগল।

ওই পাহাড়িদের একটি অংশ গণ্ডক জাতি নামে খ্যাত ছিল। সেই অরণ্যের পাহাড়ের একটিতে অরণ্যপুরম নামে এক বড়ো জনপদ ওরা গড়ে তুলল। গণ্ডারদের ভালো শিক্ষা দিয়ে তাদের চাষ-আবাদের কাজে এবং বাহন হিসেবে ব্যবহার করত। চাষের কাজে এবং বোঝা বওয়ানোর কাজে ব্যবহার করত বলেই ওদের নাম হয়েছিল গণ্ডক জাতি।

ওই গণ্ডক জাতের নতুন রাজা হল এক যুবক। তার নাম অরণ্যমাল্লু। সেই রাজাকে হটানোর জন্য গণাচারি নামে একজন ভীষণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দু-জন ক্ষত্রিয় যুবকদের সাহায্যে অরণ্যমাল্লু ওই গণাচারির ছলচাতুরীর কথা প্রচার করিয়ে তাকে বাঘের মুখে ঠেলে দেয়।

গণাচারিকে মেরে ফেলার পর অরণ্যমাল্লু নিশ্চিন্তে রাজ্য শাসন করছিল। কোনো বাধা নেই। নিজের ইচ্ছেমতো চলছিল। আগে যে গণ্ডক জাতি শুধু শিকার করেই পেট চালাত আজ তারা চারদিকের জমিতে চাষ-আবাদ করছে। ভুট্টা, যব, গম প্রভৃতির চাষ করতে লাগল।

অরণ্যমাল্লুর সিংহাসনে বসার এক বছর পূর্ণ হল। সেদিন মহোৎসব পালনের আয়োজন করল গণ্ডক জাতের লোকেরা। যুবকেরা বর্শা, বল্লম ঘোরাতে ঘোরাতে নানান খেলা দেখাতে লাগল। নানান ধরনের লাঠি খেলা, কুস্তি প্রভৃতি অনেক রকমের খেলা দেখাতে লাগল। যুবক-যুবতি, ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি সবাই সেই উৎসবে মেতে আছে। স্বয়ং অরণ্যমাল্লু উঁচু জায়গায় খোদাই করা আসনে বসে সেইসব উপভোগ করছে।

সেই উৎসব মুখরিত সময়ে দু-জন গণ্ডক জাতের লোক বাহনে চড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বাহন থেকে নেমে দু-হাতে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে অরণ্যমাল্লুর দিকে এগোতে থাকল।

অরণ্যমাল্লুর মন্ত্রীর নাম শিলামুখী। ওই দু-জনকে রাজার দিকে ধেয়ে যেতে দেখে ইশারায় ওদের কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? এমনভাবে ছোটাছুটি করছ যেন

কোথাও আগুন লেগেছে! এমন উৎসব আনন্দের সময় রাজাকে বিরক্ত করতে ছোটাছুটি করছ কেন? আমি কি নেই এখানে? কী ব্যাপার বল?' রেগে গিয়ে বলল মন্ত্রী।

মন্ত্রীর প্রশ্ন শুনে আগন্তুকরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। ওই দু-জনের মধ্যে লম্বা লোকটা গলা ঝেড়ে বলল, 'পাহাড়ের পাদদেশে আমাদের চাষের খেতে যে ভুট্টা, যব ফলেছে সেসব নতুন লোক এসে কেটে ফেলছে। ওরা আমাদের চেনাজানা আদিবাসীদের মতো দেখতে নয়। ওদের মাথায় বড়ো বড়ো পাগড়ি। ওদের সারা শরীর কাপড়চোপড়ে ঢাকা রয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের জিনিস হল এই অরণ্যের গোটা তল্লাটে যে ধরনের জন্তু কোনোদিন নজরে পড়েনি ওরা সেই ধরনের বিরাট বিরাট জন্তুর পিঠে চড়ে এসেছে। ওই জন্তুর পিঠেই কাটা ভুট্টা সব চাপাচ্ছে।'

'নতুন ধরনের জন্তুগুলো কেমন দেখতে?' বলল মন্ত্রী শিলামুখী।

'ওই জন্তুগুলো হাতির মতো উঁচু। হাতির চোখের মতো ওদের চোখ। ঘাড়গুলো বকের ঘাড়ের মতো এদিক-ওদিক ঘোরে। পিঠের ওপর ঢিপির মতো কী যেন আছে।' বলল ওদের মধ্যে বেঁটে লোকটা।

মন্ত্রী এবং ওদের দু-জনের মধ্যে কথা চলছে। অন্যেরা কৌতূহলবশত সে-কথা শোনার চেষ্টা করে। আস্তে আস্তে ওদের ঘিরে অনেকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওই অদ্ভুত জন্তুর বর্ণনা কানে যেতেই ওদের অনেকে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। এক কান দু-কান হয়ে কথাটা ছড়িয়ে গেল। বলাবলি করতে লাগল ওরা, 'কারা যেন অদ্ভুত জন্তুর উপর চেপে এসে আমাদের যব, ভুট্টা সব কেটে নিয়ে যাচ্ছে।' প্রত্যেকে কথা বলায় একটা হইচই শুরু হয়ে গেল। উৎসবের আনন্দ ক্রমশ যেন মিইয়ে যাচ্ছে। ওদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে রাজা আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এত হইচই কীসের? কী হয়েছে? মন্ত্রী শিলামুখী কোথায়?' বলল গর্জন করে।

শিলামুখী ওই অদ্ভুত জন্তুগুলোকে যারা দেখেছে সেই দু-জনকে নিয়ে রাজার কাছে এল। ওদের কাছে যা শুনল তা রাজাকে জানাল।

'আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফলানো ফসল লুণ্ঠনকারীরা নিয়ে যাচ্ছে দেখে হাঁ করে বসে আছ। হাতিয়ার এখনও হাতে তুলে নাওনি। নামেই দেখছি আমি এক রাজা, মন্ত্রীও জুটেছে তেমনি! যতসব বোকাদের দেশ!' বলল অরণ্যমাল্লু।

অরণ্যমাল্লুর কথা শেষ হতেই শিলামুখী গণ্ডক জাতের লোকের দিকে ঘুরে জোরে জোরে বলল, 'এই আনন্দ উৎসব এখনকার মতো বন্ধ হোক। আমাদের খেতের ফসল লুণ্ঠনকারীরা কেটে নিয়ে যাচ্ছে। ওদের হটিয়ে দিয়ে আমাদের ফসল রক্ষা করতে হবে।'

তৎক্ষণাৎ গণ্ডক জাতের লোকেরা বর্শা, বল্লম, ছোরা হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। একজন অনুচরের আনা গণ্ডারে চড়ে মন্ত্রী শিলামুখী সামনে এগিয়ে গেল।

রাজা অরণ্যমাল্লু ওদের উৎসাহ দিতে দিতে জোরে জোরে বলল, 'ওই লুণ্ঠনকারীরা যে অদ্ভুত জন্তু এনেছে তাদের আপনারা ভয় পাবেন না। আমাদের বাহন গণ্ডারের চেয়ে হিংস্র জন্তু পৃথিবীতে আর একটিও নেই। ওই লুণ্ঠনকারীদের কয়েক জনকে বন্দি করে আনুন। ওদের কাছ থেকে ওই দুরাত্মাদের সমস্ত খবর জানতে পারব।' বলল রাজা।

'জয় অরণ্য মাতা কী জয়! জয়! রাজা অরণ্যমাল্লুর জয়!' এই রণধ্বনি দিতে দিতে গণ্ডক জাতের লোকেরা ধাবিত হল ওই পাহাড়ের পাদদেশে।

ওরা সবাই নিজেদের ফসল ফলানো খেতে পৌঁছে প্রত্যেকে কেমন যেন হতবাক হয়ে গেল। যা ওরা দেখছে তাতেই ওদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাচ্ছে। লুণ্ঠনকারীদের সংখ্যা পঁচিশ কি তিরিশ। তাদের মধ্যে কয়েক জন ভুট্টা ও যবের গাছ কাটছে। কয়েক জন এক মুহূর্ত নষ্ট না করে সেই ফসল তুলছে। ওই বিরাটকায় জন্তুর ঢিপিওয়ালা পিঠে। আর চার-পাঁচ জন সেই বিরাটকায় অদ্ভুত জন্তুর পিঠে চড়ে খেতের এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত ছোটাছুটি করছে। ওই জন্তুগুলো ঘাড় উঁচু-নীচু করতে করতে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ছোটাছুটি করছে।

লুণ্ঠনকারী আর তাদের বাহক জন্তুদের দেখে গণ্ডক জাতের লোক খুব ভয় পেয়েছে। তার চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে লুণ্ঠনকারীরা গণ্ডারের পিঠে চেপে আসা গণ্ডক জাতের লোকদের দেখে।

লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে ওই অদ্ভুত জন্তুর উপর উঠে বসে থাকাদের মধ্যে একজন হাতের বর্শা উঁচিয়ে ধরে চিৎকার করে বলল, 'এই, যারা আসছে ভয়ংকর জন্তুর উপর চড়ে তাদের দিকে আর ওই জন্তুদের দিকে ভালো করে তাকান। যারা গণ্ডারদের শিক্ষা দিয়ে বাহনের কাজে ব্যবহার করছে তারা যে কত বড়ো সাহসী হতে পারে বুঝতে পারছেন।'

সাথীদের একজনের ঘোষণা শুনে যারা যে কাজে লেগেছিল তারা একবার মাথা তুলে তাকাল। ওরা দেখতে পেল গণ্ডারের উপর চেপে সবার সামনে আসছে মন্ত্রী শিলামুখী, তার কিছুটা পেছনে আসছে গণ্ডারের পিঠে চড়ে আরও অনেকে। সবার পেছনে আসছে পায়ে হাঁটা লোক। ওরা ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছে।

লুণ্ঠনকারীদের একজন তাড়াতাড়ি ওই বিচিত্র জন্তুর উপর উঠে গণ্ডক জাতের লোকের দিকে তাকাল। ওদের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল ওরা যেন আক্রান্ত। প্রত্যেকে কেমন যেন হুড়োহুড়ি করছে। গণ্ডারের উপর চড়ে কেউ ঠিক এগোচ্ছে না। সে চিৎকার করে নিজের লোককে বলল, 'হে উষ্ট্রবীরেরা! আমাদের কোনো ভয় নেই। আমাদের দেখে ওই

গণ্ডক জাতের লোক যেন একেবারে মূর্ছা যাচ্ছে। চেয়ে দেখ, একজনও সাহসের সাথে ঘৃণাভরে দ্রুত এগিয়ে আসছে না। প্রত্যেকে কেমন যেন নিজেদের মধ্যে গুঁতোগুঁতি করছে। এই হল মোক্ষম মুহূর্ত। আমার সাথে চার-পাঁচ জন এসো। চারিদিক থেকে ওদের উপর বর্শা ছুঁড়ে ওদের ছত্রভঙ্গ করে ফেলব।' বলল ওদের নেতা।

নেতার ডাক শুনেই চার জন উটের পিঠে চড়ে বল্লম নিয়ে এগিয়ে গেল। ওই ক-জনকে ওভাবে এগোতে দেখেই মন্ত্রী শিলামুখী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অনুচরদের বলল, 'এই অদ্ভুত বিরাট উঁচু জীবের উপর বসে থাকা লুণ্ঠনকারীর দল উপর থেকে বল্লম ছুড়ে সহজেই আমাদের গেঁথে ফেলতে পারে। আমরা বরং একটু পেছিয়ে গিয়ে গাছের আড়ালে চলে যাই। লুণ্ঠনকারীরা আমাদের তাড়া করতে করতে আসবে। তখন আমাদের লোক গাছের উপর থেকে বর্শা ছুড়ে সহজেই ওদের জব্দ করতে পারবে। আমাদের অনুচরদের গাছে উঠতে বলা হোক।' চিৎকার করে হুকুম দিল মন্ত্রী শিলামুখী।

শিলামুখী তার অনুচরদের এই নির্দেশ অনেক দেরিতে দিল। মন্ত্রীর কথা কানে যেতেই যারা গণ্ডারের পিঠে বসেছিল তারা গণ্ডারের মুখ পেছনের দিকে ফিরিয়ে বলল, 'যারা পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করতে এসেছ তারা সব গাছে উঠে পড়। ওই লুণ্ঠনকারীরা গাছের নীচে আসতেই তাদের বল্লম দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলবে।' ওরা চিৎকার করেই বলতে লাগল।

গণ্ডক জাতের কয়েক জন গাছের উপর উঠতেই লুণ্ঠনকারীদের নেতা অবস্থা বুঝে বলল, 'ওহে যব আর ভুট্ট কাটা বন্ধ করে এখন যে-যার বাহনে ওঠো। আমি কয়েক জনকে নিয়ে এই গণ্ডারের উপর বসে থাকা লোকদের ক্ষমতা একটু যাচাই করে দেখছি। আর বাকি যারা আছ তারা ওদের মধ্যে যারা গাছে উঠে বসে আছে তাদের বর্শা দিয়ে খোঁচা মেরে নীচে ফেলে দাও।' চিৎকার করে হুকুম দিল নেতা।

শিলামুখী নিজের গণ্ডারটার মুখ পেছনের দিকে ঘোরাতে যাবে এমন সময় হঠাৎ লুণ্ঠনকারীদের নেতা এবং তার অনুচরেরা তাকে ঘিরে ফেলল। শিলামুখী ধৈর্য ধরে লুণ্ঠনকারীদের নেতার আক্রমণ নিজের বর্শা দিয়ে রুখল।

জয় অরণ্য মাতা! সবাই গণ্ডারদের অরণ্যের দিকে ছোটাও!' চিৎকার করে বলল।

শিলামুখী নিজের প্রাণরক্ষার জন্য এত ব্যস্ত ছিল যে অন্যদিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা আর দেখতে পারেনি। ওদিকে গাছে উঠতে না উঠতেই গণ্ডক জাতের লোকেরা আক্রান্ত হল। লুণ্ঠনকারীরা তাদের আক্রমণ করতে থাকল। বাকি কয়েক জন গণ্ডক জাতের লোক মৃত্যুভয়ে আর্তনাদ করতে করতে সোজা অরণ্যপুরমের দিকে ধাবিত হল।

শিলামুখীও কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে পেছন দিক থেকে তাড়া করতে থাকা লুণ্ঠনকারীদের কাছে ধরা না দিয়ে গাছের আড়াল দিয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু লক্ষ করল লুণ্ঠনকারীরা তার পিছু ছাড়ছে না। তাকে ঘিরে ফেলছে। তখন অগত্যা চিৎকার করে নিজের লোককে শিলামুখী বলল, 'আর আমরা এই লুণ্ঠনকারীদের তাড়াতে পারব না। অরণ্যপুরমের দিকে এখন পালানোই শ্রেয়।'

সেইসময় গাছের ডালের উপর থেকে গর্জন শোনা গেল, 'মহামন্ত্রী শিলামুখী! পালিয়ো না। তোমার গণ্ডারটাকে পেছনদিকে ফেরাও। ওই গণ্ডারটাকে তোমার পেছনে যে উট আসছে তার সাথে ভেড়াও। উটকে কাত করে ফেলতে পারে গণ্ডার। গণ্ডারের গুঁতো সহ্য করার মতো ক্ষমতা কোনো জন্তুর নেই। ইন্দ্রের ব্রজ আছে গণ্ডারের শিং-এ। গণ্ডারের ক্লান্তি নেই।' কথাগুলো পরিষ্কার শুনতে পেল শিলামুখী।

ওই কণ্ঠস্বর শিলামুখীর চেনা। ওই কণ্ঠস্বর তার দলের ক্ষত্রিয় যুবক স্বর্ণাচারির। কিন্তু ততক্ষণে শিলামুখীর মধ্যে পালটা আক্রমণ করার সামান্যতম সাহসও ছিল না। ওই কথা

শুনে নিজের গণ্ডারটাকে আরও বেশি তাড়া দিয়ে নিজের অনুচরদের পেছনে পেছনে অরণ্যপুরমে পালিয়ে গেল মন্ত্রী শিলামুখী।

শিলামুখীকে উদ্দেশ্য করে স্বর্ণাচারি যা বলল তা লুণ্ঠনকারীদের নেতার কানে গেল। নেতা তৎক্ষণাৎ ভীষণ আগ্রহের সাথে ওই গাছের নীচে গিয়ে বলল, 'কে রে গাছে! আমার শত্রুকে কৌশল শেখাচ্ছে। আমি কে তা জানো?' হুংকার তুলে বলল নেতা।

'আমার নাম স্বর্ণাচারি। পদ্মপুরের শাস্ত্রজ্ঞ। আজন্ম বিনয়ী জন্তু উটকে দেখেই মহা পরাক্রমশালী জন্তু গণ্ডারকে ছুটতে দেখে প্রশংসা করতে পারলাম না। তাই শিলামুখীকে ওই পরামর্শ দিয়েছি। আমার কাছে অবশ্য উষ্ট্র জাতের লোক আর ওই গণ্ডক জাতের লোক সমান মিত্র।' বলল স্বর্ণাচারি গাছের ডালের উপর বসে।

'আচ্ছা, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমার ঘটে বেশ বুদ্ধি আছে। এক্ষুনি গাছ থেকে নেমে আসবে না এই বল্লম ছুড়ে মারব?' বলতে বলতে লুণ্ঠনকারীদের নেতা উটের উপর থেকে বল্লম উঁচিয়ে ধরল।

দুই

লুণ্ঠনকারীদের নেতার মুখের ভাব এবং বল্লম তুলে ধরায় তার ওই রুদ্ররূপ দেখে স্বর্ণাচারি ভাবল যে তার মৃত্যু নিশ্চিত। গণ্ডক জাতির লোকের প্রাণ হাতে করে অরণ্যপুরের দিকে টেনে ছুটে পালানোর দৃশ্য দেখে স্বর্ণাচারি ভাবল তার পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। তার গাছ থেকে নামলেও বিপদ আবার না নামলেও বিপদ।

'গাছ থেকে ঝটপট নামবে না দেব বল্লমটা ছুড়ে?' লুণ্ঠনকারীদের নেতা দাঁতে দাঁত ঘষে বলল।

এই হুঁশিয়ারি পেয়ে স্বর্ণাচারি ভয়ে কাঠ হয়ে পরক্ষণে কাঁপতে কাঁপতে গাছ থেকে আস্তে আস্তে নামতে নামতে বলল, 'আমাকে অহেতুক মেরে ফেলে পাপের ভাগী হবেন না। আমি আগেই বলেছি যে আমি একজন শাস্ত্রজ্ঞ। রাজমহল থেকে শুরু করে কুঁড়ে ঘরের লোক পর্যন্ত আমাকে বাস্তু শাস্ত্রজ্ঞ হিসেবেই চেনে। ছোটো-বড়ো সবরকমের বাড়ি নিখুঁত নির্মাণের ব্যাপারে আমি দক্ষ।'

এই কথা লুণ্ঠনকারীদের নেতা শুনে হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'তোমার কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কি ভেবেছ যে আমি এখানে তোমার খোঁজ করতে এসেছি? আমি মহল বানাতে চাই? মহল বানানোর লোক আমি আর পাইনি? আহাম্মক কোথাকার, গাছ থেকে নাম ঝটপট। হুঁ!'

স্বর্ণাচারি চুপচাপ গাছ থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। লুণ্ঠনকারীদের নেতা উটের উপর বসেই তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে দেখে তো গণ্ডক জাতের লোকের

মতো লাগছে না। তুমি এখানে জঙ্গলে পাহাড়ে কী করছ?'

'মশাই, আপনার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না। আপনি ঠিকই ধরেছেন যে আমি গণ্ডক জাতের লোক নই। আমি পদ্মপুরের অধিবাসী। গৃহনির্মাণ আমার পেশা, আমি যন্ত্রপাতি বানানোর কলাকৌশল জানি। ঘরবাড়ি বানানোর কাজ যখন থাকে না তখন যন্ত্রপাতি বানাই। যন্ত্রপাতি দিয়ে আমি বিঘ্নেশ্বর পূজারির জন্য একটি কৃত্রিম হাতি বানিয়েছি। কিন্তু দু-জন ক্ষত্রিয় যুবক আমার রহস্য জেনে নিল। অগত্যা আমাকে নিজের নগর ছেড়ে এই জঙ্গলে চলে আসতে হল।' স্বর্ণাচারি বলল।

'আরে, তুমি কি নিজেকে এক মহাপুরুষ ভেবে বসে আছ নাকি? তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার জীবনী জানতে এসেছি? তুমি তোমার জীবনের সব কথা আমাকে বলছ কেন? আমি তো তোমাকে শুধু জিজ্ঞেস করেছি এখানে থাকার কারণ। তুমি এখন যে নগরের নাম করলে সে নগরের লোক আর একজনও কি এখানে আছে?' উট থেকে নেমে লুণ্ঠনকারীদের নেতা স্বর্ণাচারির বুকে বল্লম ঠেকিয়ে রাখে।

স্বর্ণাচারি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'মশাই, আমাকে মারবেন না। আমি সব বলছি। এখান থেকে অল্প দূরেই দু-জন যুবক একটা কুঁড়ে ঘর বানিয়ে বাস করে। তার পাশেই পাথর দিয়ে বানানো বাড়িতে বিঘ্নেশ্বর পূজারির সাথে আমিও থাকি।'

ক্ষত্রিয় যুবকদের কথা শুনে লুণ্ঠনকারীদের নেতা স্বর্ণাচারির দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল, 'এখান থেকে অল্প দূরেই ক্ষত্রিয় যুবকরা ঘর বানিয়ে আছে? ওরা বসে বসে তপস্যা করছে না তো?'

'ওরা তপস্যা করবে কোন দুঃখে? ওরা যুদ্ধ সম্পর্কে নিপুণ, জঙ্গলে শিকার খেলা, প্রয়োজন হলে দুষ্টের দমন করা প্রভৃতি ওদের দৈনন্দিন কাজ।' স্বর্ণাচারি ভীষণ উৎসাহের সাথে এ-কথা বলল।

'ও তাই নাকি? বলে লুণ্ঠনকারীদের নেতা অট্টহাস্যে বলল, 'এখন আমরা যে গণ্ডক জাতির ফসল কেটে নিয়েছি একি দুষ্টদের কাজ হল? এই ঘটনার কথা ওই ক্ষত্রিয় যুবকেরা জানতে পারলে ওরা কী করবে?'

তারপর স্বর্ণাচারি বলল যে লুণ্ঠন করা অবশ্যই দুষ্টদের কাজ আর এই কথা জানার পর ক্ষত্রিয় যুবকেরা নিশ্চয় চুপ করে বসে থাকবে না। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল এভাবে কথা বলা তো জেনে-শুনে বিপদ ডেকে আনা। তাই সে ভাঙা স্বরে বলল, 'মশাই, আপনি ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কিত এমন সব জটিল প্রশ্ন করছেন যে কী বলব ভেবে পাচ্ছি না। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।'

'তুমি বেঁচে গেলে।' লুণ্ঠনকারীদের নেতা বলল। কিছুক্ষণ পরে আবার বলল, 'তুমি ক্ষত্রিয় যুবকদের কুঁড়ে ঘরের কথা বলে ছিলে, ওদের ঘর দেখাবে চল তো। এত ভালো লোকের এই জঙ্গলে থাকা আমাদের মতো লোকের পক্ষে বিপদজনক।'

স্বর্ণাচারি লুণ্ঠনকারীদের নেতার কথার মানে বুঝতে পারল। ভাবল, এই লোকটা ওই দু-জন ক্ষত্রিয় যুবকদের খতম করতে চাইছে, আমি এখন আগেভাগে ওদের সাবধান করি কী করে!

'কী ভাবছ? পালানোর চেষ্টা করছ নাকি? সাবধান। তোমার বুকে বল্লম গেঁথে সোজা গাছে ঝুলিয়ে দেব।' লুণ্ঠনকারীদের নেতা গর্জে উঠল।

স্বর্ণাচারি ভাবল, এখন শুধু কথা বলে কাল ক্ষেপণ করার চেষ্টা জীবনের পক্ষেও ক্ষতিকর। তাই সে ক্ষত্রিয় যুবকদের কুটিরের দিকে এগোতে লাগল। লুণ্ঠনকারীদের নেতা আবার উটে চড়ে বসে নিজের দুই অনুচরকে সাথে যেতে বলল।

আগে আগে স্বর্ণাচারি হাঁটছে আর তার পেছনে তিন জন লুণ্ঠনকারী যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে ওই চার জন এক কুঁড়ে ঘরের কাছে পৌঁছাল। ফুল আর ফলে ভরা গাছপালার মাঝে এক সুন্দর পর্ণকুটির। ওই কুটিরের চারদিক বেড়া দিয়ে ঘেরা। ওই বেড়ার বাইরে একটি গোরু ছিল।

লুণ্ঠনকারীদের নেতা ওই গোরুকে দেখেই বলল, 'আরে হেই স্বর্ণাচারি, এই গোরুকে দেখে তো মনে হচ্ছে এ বেশ দুধালো গাই। কিন্তু এর বাছুর কোথায়?'

'মশাই, এটা সত্যি দুধালো গাই। বাছুর কুটিরের ওপাশে কোথাও হয়তো চরছে।' স্বর্ণাচারি বলল। এখন তার কাছে একমাত্র ভাবনা, কেমন করে আগেভাগে শত্রুর আগমনের কথা ক্ষত্রিয় যুবকদের জানাবে। কিন্তু লুণ্ঠনকারী গাই বাছুরের প্রশ্ন করে কথায় আটকে রাখছে।

'মশাই, আপনারা এখানেই দাঁড়ান। আমি দেখে আসছি ওই ক্ষত্রিয় যুবকরা ঘরে আছে কি না।' স্বর্ণাচারি যেন নিজের বোকামির পরিচয় দিয়ে বলল।

এই কথা শুনে লুণ্ঠনকারীদের নেতা হেসে বলল, 'তোমার এসব চালাকি আমার কাছে চলবে না। সিন্ধুর রেগিস্তান থেকে শুরু করে এখানকার এই জঙ্গল এবং পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছানোর পথে তোমার মতো অনেককে দেখেছি। তুমি এই বেড়ার কাছে দাঁড়িয়েই চিৎকার করে বল যে আত্মীয় এসেছে! বুঝলে? চিৎকার করে ডাক দাও।'

লুণ্ঠনকারীদের নেতার চাল বুঝতে পারল স্বর্ণাচারি। আত্মীয় এসেছে বলে চিৎকার করলে ক্ষত্রিয় যুবকদ্বয় বিনা অস্ত্রে বাইরে আসবে। তখন ওদের হত্যা করা সহজ হবে। এই কথা

ভেবেই হয়তো লুণ্ঠনকারীদের নেতা ওভাবে ডাকতে বলছে। ওই নেতা যেভাবে বলছে সেভাবে না ডাকলে আবার প্রাণহানি হতে পারে। কী করা যায়?

'হুঁ! এত দেরি করছ কেন? যেভাবে ডাকতে বলছি সেভাবে ডাক!' এ-কথা বলে লুণ্ঠনকারী নেতা স্বর্ণাচারির পিঠে বল্লম ঠেকিয়ে দিল।

স্বর্ণাচারি উচ্চকণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, 'উটের পিঠে চড়ে দূর দেশ থেকে আত্মীয় এসেছেন।' স্বর্ণাচারি এই কথা বলে দু-তিন বার ডাক দিলেও ওই কুটির থেকে কেউ বেরুল না।

তখন স্বর্ণাচারি ভাবল, বিপদ তাহলে কেটে গেছে। বলল, 'আমার তো মশাই মনে হচ্ছে, এই ক্ষত্রিয় যুবকরা শিকার করতে বাইরে গেছে।'

'সন্দেহ যখন আছে আর একবার ডাক।' ওই নেতা বলল।

স্বর্ণাচারি এবার আরও জোরে চিৎকার করে ডাক দিল। কিন্তু কুটির থেকে কেউ বাইরে বেরিয়ে এল না। তখন লুণ্ঠনকারীদের নেতা নিজের এক অনুচরকে আদেশ দিল, উঠে বসেই স্বর্ণাচারির উপর নজর রাখতে। সে যেন পালিয়ে না যায়। তারপর অন্য অনুচরকে নিয়ে নিজে বেড়ার ভেতরে ঢুকে কুটিরের কাছে গেল।

কুটিরের দরজা ঝাঁপ ফেলে বন্ধ করা আছে। দরজা বন্ধ দেখে লুণ্ঠনকারীদের নেতা নিজের অনুচরকে বলল, 'স্বর্ণচারির কথা সত্য। ক্ষত্রিয় যুবক দু-জন কুটিরের ভেতর নেই। ভেতরে গিয়ে দেখে আসি। কোনো দামি জিনিস পেয়ে যেতে পারি।'

তারপর ওরা দু-জনে ঝাঁপ সরিয়ে কুটিরের ভেতরে ঢুকল। কোনো দামি জিনিস তাদের হাতে পড়ল না। দরজার কাছে বাঘ, ভালুক, হরিণ প্রভৃতির চামড়া দেওয়ালের সাথে ঝোলানো ছিল। কুটিরের এক কোণে দুটো বল্লম এবং তির-ধনুক ছিল।

'এরা দু-জনে ভালো তির চালক মনে হচ্ছে। দূর থেকে শত্রু অথবা জানোয়ার হত্যার পক্ষে তিরের মতো জিনিস আর নেই। তির-ধনুক চালানো আমাদেরও তাড়াতাড়ি শিখে নিতে হবে। তুমি ওই তির-ধনুক নিয়ে নাও।' লুণ্ঠন নেতা নিজের অনুচরকে নির্দেশ দিল।

নিজের নেতার নির্দেশ পেয়ে অনুচর এগিয়ে গিয়ে তির-ধনুক তুলে কাঁধে রাখল। লুণ্ঠন নেতা মনোযোগ দিয়ে কুটিরের আনাচেকানাচে ভালো করে দেখল কিন্তু কোনো দামি জিনিস না পাওয়ায় নিরাশ হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

'স্বর্ণাচারি, ক্ষত্রিয় যুবকরা দেখছি কুটিরে খাবার তো দূরের কথা তরিতরকারিও রাখেনি। বাঘ এবং হরিণের চামড়া বাদে হাতির দাঁতও নেই। ওরা কি জঙ্গলী হাতির শিকার করে না?' লুণ্ঠন নেতা জিজ্ঞেস করল।

'এই ক্ষত্রিয় যুবকেরা শুধু খাওয়ার জিনিস বাদে অন্য কোনো জংলি জানোয়ার শিকার করে না। আপনারা যে বাঘের চামড়া দেখেছেন সেই বাঘকেও নিতান্তই আত্মরক্ষার্থে

মেরেছিল।' স্বর্ণাচারি বুঝিয়ে বলল।

'ওহো তাই নাকি! তাহলে তো এরা হাতির দাঁতের দামও জানে না।' লুণ্ঠন নেতা ব্যঙ্গ করে যেন বলল।

এরপর লুণ্ঠন নেতা অনুচরটিকে ইশারায় গোরুটিকে দেখিয়ে বলল, 'উটের দুধ খেতে খেতে মুখ ফিরে গেছে। ওই গাইটাকে দড়ি বেঁধে টেনে আনো। কিন্তু ওর বাছুর কোথায়?' চারদিকে তাকাতে তাকাতে লুণ্ঠন নেতা বলল।

অনুচরটি গোরুর গলায় দড়ি বেঁধে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল উটের কাছে। গোরুও বাঁধন ছেঁড়ার জন্য টান মারতে মারতে আম্বা আম্বা ডাকছিল। ওই ডাক শুনেই কুটিরের পেছন থেকে বাছুর ছুটে এল।

'বা! আমি যা ভেবেছি তাই হল। এখন এই স্বর্ণাচারিকে উটের উপর বসাও।' লুণ্ঠন নেতা বলল।

এই কথা কানে যেতেই স্বর্ণাচারি থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'মশাই, আমাকে আপনারা নিয়ে যাবেন না। আমি এখানে ভালোই আছি। আমার বাকি জীবনটা এখানেই কাটাতে দিন।'

'ওসব চলবে না। আমরা যেখানে থাকি ওখানে ভালো ভালো ঘরবাড়ি বানাতে হবে। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা এই দেশের চার-শো ক্রোশ দখল করে আমাদের শাসন চালাতে চাই। এখন যেখানে মহল বানাতে তোমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই স্থান হবে আমাদের রাজধানী। আমরা চাই তোমাকে আমাদের দরবারের বাস্তুশাস্ত্রী বানিয়ে সম্মানিত করতে।' লুণ্ঠন নেতা যেন সব বুঝিয়ে বলল।

'মশাই, আমি এই ধরনের কোনো পদ চাই না। আমি এখানে বেশ আছি...'

স্বর্ণাচারির কথা শেষ হতে-না-হতেই লুণ্ঠনকারী তার ঘাড় ধরে উটের উপর বসিয়ে দেয়। স্বর্ণাচারি অগত্যা আর্তনাদ করে ওঠে, 'শত্রুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর! রক্ষা কর!'

কুটিরের দিকে যেতে যেতে বিঘ্নেশ্বর পূজারি নিজের মিত্র স্বর্ণাচারির আর্তনাদ শুনে ভাবল স্বর্ণাচারি বোধ হয় কোনো বিপদে পড়েছে! এসব ভেবে পূজারি তাড়াতাড়ি কুটিরের দিকে এগোল। বিঘ্নেশ্বর দেখল স্বর্ণাচারিকে উটের পিঠে বসানো হয়েছে আর গোরুকে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বিঘ্নেশ্বর পূজারির মনে হঠাৎ এক বুদ্ধি জাগল। ক্ষত্রিয় যুবকরা একটি সিংহশাবককে বাচ্চা বয়সে এনে পুষছিল। ক্ষত্রিয় যুবকরা যখন কুটিরে থাকে তখন সেই সিংহশাবক ছাড়া

থাকে। শাবকটি আপন খেয়ালে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু যুবকেরা যখন কুটিরে থাকে না তখন ওরা ওই সিংহশাবকটিকে কুটিরের পেছন দিকে বাঁশের খাঁচায় রেখে দিয়ে যায়।

এখন বিঘ্নেশ্বর পূজারির মনে হল, সিংহশাবককে ছেড়ে দিলে হয়তো স্বর্ণাচারি এবং গোরু ছাড়া পাবে। গোরু এবং সিংহশাবকের মধ্যে ভালো ভাব ছিল। গোরুর আম্বা রব সিংহশাবককে আরও উত্তেজিত করতে পারে। ফলে লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে তাকে লেলিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

বিঘ্নেশ্বর পূজারি ছুটে গিয়ে কুটিরের পেছনের বাঁশের খাঁচা থেকে সিংহশাবককে মুক্ত করে দিল। খাঁচার বাইরে বেরিয়েই সিংহশাবক লুণ্ঠনকারীদের দিকে ধাবিত হল। তাকে দেখেই উট ঘাবড়ে গিয়ে লাফিয়ে উঠল। লুণ্ঠনকারী থতমত খেয়ে হঠাৎ পড়ে গেল নীচে। সিংহশাবক একলাফে ওই লুণ্ঠনকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলা টিপে ধরল।

তিন

হঠাৎ সিংহ লুণ্ঠনকারীদের একজনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ায় লুণ্ঠনকারীদের নেতা চমকে উঠল। লুণ্ঠন নেতা মুহূর্তকাল ভেবে হাতের বল্লমটি উঁচুতে তুলে ধরে সিংহের দিকে ছুড়ে মারল। বল্লমটি সিংহের এক বিঘত দূরে মাটির গভীরে গেঁথে গেল। ফলে, সিংহ ভীষণভাবে রেগে গিয়ে প্রবল বিক্রমে লুণ্ঠনকারীর গলা টিপে ধরে এদিক-ওদিক টেনে-হেঁচড়ে জমিতে ফেলে রগড়াতে লাগল।

লুণ্ঠনকারীদের নেতা একবার চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখতে পেল, তার একজন অনুচর সিংহের কবলে পড়েছে আর ওই অনুচরের উট ক্ষত্রিয় যুবকদের কুটিরের পিছনের দিকের জঙ্গলে পালাচ্ছে। অন্য অনুচরের উটের উপর স্বর্ণাচারিকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। স্বর্ণাচারি আর্তনাদ করে উঠল, 'আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!'

লুণ্ঠন নেতা বুঝতে পারল যে সিংহের কবল থেকে সে তার অনুচরকে রক্ষা করতে পারবে না। সিংহের মুখে পড়া লুণ্ঠনকারীটি দু-এক বার চেঁচিয়েই চুপ মেরে গেল। তারপর

সিংহ তাকে দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে, ছেড়ে দিয়ে, পিছনের পা দুটো মুড়ে বসে একবার ওই লুণ্ঠন নেতার দিকে আর একবার ওই গোরুটির দিকে তাকাতে লাগল।

সিংহের চোখ আর তার ভাবগতিক দেখে লুণ্ঠন নেতা ভাবল, এরপর হয় তার উপর নয় তার অনুচরটির উপর সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়বে। পরক্ষণেই সে ভাবল সিংহ খাবার জন্য গাইটার উপরই আগে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই, তার ধারণা হল গাইটাকে ছেড়ে দিলে তারা সিংহের কবল থেকে মুক্তি পাবে।

এ-কথা ভেবে লুণ্ঠন নেতা ওই অনুচরটিকে বলল, 'আরে এই হাঁদা, তোর বোকামির জন্যই আমাদের একজন অনুচর সিংহের মুখে প্রাণ হারাল। সিংহ গর্জন শোনার সাথে সাথে তুই গোরুটাকে ছেড়ে দিলে এত বড়ো বিপদ ঘটত না। সিংহ গোরুটাকে মুখে তুলে নিয়ে সোজা জঙ্গলে চলে যেত। এখন তুই গোরুটাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দে। তোর ঘটে যে কিছু আছে তার প্রমাণ দে।' আর্তনাদকারী স্বর্ণাচারির দিকে তাকিয়ে লুণ্ঠন নেতা বলল, 'আরে এই বাস্তুঘুঘু! তুই চুপ করবি না তোকে উটের পিঠ থেকে সিংহের মুখে ঠেলে ফেলে দেব?' বলল লুণ্ঠন নেতা।

এই প্রশ্ন শুনে স্বর্ণাচারির মনে দারুণ আনন্দ হল। ক্ষত্রিয় যুবকদের পোষা সিংহ তাকে ভালোভাবেই জানে, চেনে। সেই সিংহ তাকে কিছুই করবে না। তাই স্বর্ণাচারি ভীষণ ভয় পাওয়ার মতো অভিনয় করে বলল, 'হে উষ্ট্রনায়ক, আমাকে সিংহের মুখের কাছে ছুড়ে দাও। আমি সিংহের পেটে যদি চলে যাই ক্ষতি নেই অন্তত সেইভাবেও জন্মভূমিতে আমি মরতে পারব। জন্মভূমির চেয়ে প্রিয় জিনিস আর কী আছে!

সেই মুহূর্তে লুণ্ঠন নেতার মনে হল, স্বর্ণাচারিকে উটের উপর থেকে নীচে ফেলে দেওয়াই ভালো হবে, কিন্তু পরক্ষণেই স্বর্ণাচারির মৃত্যুর কথা উঠতেই পাহাড়ের পাদদেশে তার রাজধানী তৈরি করার কথাও মনে পড়ল। সেইজন্য সে তার অনুচরকে বলল, 'ওরে হেই, ওই বাস্তুঘুঘুটিকে সিংহের মুখে এখানে ঠেলে দিসনি। আমরা যে নগরী তৈরি করতে যাচ্ছি সেটা তৈরির ব্যাপারে ওর সাহায্য ভীষণভাবে প্রয়োজন হবে। সেখানে সে আমাদের কথা ঠিকমতো না শুনলে, তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে নেকড়েকে খেতে দেব।' সেই কথা শুনে স্বর্ণাচারির মনে সত্যি সত্যি মৃত্যুভয় জাগল। সে তখন সিংহের দিকে ফিরে 'ভীম, ভীম,' বলে চিৎকার করে, 'আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও', বলতে লাগল।

পোষা সিংহের নাম ছিল ভীম। নিজের নাম কানে যেতেই সিংহ গর্জন করতে করতে উঠে একবার গা-ঝাড়া দিয়ে স্বর্ণাচারির বসে থাকা উটের দিকে ছুটল। কিন্তু ইতিমধ্যে মারাত্মক বিপদের কথা ভেবে লুণ্ঠনকারী গোরুটাকে ছেড়ে দিয়ে উটকে তাড়া দিল। উঠ

ভুট্টার খেতের ভিতর দিয়ে সোজা ছুটতে লাগল। তার পেছনে পেছনে লুণ্ঠন নেতাও নিজের উটকে আরও দ্রুত ছোটাল।

যা কিছু ঘটছে তার সবটাই বিঘ্নেশ্বর পূজারি কুটিরের পেছন থেকে দেখছিল। জীবনে সুখে-দুঃখে যে স্বর্ণাচারিকে সদাসর্বদা পেয়েছে সেই সাথীকে এভাবে লুণ্ঠনকারীদের ধরে বেঁধে নিয়ে যেতে দেখে তার মনে ভীষণ দুঃখ হল। সময়মতো ক্ষত্রিয় যুবকরা কুটিরে থাকলে এই বিপদ ঘটত না। বিঘ্নেশ্বর পূজারি এইসব কথা ভাবছিল এমন সময় ওই ক্ষত্রিয় যুবকদ্বয় শিকার সেরে নিজেদের কুটিরের দিকে ফিরছিল। সেইদিন ওরা ভালো শিকার পেল। একজন যুবকের কাঁধে একটি হরিণ ঝুলছিল। অন্য যুবকের কাঁধে দুটো বুনো মুরগি আর হাতে চারটে খরগোশ ঝোলানো ছিল। ওরা নিশ্চিন্তে কথা বলতে বলতে হাঁটছিল।

ওই যুবকদ্বয় কুটিরের দিকে হাঁটার সময় সিংহ মৃদু গর্জন করতে করতে যুবকদের কাছে এসে ওদের একজনের পা জড়িয়ে ধরল। সিংহকে খাঁচার বাইরে দেখে যুবকরা আশ্চর্য হয়ে গেল। শিকার করতে যাওয়ার সময় ওরা সিংহকে খাঁচায় আটকে রেখে গিয়েছিল। এখন সে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল কী করে! কোনো হতভাগাকে আমাদের এই সিংহটা মেরে ফেলেনি তো! খাঁচা থেকে এ তো বেরোতেই পারে না। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে অবশেষে ওরা হতবাক হল।

যুবকদ্বয় একে অন্যের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এমন সময় গাছের আড়াল থেকে বিঘ্নেশ্বর বেরিয়ে এসে বলল, 'হে মহাবীরদ্বয়, বিরাট মারাত্মক সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

সে-কথা শুনে মুহূর্তের জন্য যুবকদ্বয় থমকে গেল। ওদের মধ্যে একজন তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে পূজারির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি বলছ তুমি? সর্বনাশ, সর্বনাশ বলে চেঁচাচ্ছ কেন? তুমি আছ, আমরা আছি, এই বনও আছে, সর্বনাশটা তাহলে হল কোথায়? সর্বনাশ হল কার? আমরা অবাক হচ্ছি এই সিংহশাবক খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়ল কী করে? তাড়াতাড়ি বল কী হয়েছে?' কথা বলতে বলতে যুবকটি সিংহকে সামলাচ্ছিল।

বিঘ্নেশ্বর তাড়াতাড়ি অল্প কথায় যুবকদ্বয়কে এতক্ষণ কুটিরের কাছে যে ভয়ংকর কাণ্ড ঘটেছিল তা জানিয়ে বলল, 'হে খড়্গবর্মা, হে জীবদত্ত, এখানে সময় নষ্ট না করে কুটিরের কাছে চল। ভীমের থাবা খেয়ে সেখানে মরে পড়ে আছে একজন লুণ্ঠনকারী। দেখবে চল। ঈশ্বরের কৃপায় গাই বাছুরকে ফিরে পেয়েছি।'

পূজারির কথা শুনে খড়্গবর্মা এবং জীবদত্তের একদিকে যেমন খুব বিস্ময় জাগল তেমনি অন্যদিকে প্রচণ্ড ঘৃণাও জাগল। ওরা জানত ওদের বাসস্থানের অরণ্যে আরও অনেক আদিম জাতি আছে কিন্তু ওরা এতদিন উটবাহী কাউকে দেখেনি। এহেন অবস্থায়

উটে বসে একদল লুণ্ঠনকারী তাদের কুটিরে আসাই নয়, এসে দিব্যি তাদের অতিথি স্বর্ণাচারিকে ধরে বেঁধে নিয়ে যাওয়ায় তাদের মনে ওদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা জাগল।

'জীবদত্ত, আর এক মুহূর্ত আমাদের এখানে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। পূজারি তো আমাদের জানিয়েছে ওই লুণ্ঠনকারীরা কোন দিকে গেছে। আমরা এক্ষুনি চল বেরিয়ে পড়ি, স্বর্ণাচারিকে উদ্ধার করি আর ওই লুণ্ঠনকারীদের খতম করি!' এই কথা বলে খড়গবর্মা খাপ থেকে তরবারি বের করল।

জীবদত্ত নিজের বন্ধুর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'খড়গবর্মা, আগে পিছে না ভেবে শত্রুকে আক্রমণ করলে বিপদ হতে পারে। শত্রুদের সংখ্যা জানতে হবে। আমাদের কুটিরে ওই লুণ্ঠনকারীদের ঢোকার পেছনে কোনো রহস্য আছে কিনা জানতে হবে। এইসব ব্যাপার খুব সাবধানে ভেবেচিন্তে দেখতে হবে। কোথাকার কোন দেশের বাহন উটকে লুণ্ঠনকারীরা এই অরণ্যে আনল কেন?... যাক, আগে চল কুটিরে ঢুকে ওরা কী নিয়ে গেছে দেখি, তারপর আমরা ঠিক করব আমাদের কর্তব্য।'

খড়গবর্মা এবং জীবদত্ত এগিয়ে চলেছে। পেছনে যেতে যেতে বিঘ্নেশ্বর বলল, 'হে যোদ্ধাগণ, এই যে, এই পাশের জঙ্গলে পড়ে আছে একজন লুণ্ঠনকারী। ভীমের থাবা খেয়ে লোকটা পটল তুলেছে।

খড়গবর্মা এবং জীবদত্ত ওই মৃতদেহের কাছে গেল। খড়গবর্মা পা দিয়ে ওই মড়াটাকে এদিক-ওদিক নাড়িয়ে দেখল। জীবদত্ত মড়ার দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'এই লোকটা ঠিক বুনো জাতের নয়। এর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এ কোনো দূর দেশের অধিবাসী।'

'এ লোকটা বেঁচে থাকলে এর কাছ থেকে অনেক কিছু জানা যেত। বেচারা ভীম কী করে বুঝবে। রাগের চোটে ওর গলা ঝাপটে ধরেছে।' বলল খড়গবর্মা।

তারপর যুবকদ্বয় কুটিরের ভিতর ঢুকল। কুটিরের সমস্ত জিনিস তছনছ করা আছে। দরজার কাছে টাঙানো ধনুক এবং তূণ তারা দেখতে পেল না। 'আমাদের এইসব জিনিস যখন নিয়ে গেছে, ওদের আর ছাড়া যায় না। ধরতেই হবে। ওরা যে কোত্থেকে এল এবং কোনদিকে গেল তা এখানকার গণ্ডক জাতের লোক কেউ-না-কেউ দেখেছে নিশ্চয়।' জীবদত্ত বল। পরক্ষণে পূজারির দিকে ঘুরে জীবদত্ত বলল, 'বিঘ্নেশ্বর, তুমি গিয়ে আশেপাশে গণ্ডক জাতের কাউকে দেখতে পেলে তাকে এখানে নিয়ে এলো।'

কুটিরের বাইরে পা রাখতেই পূজারি দেখতে পেল গণ্ডক জাতের নেতা অরণ্যমাল্লু তার অনুচরদের সাথে, লুণ্ঠনকারীদের বাহন, তাদের ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলতে বলতে চলেছে। তা দেখে বিঘ্নেশ্বর পূজারি তাদের কাছে তাড়াতাড়ি গিয়ে বলল, 'ক্ষত্রিয়

যুবকেরা এক্ষুনি শিকার থেকে ফিরেছে। উটের উপর বসে থাকা লুণ্ঠনকারীদের আপনারা কেউ এখন দেখেছেন? ওরা আমার প্রাণের বন্ধু স্বর্ণাচারিকে ধরে নিয়ে গেছে।'

এ-কথা শুনে অরণ্যমাল্লুর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে বলল, 'কী বলছ পূজারি, আমরা কী শুধু ওদের দেখেছি, ওরা যে আমাদের ফসল কেটে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা ওদের প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে হেরে গিয়ে পালাচ্ছি। ওদের এক বিচিত্র জীবের পিঠে স্বর্ণাচারিকে চেপে যেতে আমার অনুচররা দেখেছে। খড়্গবর্মা অথবা জীবদত্ত তখন এখানে থাকলে ওদের একজনও প্রাণে বেঁচে যেতে পারত না।'

বাইরের কথাবার্তা কানে যেতেই খড়্গবর্মা এবং জীবদত্ত কুটিরের বাইরে এল। অরণ্যমাল্লু ওদের কাছে গিয়ে বলল, 'খড়্গবর্মা, জীবদত্ত, বিরাট বিপদে পড়ে গেছি। ওই লুণ্ঠনকারীরা ফসল নিয়ে গেছে। যে গণ্ডক জাতের লোক পরাজয় কাকে বলে জানত না, তারা সবাই কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, পালিয়ে এল অরণ্যপুরে। এখন আপনারাই ভরসা।'

অরণ্যমাল্লুর কথা শুনে খড়্গবর্মা এবং জীবদত্ত বুঝল ওই উটের উপর চড়ে আসা লোকগুলোর কাজই লুণ্ঠন করা। ওরা এ-কথা ভেবে আশ্চর্য হল যে ওই লুণ্ঠনকারীরা শুধু যে সাহসের সাথে গণ্ডক জাতের লোককে মোকাবিলা করল তাই নয় ওদের পরাজিতও করল। এ এক আশ্চর্য ঘটনা।

'তুমি রাজা হয়ে ওই লুণ্ঠনকারীদের ভয় পেয়ে পালিয়ে এলে। তোমার কাপুরুষতা দেখে তোমার অনুচরেরা কী ভাববে!' রেগে গিয়ে খড়্গবর্মা বলল।

'আজ্ঞে আমি পালিয়ে এসেছি ঠিক। কিন্তু রাজা ওদের আক্রমণ করতে আসেনি।' বলতে বলতে মন্ত্রী শিলামুখী এগিয়ে এল।

'তাহলে ওরা কি কোনো নতুন অস্ত্র তোমাদের উপর প্রয়োগ করেছে? নাকি ওই উটদের দেখে তোমাদের গণ্ডারগুলো ভয়ে ছুটে পালিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল জীবদত্ত।

শিলামুখী সেই পাহাড়-জঙ্গলের পাদদেশে যা কিছু ঘটেছিল সমস্ত ঘটনা ওদের শুনিয়ে বলল, 'ওই লুণ্ঠনকারীদের কাছে বল্লম ও তরবারি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র ছিল না। কিন্তু যে জীবের নাম আপনি উট বলছেন, সেগুলোকে দেখে কেন জানি না আমার লোক ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ওই ধরনের জন্তু আমরা কোনোদিন দেখিনি। তাই ওটাকে দেখে সবাই ভয় পেয়েছে।'

'যাক যা হবার হয়েছে। এখন স্বর্ণাচারিকে ওদের কবল থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। শুধু তাই নয় ওই দুরাত্মারা যাতে এ পথ আর কোনোদিন না মাড়ায় তার জন্য উচিত শিক্ষা ওদের দিতে হবে। তোমাদের কয়েক জন দেখে এসো ওরা কোন দিক দিয়ে কতদূর গেল। আমরা দু-জনে সূর্যাস্ত হতে দু-এক দণ্ড বাকি থাকতে এখান থেকে রওনা দেব।' জীবদত্ত বলল।

জীবদত্তের কথা শেষ হতেই অরণ্যমাল্লু তার চার জন অনুচরকে কাছে ডেকে ওই লুণ্ঠনকারীদের গতিবিধি ভালো করে দেখে আসার হুকুম দিল। তৎক্ষণাৎ ওই চার জন গণ্ডারের পিঠে চড়ে পাহাড়ের পাশ দিয়ে যেতে লাগল।

চার

খড়গবর্মা এবং জীবদত্ত ভাবল ওই চার জন গণ্ডক জাতের যুবকদের ফিরে আসার আগে রান্না সেরে প্রস্তুত থাকা উচিত। গণ্ডক জাতের রাজা অরণ্যমাল্লু এবং তার দু-জন অনুচর কুটিরের সামনে বসে লুণ্ঠনকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগল।

'এই লুণ্ঠনকারীদের সম্পূর্ণ খতম না করলে আমাদের বাঁচার আর কোনো পথ নেই। বাকি ফসল কেটে ঘরে তোলার সময় আর একবার এই লুণ্ঠনকারীরা আসতে পারে।' অরণ্যমাল্লু বলল।

সেই কথা শুনে মন্ত্রী শিলামুখী মাথা নেড়ে বলল, 'মহারাজ, আমাদের গণ্ডক জাতের লোক সেই লুণ্ঠনকারীদের চেয়ে ওদের বাহন, ওই বিচিত্র জীব দেখে বেশি ভয় পেয়েছে। তারা ভেবেছে ওই জন্তুগুলো ভীষণ ক্ষতিকর কোনো জীব। সেইজন্য আমার ধারণা, এবারে আমাদের যোদ্ধারা ওই জানোয়ার দেখে আর ভয় পেয়ে পিছু হটবে না।'

'ক্ষত্রিয় যুবকদের সাহায্যে, আমরা এখনই ওদের ধাওয়া করে, ওদের সর্বনাশ করলে সবচেয়ে ভালো হত। কিন্তু এখন ভাবছি, ক্ষত্রিয় যুবকরা আমাদের কথায় রাজি হবে কি না।' অরণ্যমাল্লু বলল।

'যুদ্ধের নাম শুনলে খড়গবর্মা এবং জীবদত্ত চান-খাওয়া-ঘুম ভুলে যায়। লুণ্ঠনকারীরা স্বর্ণাচারিকেও ধরে নিয়ে গেছে। ক্ষত্রিয় যুবকদের খাওয়া-দাওয়া সেরে কুটিরের বাইরে আসতে দিন, তখন ওদের সাথে কথা বলব।' বিঘ্নেশ্বর পূজারি বলল।

ওরা এই ধরনের কথা বলাবলি করছিল। তখনই খড়গবর্মা এবং জীবদত্ত খাওয়া-দাওয়া সেরে কুটিরের বাইরে এল। বিঘ্নেশ্বর পূজারি জীবদত্তকে অরণ্যমাল্লুর চিন্তাধারার কথা বলল।

'শিকার শেষ করে কুটিরে আসার সাথে সাথে আমার মাথায় এই চিন্তা এসেছিল। কিন্তু ততক্ষণে সেই লুণ্ঠনকারীরা এই অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে। উট আমাদের গণ্ডারের চেয়ে তিনগুণ দ্রুত দৌড়াতে পারে। ওরা যখন বুঝতে পারবে যে আমাদের হাতে ওদের মারাত্মক কোনো বিপদ হতে পারে তখনই ওরা সোজা পালাবে। তাই সে দুরাত্মাদের খতম করতে হলে ওরা যখন উট থেকে নেমে বিশ্রাম করতে থাকবে ঠিক তখনই ওদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে হবে।' জীবদত্ত বলল।

'বেশ তাই করা যাবে। আমরা কি এখন আমাদের পঞ্চাশ জন যোদ্ধাকে নিয়ে যাব?' অরণ্যমাল্লু দারুণ উৎসাহে বলল।

জীবদত্ত হাসতে হাসতে বলল, 'অরণ্যমাল্লু এত যোদ্ধাদের সাথে নিয়ে ওই লুণ্ঠনকারীদের অনুসরণ করা যাবে কী করে? ওরা আমাদের সহজেই চিনে ফেলবে এবং পালিয়ে যাবে। সেইজন্য আমি এবং খড়গবর্মা আগে যাব। প্রথমে আমরা জেনে নেব যে আজ রাত্রে ওরা কোথায় আস্তানা গাড়বে। সুযোগ বুঝে প্রথমে আমরা ওদের নেতাকে খতম করব। বাকি লোকদের হয় আমরা বন্দি করব না হয় এই অঞ্চল থেকে দূরে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করব।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই যে চার জন খবর আনতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ফিরে এল। সেই লোকটা যে গণ্ডারের উপর বসে এসেছিল সেই গণ্ডার হাঁপাচ্ছিল।

ওই লোকটাকে দেখেই অরণ্যমাল্লু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'লুণ্ঠনকারীদের দেখা পেয়েছ? তোমার সাথে আর যে তিন জন গিয়েছিল ওরা কোথায়?'

গণ্ডক জাতের লোকটা সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে দিল। সে যখন তার ওই তিন জন সাথীসহ যাচ্ছিল তখন দেখল ওই লুণ্ঠনকারীরা উত্তর দিকে চলে যাচ্ছে। তারপর ওদের অনুসরণ করেছিল। লুণ্ঠনকারীরা এক নদীর ধার দিয়ে যেতে লাগল। সেই দৃশ্য দেখে ফিরে এসেছে।

'বাকি তিন জন কি লুণ্ঠনকারীদের অনুসরণ করছে?' জীবদত্ত জিজ্ঞেস করল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। আমরা যতক্ষণ না যাচ্ছি ওরা তিন জন ওই লুণ্ঠনকারীদের নজর বাঁচিয়ে ওদের অনুসরণ করবে।' গণ্ডক জাতের যোদ্ধা বলল।

জীবদত্ত ক্ষণকাল মৌন থেকে পরক্ষণে বলল, 'খড়গ, এখন আমরা রওনা হতে পারি। সূর্যাস্তের পরই ওই লুণ্ঠনকারীদের আস্তানায় যাওয়া উচিত হবে। তারপর সুযোগ বুঝে ওদের আক্রমণ করব। আজ রাত্রেই স্বর্ণাচারিকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। তা না হলে ওরা স্বর্ণাচারিকে মেরে ফেলতে পারে।'

তারপর ওই ক্ষত্রিয় যুবকদ্বয় তির-ধনুক ছোরা বল্লম হাতে তুলে নিয়ে গণ্ডারের উপর চড়ে এগোতে যাচ্ছে এমন সময় বিঘ্নেশ্বর পুজারি হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়েছে, এমন ভাবে লাফিয়ে বলল, 'ক্ষত্রিয় যুবকদ্বয়, ওদের ধাওয়া করার জন্য ওদের বাহনকেই ব্যবহার করতে পার। আমাদের সিংহ যে লুণ্ঠনকারীকে মেরে ফেলেছে সেই লোকটার বাহন আশেপাশে জঙ্গলে কোথাও নিশ্চয় লুকিয়ে আছে। খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। উটে চড়ে তাড়াতাড়ি ওদের কাছে পৌঁছানো যাবে।'

এই কথা শুনে অরণ্যমাল্লু নিজের অনুচরদের বলল, 'তাইতো, সেই বিচিত্র জীবের কথা একেবারে ভুলে গেছি। এই কুটিরের পেছনেই কোথাও সেটা হবে। যাও, ওটাকে ধরে নিয়ে এসো।'

তৎক্ষণাৎ গণ্ডক জাতের চার জন ওই কুটিরের পেছনের জঙ্গলে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে সেই উট ধরে টেনে আনল খড়গবর্মা ও জীবদত্তের কাছ। ওই যুবকদ্বয় সেই উটের উপর রওনা হল। যে যুবক লুণ্ঠনকারীদের খবর আনল সেই যুবক ক্ষত্রিয় যুবকদের সামনে পথ দেখিয়ে যেতে লাগল। সূর্যাস্তের সময় ওরা লুণ্ঠনকারীদের নদীর তীরে পাহাড়ের গা ঘেসে যাওয়া একটি পথে দেখতে পেল। তারপর, ওই যে তিন জন গণ্ডক জাতের যুবক আগে থেকেই লুণ্ঠনকারীদের অনুসরণ করছিল তারাও এদের সাথে জুটল। অন্ধকার হয়ে এল।

তখন লুণ্ঠন নেতা নিজের লোকজনকে নির্দেশ দিল সেখানেই আস্তানা গাড়তে। লুণ্ঠনকারীরা উট থেকে নেমে উটগুলোকে বাঁধল। রান্নার জোগাড় করতে লাগল ওরা। কয়েক জন বেরিয়ে পড়ল শুকনো কাঠের সন্ধানে। বাকি ক-জন পাথর দিয়ে উনান তৈরি করল।

খড়গবর্মা এবং জীবদত্ত নিজের অনুচরদের নিয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে স্বর্ণাচারিকে খুঁজে দেখতে লাগল। স্বর্ণাচারিকে ওরা লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে কোথাও দেখতে পেল না। জীবদত্ত ভাবল, এই দুরাত্মারা পথেই কোথাও তাকে মেরে ফেলে দেয়নি তো! সে খড়গবর্মাকে বলল, 'খড়গ, স্বর্ণাচারিকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। এই দুরাত্মারা স্বর্ণাচারিকে এখানে আসার পথেই মেরে ফেলেনি তো!'

'তা কখনোই হতে পারে না। স্বর্ণাচারি ওদের চোখে ধুলো দিয়ে কোথাও পালিয়েছে কি না সন্দেহ হচ্ছে। তবে স্বর্ণাচারির খবর জানা খুবই সহজ ব্যাপার। তুমি এখানেই থাক। আমি এখনই ফিরছি।' বলে খড়গবর্মা খাপ থেকে তরবারি বের করে ওখান থেকে অন্যদিকে চলে যেতে লাগল। জীবদত্ত তাকে থামিয়ে বলল, 'কী করতে যাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ?'

'কয়েক জন লুণ্ঠনকারী কাঠ কুড়োতে নদীতীরে গেছে। ওদের একজনকে ধরে আনলে সে প্রাণের ভয়ে সব কথা আমাদের কাছে জানিয়ে দেবে।' বলল খড়গবর্মা।

জীবদত্ত কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'এই পরিকল্পনা চমৎকার হবে মনে হচ্ছে। তুমি নিজের সাথে একজন গণ্ডক জাতের লোককে নিয়ে যাও। এমনভাবে কাজটা কর যাতে ওরা টের না পায় যে আমরা এখানে লুকিয়ে আছি।'

খড়গবর্মা একজন গণ্ডক জাতের যুবককে নিয়ে চলে গেল। অদূরেই সে লুণ্ঠনকারীদের একজনকে দেখতে পেল। লোকটা এদের দেখে চিৎকার করার জন্য হাঁ করতেই খড়গবর্মা এক লাফে তার কাছে গিয়ে তার মুখ চেপে ধরল।

লুণ্ঠনকারীরা শুধু যে শুকনো কাঠ কুড়োচ্ছিল তাই নয়, শুকনো ডালগুলোকেও ভেঙে ফেলছিল। খড়গবর্মা কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে নিল। খড়গবর্মা তার অনুচরকে একটা গাছের শুকনো ডাল ভেঙে নীচে ফেলতে বলল। সেটা নীচে সশব্দে পড়ার সাথে সাথে ওরা একটা গাছের আড়ালে লুকোল। পরক্ষণেই একজন লুণ্ঠনকারী ওই ডালের কাছে এল। সেই লুণ্ঠনকারী ঘুণাক্ষরেও টের পেল না যে ওই ডাল গাছ থেকে কেন পড়ল।

লোকটা ওই ডাল টেনে নিয়ে যেতে যাবে এমন সময় খড়গবর্মা পেছন দিক থেকে গিয়ে তার গলা ঝাপটে চেপে ধরল দু-হাতে। ঠিক সেই মুহূর্তে গণ্ডক জাতের ওই লোকটা এসে তার বুকের কাছে বল্লম উঁচিয়ে ধরে বলল, 'চেঁচালে দেব শেষ করে।'

প্রাণের ভয়ে কাঁপছিল ওই লুণ্ঠনকারী। খড়গবর্মা তাকে বলল, 'কোনো কথা না বলে চুপচাপ আমার সাথে এসো। তোমার কোনো ভয় নেই। কিন্তু একবার যদি চেঁচানোর চেষ্টা কর তো তোমাকে এইখানেই একেবারে প্রাণে মেরে শেষ করে ফেলব।'

লুণ্ঠনকারী ভেজা বিড়ালের মতো নীরবে খড়গবর্মার পেছনে হাঁটতে লাগল। জীবদত্ত লুণ্ঠনকারীকে দেখে ভীষণ খুশি হয়ে খড়গবর্মাকে বলল, 'মনে হচ্ছে তুমি খুব সহজেই ধরে ফেলতে পারলে। এই লোকটা কি জানিয়েছে স্বর্ণাচারির খবর?'

'এখন পর্যন্ত একে কোনো প্রশ্ন করিনি। এর অনুচররা ওখানে চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাই, আমি সোজা তোমার কাছে একে নিয়ে এসেছি।' খড়গবর্মা বলল।

'ওরে এই, তোমরা লুণ্ঠন করে ফেরার পথে যে স্বর্ণাচারিকে ধরে এনেছিলে তাকে কী করলে?' জীবদত্ত জিজ্ঞেস করল ওই লুণ্ঠনকারীকে।

'সত্যকথা বললে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবেন না তো? ছেড়ে দেবেন তো?' লুণ্ঠনকারী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল।

'নিশ্চয় ছেড়ে দেব। কিন্তু তুমি যদি মিথ্যা কথা বল, আমাদের যদি ধোকা দাও, তাহলে তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব। বুঝেছ?' জীবদত্ত সতর্ক করে দিয়ে বলল।

'শুনুন তবে। আচারি সারা রাস্তা আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও' বলে চিৎকার করছিল। আসলে আমাদের নেতা তাকে মেরে ফেলতে চায়নি। তাই ওকে ভুট্টার থলিতে পুরে গলায় বেঁধে রেখেছে। এখন ওকে নদীর তীরে আমাদের জিনিসপত্রের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে।' লুণ্ঠনকারী এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল।

'আজ রাত্রে তোমরা কি এখানেই থাকবে? কাল সকালে এখান থেকে রওনা হয়ে যাবে নাকি?' জীবদত্ত আবার প্রশ্ন করল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন আমাকে মেরে ফেলবেন না তো? আমি সব কথা বলে দিয়েছি।' ওই লুণ্ঠনকারী বলল।

'তুমি যে কথা বলেছ তা যতক্ষণ না যাচাই করে দেখছি, সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ তোমাকে গাছে বেঁধে রাখব। তোমার মুখে গাছের পাতা পুরে দেব, যাতে তুমি চিৎকার করে তোমার লোকজনকে না ডাকতে পার।' এই কথা বলে জীবদত্ত গণ্ডক জাতের একজনকে ইশারায় ডাকল।

গণ্ডক জাতের একজন যুবক ওই লুণ্ঠনকারীকে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের সাথে ঝুরি দিয়ে বেঁধে দিল। ততক্ষণে অন্ধকার নেমে গেছে। খড়্গবর্মা এবং জীবদত্ত একটা গাছে উঠে লুণ্ঠনকারীদের আস্তানা ভালোভাবে দেখে নিল। ওই আস্তানার এক জায়গায় আগুন জ্বলছিল। ওই আগুনের কাছে বসে লুণ্ঠন নেতা চার-পাঁচ জন অনুচরদের সাথে কথা বলছিল। অন্যেরা মাদুর, থলি প্রভৃতি বিছিয়ে শোবার তোড়জোড় করছিল।

'খড়্গ, আর একটু অন্ধকার বাড়লেই আমরা কাজ শুরু করব। প্রথমে স্বর্ণাচারিকে মুক্ত করতে হবে। তারপর, গণ্ডক জাতের লোক পাঠিয়ে উটগুলোকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর আমরা চড়ব গণ্ডারের উপর। অতর্কিতে ওই ঘুমন্তদের আক্রমণ করে যাকে পারব তাকে মেরে ফেলব। আর বাকি যারা থাকবে তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাবে।' বলল দেবদত্ত।

'ভালো লাগছে তোমার পরিকল্পনা। আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে স্বর্ণাচারিকে মুক্ত করা। তারপর...' হঠাৎ থেমে খড়্গবর্মা লুণ্ঠনকারীরা যেখানে আস্তানা গেড়েছিল তার পেছনের পাহাড়ের গুহার দিকে বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে বলল, 'জীবদত্ত, ওই পাহাড়ের গুহা থেকে কেমন মশালের শিখা দেখা যাচ্ছে দেখ! ওই অদ্ভুত ধরনের বিকৃত চেহারার রাক্ষুসে লোকটা কে? ওর পেছনে দাঁড়িয়ে যে ভয়ংকর লোকটা কড়া মেজাজে চাবুক চালাচ্ছে সে কে?'

খড়্গবর্মা যে গুহার দিকে তাকাতে বলল সেইদিকে তাকাল জীবদত্ত। ওই গুহার মুখে একটা মশাল জ্বলছিল। ওই মশালের আলোতে দেখা গেল অদ্ভুত ধরনের একটা লোক জাদুর একটা দণ্ড না চাবুক কি যেন ঘোরাচ্ছে ওই লুণ্ঠনকারীদের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ এক সময় ওই ভয়ংকর রাক্ষস গর্জন করে উঠল। সাথে সাথে ওই অরণ্যে, পাহাড়ে সেই রাক্ষসের গর্জন যেন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল। গর্জন করতে করতে সেই রাক্ষস গুহা থেকে

বেরিয়ে সোজা লুণ্ঠনকারীদের দিকে যেন ছুটে আসছে। তার কপালে অগ্নিপিণ্ডের মতো কি যেন দপ দপ করে জ্বলছে।

পাঁচ

আগুনের কাছে বসে নিজের অনুচরদের সাথে কথা বলার সময় হঠাৎ লুণ্ঠন নেতা দেখতে পেল গুহা থেকে গর্জন করতে করতে এক বিকৃত জটাধারী ওদের দিকে ছুটে আসছে। তার হাতে এক জ্বলন্ত মশাল।

'এ কেমনতর ভয়ংকর আকৃতি রে বাবা! একি কোনো রাক্ষস নাকি? নাকি পাহাড়ি পিশাচ? তোমরা সবাই মুহূর্তে সাবধান হয়ে যাও। আমাদের এক্ষুনি বিপদের মোকাবিলা করতে হবে।' এ-কথা বলে লুণ্ঠন নেতা ঝট করে উঠে দাঁড়াল।

'বাবু, এখানে আর আমাদের থাকা উচিত হবে না। প্রাণে মারা যাব। এ নির্ঘাত মানুষখেকো রাক্ষস।' এই কথা বলে লুণ্ঠন নেতার চার জন অনুচর সোজা নদীতীর ধরে ছুটতে লাগল।

'ওরে এই কাপুরুষের দল! থাম! আমরা এত জন আছি। আর এই রাক্ষস একা আমাদের কী করতে পারে? ফিরে এসো, আমরা সবাই মিলেমিশে একত্রে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।' লুণ্ঠন নেতা চিৎকার করে এইসব কথা বলতে বলতে ওই অনুচরদের ডাকতে লাগল।

তার কথায় তারা কান দিল না। 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' ভেবে ওদের কেউ ছুটল উটের দিকে আবার কেউ ছুটল নদীর তীর ধরে। ইতিমধ্যে ঘুমন্ত লুণ্ঠনকারীদের ওই রাক্ষসটা পা দিয়ে ঠেলে তাদের কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিল।

গাছের ডালে বসে খড়গবর্মা এবং জীবদত্ত এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে লাগল। তারা এই দৃশ্য দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা ওই চার জন গণ্ডক জাতের লোক ভয়ে কাঁপতে লাগল।

'খড়গবর্মা, এই বিকৃত আকৃতিধারী কোনো রাক্ষস অথবা কোনো পিশাচ নয়। ওই গুহার কোনো তান্ত্রিক একে এই ধরনের রূপ ধারণ করিয়ে পাঠিয়েছে। এ হয়তো তান্ত্রিকের শিষ্য হিসেবেই রয়েছে।' জীবদত্ত বলল।

'সে যাই হোক, আমরা যা করব ভেবেছিলাম তা এই তান্ত্রিক করছে যখন করুক। আমরা শুধু সব দেখতে থাকব। যেই লুণ্ঠনকারীরা চলে যাবে অমনি আমরা গিয়ে আমাদের স্বর্ণাচারিকে ভুট্টার বস্তার ভেতর থেকে উদ্ধার করে সোজা নিজেদের পথ ধরব।' খড়গবর্মা বুঝিয়ে বলল।

ওই বিকৃত লোকটা কি করছে না করছে কিছুক্ষণ দেখে জীবদত্ত বলল, 'খড়গবর্মা, লুণ্ঠন নেতার বেশ হিম্মত আছে মনে হচ্ছে। ওই দেখ নিজের লোককে জোগাড় করে ওই বিকৃত লোকটাকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করার তাল করছে।'

লুণ্ঠন নেতা নিজের পলায়নরত দশ-বারো জনের দিকে বল্লম উঁচিয়ে ভয় দেখাল। ওদের থামিয়ে ওই বিকৃত লোকটাকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলল।

'এই আক্রমণের ফলে ওই গুহার তান্ত্রিক এবং তার সৃষ্ট ওই বিচিত্র ভয়ংকর আকৃতির মহাশক্তির মৃত্যু হবে। ওই বিকৃত রাক্ষসের মৃত্যুর পর লুণ্ঠন নেতা ওই গুহার কাছে যাবে। হত্যা করবে ওই তান্ত্রিককে। কিছু একটা আমাদের করতে হবে। এখন লক্ষ রাখতে হবে যাতে স্বর্ণাচারি উটের পায়ের নীচে পড়ে মারা না যায়। ওকে আমাদের রক্ষা করতে হবে।' খড়গবর্মা বলল।

খড়গবর্মার কথা শেষ হতে-না-হতেই গুহার ভেতর থেকে এক ভয়ংকর আগুনের হলকা বেরুল। তান্ত্রিক তেলে ভেজা মশালগুলোতে আগুন ধরিয়ে, 'শাম্ভবী! ভৈরবী!' বলে চিৎকার করে এক-একটা জ্বলন্ত মশাল ওই পাহাড়ের নীচের লুণ্ঠনকারীদের উপর ছুঁড়তে লাগল!

জ্বলন্ত মশালগুলো লুণ্ঠনকারীদের উপর একে একে পড়তে লাগল। এই নতুন ধরনের আক্রমণ লক্ষ করে লুণ্ঠন নেতা ঘাবড়ে গিয়ে নিজের অনুচরদের বলল, 'ওরে উষ্ট্রবীরেরা, এই বিকৃত পিশাচের মতো আরও পিশাচ ওই গুহার মধ্যে আছে মনে হচ্ছে। আর এখন যুদ্ধ করে কোনো লাভ নেই। তোমাদের কয়েক জন ভুট্টার থলেগুলো নদীতে ফেলে দাও। জোয়ারে ভাসতে ভাসতে ওগুলো অন্য কোনো প্রান্তে পৌঁছে যাবে। আমরা পরে ওই ভুট্টার থলে জোগাড় করে নেব। বাকিরা গাছে বাঁধা উটগুলো ছাড়িয়ে, উটের উপর চড়ে নদীতীর ধরে রওনা হয়ে যাও।' চিৎকার করে বলল।

লুণ্ঠন নেতার নির্দেশ শুনে নদীপথ ধরে যারা ছুটে পালাচ্ছিল তারা এবং গাছের আড়ালে যারা লুকিয়ে ছিল তারা এগিয়ে গেল। কিছু লোক গাছে বাঁধা উটগুলো খুলে দিল আর বাকি জন ভুট্টা ভরতি থলেগুলো নদীর জলে ফেলতে এগিয়ে গেল। ইতিমধ্যে গুহার ভেতর থেকে তান্ত্রিক বেরিয়ে এসে মশালটাকে নাড়াতে নাড়াতে বলল, 'ওরে এই জটাধারী ভূত! নদীতে যারা ভুট্টার থলে ফেলছে তাদের ধরে ওদের নদীমাতার আহার করে ফেল। একজনও যাতে না পালাতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখ।'

যে বিকৃত ভয়ংকর লোকটা এতক্ষণ পা দিয়ে হাত দিয়ে লুণ্ঠনকারীদের মারছিল সে এখন তান্ত্রিকের নির্দেশ পেয়ে ভুট্টার থলে নদীর জলে ফেলতে যাওয়া লোকগুলোর দিকে

এগোল। ততক্ষণে কয়েক জন লুণ্ঠনকারী কাঁধে পিঠে ভুট্টার থলে ফেলে নদীর দিকে এগোচ্ছিল। জটাধারী ভয়ংকর লোকটা ওদের এক-এক জনকে ধরে নদীতে ফেলতে লাগল। এই ঘটনা ঘটার সাথে সাথে লুণ্ঠনকারীদের আর্তনাদে গোটা তল্লাট হা-হা করে উঠল।

লোকের আর্তনাদ, চিৎকার প্রভৃতির ফলে গাছে বাঁধা উটগুলো দড়ি ছিঁড়ে সেই অন্ধকারে পালাতে লাগল। পালানোর সময় তারা লুণ্ঠনকারীদের মাড়িয়ে যেতে লাগল। কয়েকটা উট নদীর জলে গিয়ে পড়ল এবং স্রোতের সাথে ভেসে যেতে লাগল।

ঠিক সেইসময় একজনের আর্তনাদ শোনা গেল, 'আমাকে বাঁচান! আমাকে বাঁচান! আমাকে নদীতে ফেলবেন না!' আর তখনই ঝপ করে একটা থলি যেন নদীর জলে পড়ল।

'খড়গবর্মা, তুমি কি শুনতে পারছ? চিনতে পারছ? এই আর্তনাদকারী আমার মনে হচ্ছে স্বর্ণাচারি! ওকে লুণ্ঠনকারীরা নদীর জলে ফেলে দিয়েছে। ভুট্টার থলি জলে ডুববে না। স্বর্ণাচারির মাথাটা বাইরে আছে। থলিটা ভাসতে ভাসতে কোনো এক তীরে গিয়ে উঠবে। তবে আমরা একটু আগে চেষ্টা করলে বোধ হয় তাকে উদ্ধার করতে পারতাম।' জীবদত্ত গাছ থেকে নামতে নামতে বলল।

খড়গবর্মা তার কাঁধে হাত দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করতে যাচ্ছ?'

'গণ্ডক জাতের একজনকে নদীতীরের কাছে যেতে বলব। হয়তো সে স্বর্ণাচারির চিৎকার শুনতে পাবে। বাকি তিন জনকে লুণ্ঠনকারীদের বধ করতে বলব।' জীবদত্ত বলল।

'তাহলে আমরা কি হাত গুটিয়ে এসব দেখতে দেখতে বসে থাকব?' খড়গবর্মা একটু রেগে গিয়ে বলল।

'খড়গবর্মা! এখন তাড়াহুড়ো করো না। লুণ্ঠনকারীরা এখন ছোটাছুটি করছে বটে কিন্তু তাদের নেতা এখন ভুট্টার থলে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। এমনকী জটাধারী ভয়ংকর লোকটাকে আক্রমণ করারও তাল করছে। তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না সে তার অনুচরদের কীভাবে মাঝে মাঝে নির্দেশ দিচ্ছে? আমাদের অনুচরদের হাত থেকে বেঁচে পালানোর চেষ্টা করলে আমরা তাকে তির বিদ্ধ করব। তার আগে আমাদের বুঝতে হবে এই জটাধারী এবং ওই তান্ত্রিকের ব্যাপারটাকে।' জীবদত্ত বলল।

'ঠিক আছে। গণ্ডক জাতের যুবকদের তুমি যা বোঝাতে চাইছ, বুঝিয়ে ফিরে এসো, আমি এখানেই থাকব।' এই কথার পর খড়গবর্মা তির-ধনুক নিজের হাতে তুলে নিল। শত্রু কোনোদিক দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করতে আসছে কি না এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল।

জীবদত্ত গাছ থেকে নেমে গণ্ডক জাতের যুবকদের কাছে গিয়ে তাদের সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে দিল। মুহূর্তে এক গণ্ডক যুবক গণ্ডারের পিঠে চড়ে নদীর তীরে গেল। কিন্তু বাকি তিন জন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বলল, 'আজ্ঞে হুজুর, এই উটগুলোকে দেখে আমাদের কেমন যেন ভয় করত। এখন দেখছি ওই রাক্ষসটাকে। সে কি আর আমাদের ঘাড় মটকাবে না?'

ওই রাক্ষস এবং তার তান্ত্রিককে যা করার আমরা করছি। লুণ্ঠনকারীদের পেলেই মেরে ফেলবে। ওরা তোমাদের খেতের ফসল লুণ্ঠন করেছে। তোমরা খাবে কী? এ-কথা তোমরা ভুলে যেয়ো না।' জীবদত্ত ওদের গুরুত্ব সহকারে স্মরণ করিয়ে দিল।

নিজেদের খেতের ফসল লুঠ করার কথা মনে পড়তেই যুবকরা বলল, 'আমরা আর ছাড়ব না ওই লুণ্ঠনকারী যুবকদের। আমরা যাচ্ছি।' বলে যুবকরা গণ্ডারের উপর চড়ে বজ্রকণ্ঠে বলল, 'জয়, অরণ্যমাতার জয়! অরণ্যমাতার জয়!' চিৎকার করে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল লুণ্ঠনকারীদের উপর।

ওই ভয়ংকর রাক্ষসটার আক্রমণের ফলে যখন লুণ্ঠনকারীরা ছোটাছুটি করছিল ঠিক তখনই গণ্ডক যুবকদের আবার গণ্ডারের পিঠে চড়ে আসতে দেখে লুণ্ঠনকারীরা ভীষণ ভয় পেয়ে নেতাকে বলল, 'প্রভু, গণ্ডকরা আক্রমণ করতে আসছে! এখন পালানো ছাড়া আর পথ নেই।' এ-কথা বলে লুণ্ঠনকারীরা কেউ নদীর তীরের দিকে, কেউ গাছের দিকে ছুটে পালাল। একদিকে ভয়ংকর রাক্ষসের আক্রমণ আর অন্যদিকে বল্লম উঁচিয়ে ছুটে আসা গণ্ডকদের আক্রমণ। লুণ্ঠন নেতাও ভাবল, দু-দিকের আক্রমণের মোকাবিলা করা সহজ নয়। তাই সে চিৎকার করে বলল, 'তোমরা সবাই নদীর তীরের দিকে পালিয়ে যাও। ভুট্টার থলিগুলোকে আমাদের উদ্ধার করতেই হবে।' এ-কথা বলে সেও সেখান থেকে হঠাৎ সরে পড়ল।

'উফ! আমি দেরি করে ভীষণ বোকামি করেছি। সেই পাজি লোকটা প্রাণ নিয়ে পালাল।' এই কথা বলে গাছের ডালে বসে খড়গবর্মা লুণ্ঠনকারীদের নেতার উপর তিরের বৃষ্টি যেন বর্ষাতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে সে নিজের অনুচরদের নিয়ে নাগালের বাইরে, অনেক দূরে চলে গেল।

গণ্ডক জাতের যুবকরা তিন-চার জন লুণ্ঠনকারীকে বল্লম দিয়ে আক্রমণ করল। ততক্ষণে লুণ্ঠনকারীরা তাদের নেতার ঘোষণা শুনতে পেয়ে পড়ি-মরি করে পালাল।

গুহার ভেতর থেকে তান্ত্রিক বাইরে এল। মশাল তুলে ধরে নাড়তে নাড়তে বলল, 'আরে এই ভূত, তুই কোথায় আছিস! ভুট্টার থলেগুলো কি হাতে পড়ল না?'

সেই ভয়ংকর লোমশ ভূত নদীর তীর থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে গুহার দিকে এগোল। পথে গণ্ডক জাতের যুবকদের উপর নজর পড়তেই চিৎকার করে বলল, 'এরা যে

মহাকালের দূত— এক সিংহধারী কালো বিরাট ভয়ংকর মোষের উপর চড়ে একেবারে এসে পড়েছে!'

সেই চিৎকার কানে যেতেই তান্ত্রিক গুহা থেকে সোজা বেরিয়ে এল। মশালের আলোতে দেখতে পেল গণ্ডার এবং তার পিঠে চড়ে বসে থাকা লোকদের। দেখেই মুহূর্তকাল চমকে উঠল। কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে ভূতকে বলল, 'ওরে এই জটাধারী ভূত! আরে এই লোকগুলো মহাকালের দূত নয়, ওই এক-সিংহধারী মোষগুলো মোষ নয়। ওরা গণ্ডক জাতের লোক। আরে ওগুলো গণ্ডার, বুঝলে গণ্ডার, সাধারণ জন্তু। তুমি ওদের আক্রমণ করে প্রথমে লোকগুলোকে খেয়ে ফেলবে। তারপর ওই জন্তুগুলোকেও খেতে পারবে।'

তান্ত্রিকের কথা শেষ হতে-না-হতেই লোমশ ভূত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে চিৎকার করে বলে, 'হেই, পালিয়ো না! দাঁড়াও!' এই কথা বলেই গণ্ডক জাতের যুবকদের দিকে সে দুটো হাত ছড়িয়ে সশব্দে ধাবিত হল।

ওই ভয়ংকর রাক্ষসটাকে নিজেদের দিকে ছুটে আসতে দেখে গণ্ডক যুবকরা আর্তনাদ করে উঠল, 'হুজুর! আমরা মরে গেলাম!'

খড়্গবর্মা এবং জীবদত্ত প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিল যে গণ্ডক যুবকরা আক্রান্ত হতে পারে। তাই তারা গাছ থেকে নেমে ওদের দিকে ছুটতে ছুটতে আসছি! গণ্ডক যুবকদের আর্তনাদ শুনেই খড়্গবর্মা লোমশ ভূতের দিকে তাক করে তির ছুড়ল। কিন্তু তার শরীরে খাড়া খাড়া চুল থাকাতে তির তার গা বিদ্ধ করতে পারল না।

'গুরু! আমার দিকে কাঠের টুকরো একটা ছুড়েছে!' লোমশ ভূত বলল।

তান্ত্রিক বিস্মিত হল। এবারে সে দু-হাতে দুটো মশাল তুলে ধরল। দেখতে পেল খড়্গবর্মা এবং জীবদত্তকে। ওরা তার দিকেই যাচ্ছে। তখন তান্ত্রিক চোখ লাল করে দাঁতে দাঁত পিষে চিৎকার করে বলল, 'ওরে এই লোমশ ভূত! তোর শরীরে যেগুলো বিদ্ধ হয়ে আছে সেগুলো কাঠের টুকরো নয়, তির! তির যে ছুড়েছে তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে

ক্ষত্রিয়। আর তার সাথে যে আছে তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে আধা ক্ষত্রিয় এবং আধা তান্ত্রিক। দাঁড়া আমি আমার মন্ত্র দণ্ড ছুড়ে ওদের দু-জনকেই ভস্ম করে ফেলছি।' এ-কথা বলেই তান্ত্রিক এক লাফে গুহার ভিতর ঢুকে গেল।

ছয়

জীবদত্ত ভাবছে, গুহার ভিতর ঢুকে তান্ত্রিকের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না অন্য কীভাবে কী করবে!

খড়্গবর্মা সন্দেহ ও আশঙ্কা ভরা চোখে গুহার দিকে তাকিয়ে জীবদত্তকে বলল, 'জীবদত্ত, মনে হচ্ছে তোমার পোশাক দেখে তান্ত্রিক একটু ঘাবড়ে গেছে। সে হয়তো তোমাকেও একজন তান্ত্রিক ভেবেছে। তাই সে তাড়াতাড়ি গুহার ভিতর ঢুকে গেছে। এখন কী করবে ভাবছ?'

জীবদত্ত দেখতে পেল ওই লোমশ ভূত গণ্ডক জাতের লোকের হাতে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে এধার-ওধার ছোটাছুটি করছে।

জীবদত্ত বলল, 'আমি এইজন্যই মাথার চুল গোল করে বেঁধে হাতে মন্ত্র দণ্ড নিয়েছি। ওরা আমার রূপসজ্জা দেখে যাতে ভাবে যে আমি শুধু ক্ষত্রিয়ই নই তন্ত্রমন্ত্রও জানি। সেইজন্যই ওই তান্ত্রিক আমাকে সহজেই ভেবেছে এক তান্ত্রিক। এখন আমাদের সামনে সমস্যা হল কীভাবে আমরা কী করব! কোনো কিছু করার আগে আমাদের জানতে হবে যে এই তান্ত্রিক আসলে কে!' জীবদত্ত বলল।

'তাহলে আর দেরি কেন? গুহায় ঢুকে পড়ি?' এ-কথা বলে খড়্গবর্মা দু-চার পা এগিয়ে গেল।

জীবদত্ত খড়্গবর্মাকে অনুসরণ করতে গিয়ে একবার চারদিকে তাকাল। ঠিক সেইসময় ওখানে লোমশ ভূতটাকে মোকাবিলা করার মতো কেউ ছিল না। কিছু লোক লোমশ ভূতের হাতে মার খেয়ে আহত হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিল, কিছু লোক লোমশ ভূতের হাতে হাত-পা কাপড় পুড়িয়ে আহত অবস্থায় গোঙাচ্ছিল আর বাকি লোকগুলো নদীর তীর ধরে প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছিল।

শুধু গণ্ডক জাতের তিন জন যুবক তিন দিক থেকে বল্লম নিয়ে ঘিরে ফেলার তাল করছিল। এখন ওই লোমশ ভূত 'গুরু গুরু' বলে চিৎকার করে গুহার দিকে ছুটছিল।

'বন্ধু, তুমি একে ভূত মনে করছ নাকি? এমনও তো হতে পারে যে ওই তান্ত্রিকই এই লোকটাকে নকল রূপ ধারণ করিয়ে অভিনয় করাচ্ছে!' খড়্গবর্মা বলল।

'মানুষও যদি হয় তবু আমরা মনে করব ও মানুষ নয়। ও যে জিনিসের অভিনয় করছে আমরা তাকে তাই মনে করব।' জীবদত্ত এ-কথা বলে ওই গুহার দিকে ছুটে গেল।

খড়্গবর্মাও তাকে অনুসরণ করল।

দু-জনে যখন লোমশ ভূতকে অনুসরণ করল তখন সেও এক বাঁদরের মতো লাফাতে লাফাতে গুহার দিকে যেতে লাগল।

গণ্ডক জাতের যুবকরাও গণ্ডারের উপর চড়ে তাকে অনুসরণ করল। তারা ওই লোমশ ভূতের দিকে তাক করে বল্লম উঁচিয়ে রাখল।

হঠাৎ ওই তিন জনের একজন তাক করে বল্লম ছুড়ল ওই লোমশ ভূতের দিকে। বল্লম তার পিঠে লেগে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গড়াতে গড়াতে পাহাড়ের নীচে পড়ে গেল।

গণ্ডক জাতের এক যুবক গণ্ডার থেকে নেমে জীবদত্তের কাছে এসে বলল, 'কর্তাবাবু একটা মস্তবড়ো ভুল হয়ে গেছে। আমাদের কাছে একটা মজবুত দড়ি থাকলে ভূতটাকে ধরে বাঁধা যেত। মনে হচ্ছে আমার বল্লমের আঘাতে সে চোট পায়নি। তার শরীরটাকে ওই লোমগুলো যেন বর্মের মতো রক্ষা করছে।'

'তোমার কথামতো এবার আমরা ওই ভূতটাকে দড়ি ছুড়ে বাঁধব। তোমরা এইখানেই থাক। আমরা গুহার ভেতর ঢুকে ওই ভূত এবং তার তান্ত্রিককে ধরে নীচে ফেলে দেব।' জীবদত্ত বলল।

জীবদত্ত ও খড়্গবর্মা পাহাড়ের ওই গুহার কাছে পৌঁছানোর আগেই ওই ভূত গুহার কাছে গিয়ে বলল, 'গুরু, গুরু, এক-সিংওয়ালা মোষে চড়ে আসা যমদূতদের সাথে আরও দু-জন জুটেছে গুরু। ওরা সবাই মিলে আমাদের গুহার দিকে আসছে। তুমি গুরু, তাড়াতাড়ি ওদের ভস্ম করে দাও গুরু!'

কিন্তু গুহার ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ এল না। লোমশ ভূত ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পিছনের দিকে তাকাল। তার চোখে পড়ল খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত। তৎক্ষণাৎ সে চিৎকার করে উঠল। আর্তনাদ করে বলল, 'গুরু, তাড়াতাড়ি ওদের ভস্ম করুন।'

'আরে এই লোমশ ভূত! পালিয়ো না। আমরা তোমার গুরুর গুরু। তুমি তোমার গুরুকে বের করে নিয়ে এসো।' এ-কথা বলে জীবদত্ত হাতের মন্ত্র দণ্ড উপরে তুলে লোমশ ভূতের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে লাগল। ঠিক সেই মুহূর্তে গুহার ভেতর থেকে আওয়াজ পেয়ে 'যাচ্ছি, গুরু! যাচ্ছি!' বলে লোমশ ভূত গুহার ভেতর ঢুকে গেল।

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত মুহূর্তে গুহার ভেতর ঢুকে গেল। কিন্তু তারা সেই লোমশ ভূতকে আর দেখতে পেল না। গুহার মাঝ থেকে চার-পাঁচ ফুট জায়গা জুড়ে আগুন জ্বলছিল।

তার অদূরে কয়েকটা তেলে ভেজা মশাল ছিল। ওই আগুনের আলোতে সমস্ত গুহায় ওরা ওই লোমশ ভূত ও তান্ত্রিককে খুঁজল।

দশ-বারো ফুট চওড়া, কুড়ি-বাইশ ফুট লম্বা ওই গুহার কোথাও ওদের পাত্তা পেল না। ওরা ভাবল এই গুরু-শিষ্য দু-জনে মিলে গেল কোথায়?

'জীবদত্ত, তুমি কি মনে কর যে এই পাজি বদমাইশ লোকগুলোর অদৃশ্য হবার শক্তি আছে?' খড়্গবর্মা বলল।

'অত ক্ষমতা থাকলে তারা নিশ্চয় ওই লুণ্ঠনকারীদের লুঠ করে আনা ফসল হাতানোর জন্য এত কাণ্ড করত না। ওরা যা করেছে সে তো চোরের উপর বাটপাড়ি করার তাল। এই গুহা থেকে বেরিয়ে বাইরে পালানোর অবশ্যই কোনো গোপন পথ আছে। আমরা সাবধানে এক-একটা পথ ঘুরে ঘুরে দেখতে পারি।' জীবদত্ত বলল।

তারপর তারা দু-জনে গুহার প্রত্যেকটি পাথর জোরে ঠেলে ঠেলে একটা একটা পাথর পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

আধ ঘণ্টা ধরে ওরা প্রত্যেকটা পাথর ঠেলতে লাগল। হঠাৎ একটা চৌকানো পাথর নড়ে উঠল। সেই পাথরটা চার-পাঁচ ফুট উঁচুতে রাখা ছিল।

পাথরটা একটু পিছু সরতেই জীবদত্ত খড়্গবর্মাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলল, 'খড়্গবর্মা, ওই তান্ত্রিক আর লোমশ ভূত এই পথে পালিয়েছে! পালিয়ে যাবার সময় আবার পাথরটাকে তারা যেমন ছিল তেমন বসিয়ে দিয়েছে। আমার ধারণা ওরা এর পিছনেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছে।'

'তাহলে তোমার কি ধারণা যে আমরা এই পাথর সরিয়ে ঢোকার সাথে সাথে ওরা আমাদের বল্লম দিয়ে আক্রমণ করবে? তরবারি দিয়ে কেটে ফেলবে নাকি?' খড়্গবর্মা বলল।

'হ্যাঁ, সেটাই আমার সন্দেহ।' জীবদত্ত বলল।

'তাহলে তুমি এক কাজ কর। আমরা দু-জনে মিলে পাথরটাকে ঠেলে দেবার সাথে সাথে তুমি সরে যাবে। আমি ভেতরে একটা মশাল ছুড়ে দেব। দেখব কেউ আক্রমণ করতে আসে কি না। যদি না আসে তাহলে ওই মশালের আলোতে আমরা জায়গাটা দেখে নিতে পারব। আলোতে দেখার পর আমরা এক-পা এক-পা করে এগোতে পারি।' খড়্গবর্মা বুঝিয়ে বলল।

'খড়্গবর্মা তুমি যেভাবে কাজ করতে বলছ তা খুব একটা ভালো না হলেও অগত্যা এখন অন্য কোনোভাবে কী করা যায় তাও আমি ভেবে পাচ্ছি না। এই অবস্থায় তাই করা যাক।' জীবদত্ত বলল।

জীবদত্তের সমর্থন পাবার সাথে সাথে খড়্গবর্মা গুহার মাঝের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে দুটো মশাল ধরাল। খড়্গবর্মা সেই জ্বলন্ত মশাল দুটো দু-হাতে তুলে দেখল।

তারপর ওরা সেই চৌকোনো পাথরটাকে সরিয়ে দিল। সেই পাথরটা গড়িয়ে নীচে পড়ে যাওয়াতো দূরের কথা পাশেই জানালা দরজার মতো দাঁড়িয়ে গেল।

সেখান থেকে তারা দেখতে পেল এক সুড়ঙ্গ। জীবদত্ত একপাশে বসে পড়ল। খড়গবর্মা ওই সুড়ঙ্গে হাতের দুটো মশাল ছুড়ে দিল।

রুদ্ধশ্বাসে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত কিছুক্ষণ কান খাড়া করে রইল। সুড়ঙ্গের গভীর থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। আরও কিছুক্ষণের কৌতূহলী প্রতীক্ষার পর খড়গবর্মা হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'বন্ধু, ওই বদমাইশগুলো নিশ্চয় পালিয়েছে। আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে ওরা সরে পড়েছে। আমার মনে হচ্ছে আরও একটা গুহা আছে। তা না হলে ওরা গেল কোথায়?'

'তাই হবে। আবার এও হতে পারে যে আমরা গুহায় ঢুকেছি জানতে পেরে তরবারি হাতে তারা আমাদের আক্রমণ করার প্রতীক্ষায় ওত পেতে আছে। অতএব আমাদের সব কিছু অত্যন্ত সাবধানে করতে হবে।' জীবদত্ত বলল।

'আর কতক্ষণ অপেক্ষায় থাকব! ভোর হয়ে এল যে!' এ-কথা বলে খড়গবর্মা খাপ থেকে তরবারি বের করে ওই সুড়ঙ্গের ভেতরের দিকে ঝুঁকে তাকাল। ঠিক তখনই জীবদত্ত বল্লম ছুড়ে মারল ওই সুড়ঙ্গে।

খড়গবর্মার ছুড়ে দেওয়া মশালের আলোতে ওই সুড়ঙ্গের এক কোণে অন্য এক সুড়ঙ্গের পথ দেখে বলল, 'খড়গবর্মা, চল ওই পথ ধরে আর এক সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ি। ওই পাজি তান্ত্রিক নিশ্চয়ই ওই সুড়ঙ্গের কোনো গোপন জায়গায় লুকিয়ে আছে। ব্যাটারা আমাদের অনেক জ্বালাচ্ছে তো! আজ ওদের শেষ করতে হবে।'

এই কথা বলে জীবদত্ত ঝট করে ওই সুড়ঙ্গে নেমে গেল। খড়গবর্মাও তাকে অনুসরণ করল।

সুড়ঙ্গের সেই অংশে ছোটো-বড়ো পাথর ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। খড়গবর্মা খোলা তরবারি উঁচিয়ে সুড়ঙ্গপথে এগিয়ে গেল।

জীবদত্ত মন্ত্র দণ্ড নিয়ে সরবে খড়গবর্মাকে অনুসরণ করতে লাগল।

ওই পথে এগোতে এগোতে তারা সামনে দেখতে পেল নগরের এক বিশাল প্রান্তর।

সেই প্রান্তরের পাশে বিরাট বিরাট শিথিল নগরের বাড়ি। সেই অট্টালিকা দেখে জীবদত্ত আনন্দিত হয়ে বলল, 'খড়গবর্মা, সূর্যোদয়ের সময় হয়ে এসেছে। আর আমরাও পৌঁছে গেছি সমতলভূমিতে। এই তো শিথিল নগরের বাড়ি।'

'এই কি শিথিল নগর? এখানে কী আছে? কয়েকটা বাড়ি ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ছে না।' খড়গবর্মা বলল।

'শিথিল নগরের এই অংশই হয়তো সবচেয়ে সমৃদ্ধ। তান্ত্রিক ও লোমশ ভূত এই বাড়িগুলোর কোনটাতে হতে পারে। ওকে যেকোনোভাবে খুঁজে বের করতে হবে।' জীবদত্ত বলল।

জীবদত্তের অনুমান মতো তান্ত্রিক ও লোমশ ভূত ওই বাড়িগুলোর কোনোটাতে লুকিয়ে ছিল না।

তারা এক মণ্ডপের উঁচু আসনে বসে থাকা এক দেবী মূর্তির সাজে সজ্জিত নারীর সামনে বসেছিল। ওই নারীর আশেপাশে ভয়ংকর আকৃতির লোক অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে ছিল।

ওই নারী চোখ লাল করে দাঁতে দাঁত ঘষে গর্জে উঠল, 'ওরে এই তান্ত্রিক, লোমশ ভূত উঠে দাঁড়া। তোদের মূর্খতার ফলে এই রহস্যময় পবিত্র স্থানের সন্ধান মানুষ পেয়ে গেছে।'

'মহাশক্তি, আপনার অনুমতি পেলে এক্ষুনি ওই দু-জন মানুষকে আপনার সামনে এনে এই লোমশ ভূতের আহার করে ফেলতে পারি।' তান্ত্রিক কাঁপতে কাঁপতে বলল।

নারী অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে দু-হাত উপরে তুলে নাড়াতে নাড়াতে বলল, 'তোমার লোমশ ভূত এমন বোকা আর অকর্মার ঢেঁকি হয়ে গেছে যে খাবার মুখের সামনে এগিয়ে দিলেও খেতে পারে না। মহাভূতের দয়ায় ওই দু-জন মানুষ এখানে পৌঁছে গেছে। ওরা কারা? কোত্থেকে এসেছে? কেন এসেছে? এসব প্রশ্নের জবাব না জেনে ওদের বলি দেওয়া মহাভূতের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।'
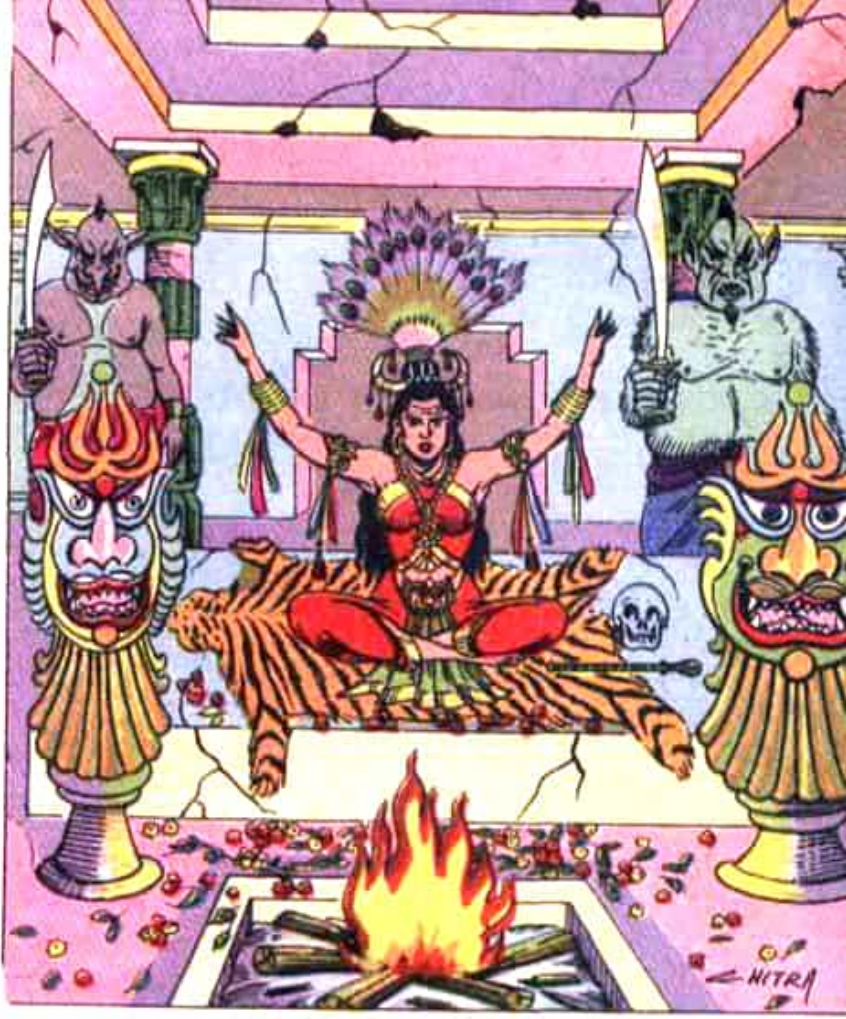
'আজ্ঞে হাঁ মহাশক্তি, আপনার কথা আমরা সবাই এখন ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি।' সেখানকার সমস্ত সেবক সমস্বরে বলল।

ওই নারী সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন আমি যা বলছি কান খাড়া করে শোন মূর্খের দল! ওই দু-জন মানুষকে কোনোরকম জখম না করে নিরাপদে আমার কাছে নিয়ে এসো। সূর্যোদয় হয়েছে। ওরা এই শিথিল নগরের কোথায় কী আছে দেখতে বেরিয়েছে। তোমাদের মধ্যে কয়েক জন ছদ্মবেশে ওদের অনুসরণ কর। ওরা কী করছে, কোথায় যাচ্ছে, কোন কথা বলছে সব ভালো করে দেখে-শুনে শেষে ওদের দু-জনকে ধরে, আমার কাছে নিয়ে এসো। ঠিক মধ্যাহ্নে আসবে আমার কাছে। ইতিমধ্যে ওরা যেখানে যেতে চায় যাক। যা করতে চায় করুক।'

'আজ্ঞে তাই হবে মহাশক্তি!' এ-কথা বলে ওই নারীর চার জন সেবক তান্ত্রিক এবং লোমশ ভূত ওই মণ্ডপ থেকে চলে গেল।

'গুরু, পিছন দিক থেকে গিয়ে আমি কিন্তু ওই দু-জনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। খেয়ে ফেলব ওই দু-জনকে। ওই ব্যাটাদের জন্যই মহাশক্তির কাছে আমাকে বকা খেতে হল।'

লোমশ ভূত বলল।

'তোমার চেয়ে অনেক বেশি অপমানিত হয়েছি আমি।' এই কথা বলে একটি ছোরা হাতে তুলে নিয়ে শক্তভাবে ধরে তান্ত্রিক বলল, 'দেখ, ওরা দু-জনে এই সুড়ঙ্গের মুখেই বসে আছে। আমরা ওই দু-জনকে মেরে ফেলে সোজা অরণ্যপথ ধরে পালাব। চল আর দেরি নয়।'

পরক্ষণেই ওরা খড়গবর্মা ও জীবদত্তের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

সাত

শিথিল ভবনগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে জীবদত্ত অবাক হয়ে ভাবছিল, কবেকার এই ভবন, কারা ছিল এই ভবনে, কেন এই ভবন জনমানবহীন হয়ে গেল। ইত্যাদি। অন্যদিকে খড়গবর্মার মাথায় অন্য চিন্তা, কতক্ষণে তান্ত্রিক এবং লোমশ ভূতকে ধরা যায়, তাদের মেরে ফেলা যায়।

কিছুক্ষণ খড়গবর্মা ও জীবদত্ত নিজের নিজের চিন্তাভাবনায় ডুবে ছিল। কারো মুখে কথা নেই। সেইসময় হঠাৎ একটা শব্দ তাদের কানে গেল। কাছের দরজার পাশ থেকে কোনো ভারী জিনিস সরানোর শব্দ তারা পরিষ্কার শুনতে পারল।

সেই শব্দ কানে যেতেই খড়গবর্মা চটপট উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'জীবদত্ত! এই শব্দ কীসের বলত? ওই দুই পাজি বদমাইশগুলো আমাদের উপর আক্রমণ করার তাল করছে না তো? কী করা যায় বলত? তাড়াতাড়ি ভেবে বল। মনে হচ্ছে খুব দেরি করা যাবে না। মনে রেখো, কিছু করে যেন আবার ওদের খপ্পরে পড়ে না যাই।'

'আবার এ-কথাও তুমি ভেবো না যে ওই তান্ত্রিক লোমশ ভূত আগে-পিছে না ভেবে হঠাৎ আমাদের আক্রমণ করার সাহস রাখে। যাই হোক, আমাদের ভীষণ সতর্ক থাকতে হবে।' এই কথা বলে জীবদত্ত উঠে দরজার কাছে গেল।

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত এক-পা এক-পা করে ওই শিথিল ভবনের পাথরের দরজার ওপারের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল। হঠাৎ দরজার কাছে তান্ত্রিক লাফিয়ে পড়ে চিৎকার করে বলল, 'ওরে এই নর! তোমাদের দু-জনকে আমি এক্ষুনি মহাভূতের কাছে বলি দেব!' তান্ত্রিক জীবদত্তের গলায় তরবারি চালাল।

খড়গবর্মা তৎক্ষণাৎ নিজের তরবারি দিয়ে তান্ত্রিকের তরবারি রুখে বলল, 'চুপ কর আহাম্মক, অতই যদি আমাদের বলি দিতে চাও তো আগে দাওনি কেন? অত বকবক করছ কেন? আমাদের আর বলি দিতে হবে না, এখন তুমি নিজের প্রাণ বাঁচাও। তোমার চালবাজির, তোমার দুষ্কর্মের উচিত শিক্ষা এক্ষুনি পাবে। তৈরি হও।' তারপর খড়গবর্মা

তান্ত্রিকের হাত ধরে জোরে টান দেয়। তান্ত্রিক সরে গেল আর সশব্দে দরজা থেকে নীচে পড়ে গেল।

ঠিক তখনই দরজার ওপার থেকে অনেকগুলো কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ওরে এই পাগলা তান্ত্রিক। আমাদের পূজারিনি ওদের মেরে আনতে বলেননি!'

ইতিমধ্যে 'বলি বলি' বলে চিৎকার করতে করতে লোমশ ভূত বাঁদরের মতো দরজায় লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সে জানত না তার গুরুর কি দশা হয়েছে!

লোমশ ভূত দরজার পাশে দেখতে পেল তার গুরু ধুলোয় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। এই না দেখে লোমশ ভূত আর্তনাদ করে উঠল। আর সেই মুহূর্তে জীবদত্ত তার পা ধরে জোরে একটা টান মারল। লোমশ ভূত নীচে পড়ে যাচ্ছিল এমন সময় তার পেটে সে কষে একটা লাথি মেরে বলল, 'খড়গবর্মা, আর বেশিক্ষণ আমাদের এখানে থাকা উচিত হবে না। এই গোটা অঞ্চল মনে হচ্ছে যেন তান্ত্রিকের বিবর। আমাদের তাড়াতাড়ি ওই মহলে ঢুকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। তাড়াতাড়ি চল।'

পরক্ষণেই ওরা দু-জনে শিথিল ভবনের দিকে ছুটল। একটি ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে ঘুরে তাকাল। কেউ পেছন দিক থেকে তাদের অনুসরণ করছে কি না দেখার জন্য। কিন্তু ওই লোমশ ভূত ও তান্ত্রিক ছাড়া আর কাউকে তারা দেখতে পেল না।

'দরজার ওপার থেকে একসাথে কয়েক জনের হুঁশিয়ারি তুমি শুনতে পাওনি?' খড়গবর্মা জিজ্ঞেস করল।

'এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? ওই হুঁশিয়ারি শুনে আমার মনে হল শিথিল ভবনের পূজারিনি ওদের যেরকম নির্দেশ দিয়েছেন ওরা সেটাই বলেছিল। আমাদের জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে পূজারিনি বলেছেন। এখন আমাদের সাবধানে ওই পূজারিনিকে ধরার চেষ্টা করতে হবে। এরা বেচারা সব তো ওই পূজারিনির চাকর মনে হচ্ছে। এদের ধরে কী হবে! এ তো সব ভাড়া করা টাট্টু ঘোড়া।' জীবদত্ত বলল।

এরপর তারা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল। শত্রু কোনদিক থেকে তাদের আক্রমণ করবে, তার আভাস পাওয়ার আশাতেই তারা দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তারা কিছুতেই টের পেল না। লোমশ ভূত আর তান্ত্রিক ওই দরজার কাছে পড়ে পড়ে গোঙাচ্ছিল। শুধু ওদের গোঙানি ছাড়া আর কোনো শব্দ তারা শুনতে পেল না।

খড়গবর্মা দরজার দিকে এক মুহূর্ত তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দেখে বলল, 'জীবদত্ত, এই ভারী কাঠের দরজার দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে দেখ। মনে হচ্ছে এই দরজার পিছন দিক দিয়ে অন্য মহলে যাওয়ার পথ আছে। ওই দরজা ঠেলে দেখলে কেমন হয়?'

'এ ছাড়া উপায় বা কি আছে! আমরা এখানে এভাবে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব! ওই তান্ত্রিক আর তার লোমশ ভূতটাকে ছেড়ে চল আমরা আরও রহস্যের সন্ধান করি। তবে মনে রেখ, দরজা খুব সাবধানে সরাতে হবে। যাদের গলা আমরা পেয়েছি ওরা হয়তো ওই মারাত্মক দরজার কাছাকাছি আছে। হয়তো ওখান থেকে ওরা তাক করে বসে আছে আমাদের আক্রমণ করতে।' জীবদত্ত বলল।

তারপর খড়গবর্মা একহাতে তরবারি তুলে অন্য হাতে জোরে দরজা ঠেলল। কিরর আওয়াজ হল। দরজা নড়ল। কিন্তু খুলল না।

'আচ্ছা এও তো হতে পারে যে দরজা ওদিক থেকে বন্ধ করা আছে। খিল আঁটা আছে? যার ফলে খুলছে না।' এই কথা বলে জীবদত্ত দু-হাতে দরজা জোরে ঠেলে দিল। তখন ভয়ংকর আওয়াজের সাথে দরজা খুলে গেল।

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত ভিতরে ঢুকল। ঢুকেই দেখে বিরাট ঘর। কোনো মানুষ ওই ঘরে থাকে বলে মনে হল না। ঘরের আনাচেকানাচে বড়ো বড়ো মাকড়সার জাল। চাপ চাপ চামচিকের দল। ওই ঘরের একদিকের দরজা ভাঙা আর অন্যদিকেরটা হেলান দেওয়া।

'আর দেরি করে কী লাভ? ভিতরে যখন এসেই গেছি, তখন ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটা ঘর দেখব। তান্ত্রিকের কর্ত্রী পূজারিনিকে খুঁজে বের করতেই হবে।' জীবদত্ত বলল।

দু-জনে মিলে ওই দরজা পেরিয়ে অন্য ঘরে ঢুকল। ওই ঘর প্রথম ঘরের চেয়ে আরও ভয়ংকর ছিল। ওদের দেখেই কয়েকটি বিরাট ইঁদুর কোঁক কোঁক ডাকতে ডাকতে লাফিয়ে এদিকে ওদিকে চলে গেল। বাজের মতো বড়ো পেঁচা হঠাৎ নেবে একটা ইঁদুর ধরে সোজা উঠে একটা জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'বাবা এ কেমনতর ইঁদুর, আর কী ধরনের পেঁচারে বাবা! এতকাল যত বড়ো দেখে এসেছি এ দেখছি তার চেয়ে তিন-চার গুণ বড়ো। আচ্ছা এরা কী খায়? কী খেয়ে এত বড়ো বড়ো হয়েছে?' খড়গবর্মা জিজ্ঞেস করল।

পূজারিনি হয়তো নিজের মোটা মোটা শিষ্যদের মেরে-কেটে এদের মাঝে ফেলে দেন।' এ-কথা হাসতে হাসতে বলল জীবদত্ত। মুহূর্তকাল পরে আবার আরও কত বিচিত্র জিনিস দেখতে পাব কে জানে!'

এইভাবে আরও কয়েকটা ঘর তারা লক্ষ করল। কোনো মানুষ থাকার চিহ্ন নেই।
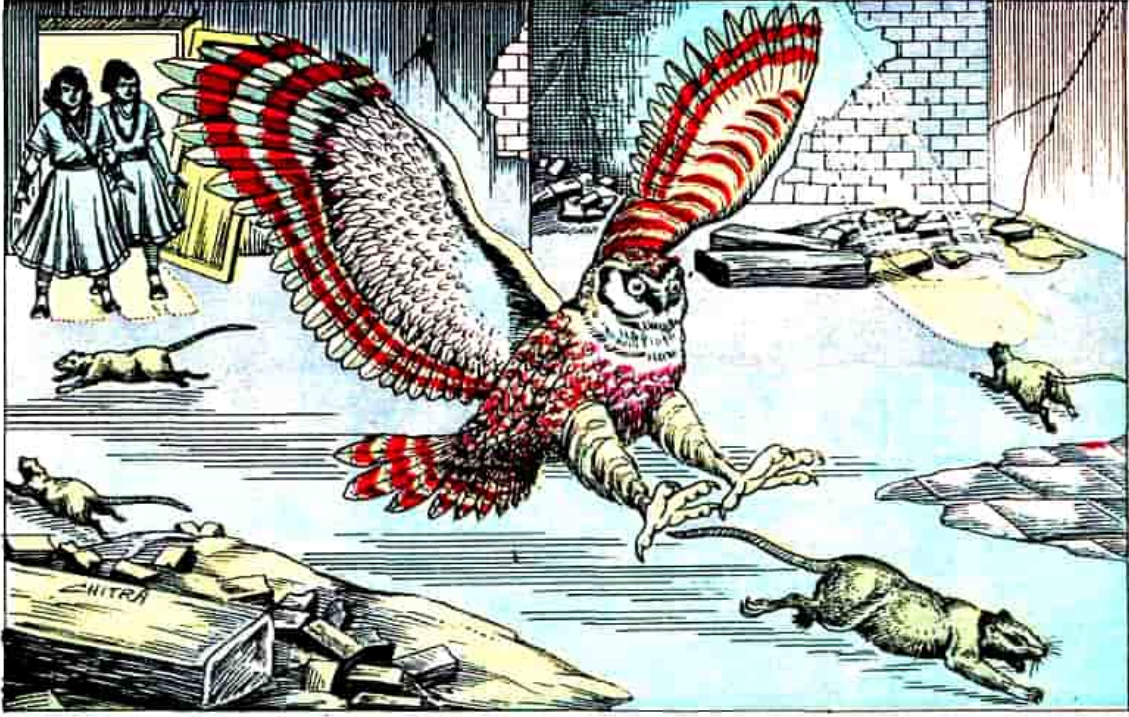
'খড়গবর্মা, আমার মনে হচ্ছে এই পূজারিনির আদেশ শিষ্যরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। আমাদের হয়তো কেউ অনুসরণ করছে। পূজারিনির আদেশ ছিল না আমাদের জ্যান্ত ধরে নিয়ে যাওয়ার? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কোন ঘর দিয়ে আমরা কোন ঘরে ঢুকে পড়লাম।' জীবদত্ত বলল।

'তাহলে আবার আমরা ফিরে যাব?' খড়গবর্মা জিজ্ঞেস করল।

'আর কী বা করতে পারি। এই শিথিল নগর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ ওই গুহা ছাড়া আর কি আছে! এখন অতদূর পৌঁছাতে পারব কি না কে জানে!' জীবদত্ত বলল।

'আমরা যে কোন পথে এসেছি তা ভুলে গেছি। কোনোভাবে এই ঘরগুলোর বাইরে গিয়ে ওই লোমশ ভূত আর তান্ত্রিককে মেরে ফেলে এই পূজারিনির খবর জানব।' খড়গবর্মা বলল।

এই কথা বলে ওরা পিছু ফিরে দু-চার পা যেতে-না-যেতেই তাদের মাথায় একসাথে অনেকগুলো লাঠির ঘা পড়ল। তারা সাথে সাথে মাথা ঘুরে চোখ উলটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ পূজারিনির চার জন শিষ্য ওদের ধরে পরীক্ষা করে দেখল রক্ত বেরিয়েছে কি না। না, এক ফোঁটাও রক্ত বেরোয়নি।

'বাবা, আমাদের বরাত ভালো। ভেবেছিলাম এদের মাথা ফেটে গেছে। এরা মরে গেলে মহাশক্তি পূজারিনি আমাদের জানে মেরে ফেলত। এ-যাত্রা খুব জোর বেঁচে গেছি!' একজন

বলল।

'এরা যাতে লাঠির আঘাতে না মরে তারজন্যেই তো লাঠির আগায় আমরা কম্বলের টুকরো জড়িয়ে ছিলাম। এদের হাত-পা বেঁধে এবার ঘাড়ে করে নিয়ে যাই পূজারিনির কাছে।' আর একজন শিষ্য বলল।

অচেতন খড়গবর্মা ও জীবদত্তের হাত-পা বেঁধে ওরা কাঁধে ফেলে নিল। অনেকগুলো অন্ধকার ঘর পেরিয়ে ওরা শেষে আনল এক বিরাট মণ্ডপে।

মণ্ডপের মাঝে উঁচু মোলায়েম জায়গায় বসে ছিল পূজারিনি। অদূরে হাত বাঁধা অবস্থায় কয়েক জন দাঁড়িয়েছিল। পূজারিনি একবার খড়গবর্মা ও জীবদত্তের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'এদের মধ্যে একজন মনে হচ্ছে তান্ত্রিক!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা হতে পারে মহাশক্তি পূজারিনি। এর হাতে একটা মন্ত্র দণ্ডও ছিল। অন্যজনের হাতে ছিল এক তরবারি।' একজন শিষ্য বলল।

'কোথায় সেগুলো? ফেলে আসোনি তো ওসব? পূজারিনি জিজ্ঞেস করল।

'যেখানে এদের ধরেছি সেখানেই ওসব ছেড়ে এসেছি।' শিষ্য বলল।

'যাও, ওসব নিয়ে এসো। তোমাদের মাথায় একেবারে গোবর ভরা দেখছি।' পূজারিনি চোখ লাল করে বলল।

পূজারিনির আদেশ শোনামাত্র দু-জন সেবক ছুটে গিয়ে সেখান থেকে তরবারি ও মন্ত্র দণ্ড নিয়ে এসে পূজারিনির সামনে সাজিয়ে রেখে দিল। পূজারিনি কিছুক্ষণ সাবধানে ওই দুটো পরীক্ষা করে দেখে বলল, 'মনে হচ্ছে এ দুটোতেই বিশেষ কোনো শক্তি নেই। এদের দু-জনকে একটা ঘরে রাখ। এই তরবারি এবং মন্ত্র দণ্ড তাদের পাশে ফেলে রাখ। তারপর দেখি কী হয়!'

তৎক্ষণাৎ চার জন সেবক ওই অচেতন দু-জনকে কাঁধে ফেলে একটা অন্ধকার ঘরে ফেলে রেখে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে শিকল এঁটে দিল।

অনেকক্ষণ পরে জীবদত্তের জ্ঞান ফিরল। সে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে খড়গবর্মাকে ডেকে তুলে বলল, 'বন্ধু, সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল আমরা এখনও প্রাণে বেঁচে আছি। আমাদের অস্ত্রও আমাদের কাছে আছে।'

খড়গবর্মা ঘরের চারদিকে একবার ভালো করে দেখে বলল, 'আমাদের না মেরে এভাবে ছেড়ে দেবার পিছনে পূজারিনির কোনো কৌশল থাকতে পারে।'

'পূজারিনিকে না দেখে তার কৌশল যে কি তা বুঝতে পারছি না। এখান থেকে আমাদের তাড়াতাড়ি পালানো উচিত।' বলে জীবদত্ত উঠে দাঁড়াল।

'ওই পাজিগুলো তক্কে তক্কে ছিল। সুযোগ পেয়ে আমাদের মাথায় লাঠি চালিয়েছে। এবার কোনোক্রমে আমাদের হাতে পড়লে ওদের প্রাণে...'

খড়গবর্মার কথা শেষ হল না। ওদের কানে গেল সিংহ গর্জন। তখন খড়গবর্মা বলল, 'পাজিগুলো চাইছে আমাদের উপর সিংহ লেলিয়ে দিতে।'

'তাহলে তো ভালোই হবে। সিংহকে ঘুরিয়ে আমরা ওদের পিছনেই লেলিয়ে দিতে পারব। ওদের এই গোটা অঞ্চল তছনছ করে দিতে পারব। মারাত্মক অবস্থা হবে এখানকার।' এই কথা বলে জীবদত্ত নিজের মন্ত্র দণ্ড দিয়ে দরজায় জোরে জোরে আঘাত করল। দরজার একটা অংশ হুড়মুড় করে পড়ে গেল নীচে। পাশের ঘরের সিংহ যেন চমকে উঠল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে গর্জন করতে লাগল।

'হে সিংহরাজ, যত ইচ্ছা তুমি খেতে পার। অনেক খাবার আছে।' এই কথা বলে জীবদত্ত নিজের দণ্ড দিয়ে অন্য এক দরজায় আঘাত করে ভেঙে দিল। দরজা ভেঙে নীচে পড়ে গেল।

পরক্ষণেই পূজারিনির দশ-বারো জন সেবক চিৎকার করে বলল, 'বন্দিরা পালাচ্ছে! ধর! ধর!' তৎক্ষণাৎ জীবদত্ত সিংহের কাছে ছুটে গিয়ে ওই দণ্ড দিয়ে পূজারিনির সেবকদের দিকে সিংহকে ফিরিয়ে দিল। সিংহ গর্জন করতে করতে ওই সেবকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আট

ক্ষুধার্ত সিংহ পূজারিনির লোকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছিল। কিন্তু সিংহ যাকেই তার থাবার মধ্যে পেল তাকেই ঘায়েল করে দূরে ছুড়ে দিল।

খড়গবর্মা এবং জীবদত্ত ভাঙা দরজার এক ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অট্টহাসি হেসে বলতে লাগল, 'ওরে পূজারিনির চাকরের দল। পালাচ্ছিস কোথায়? চার-পাঁচ দিন সিংহকে খেতে দিসনি! তোরা পালালে ও খাবে কী? প্রথমে তোদের কেউ এসে তার পেটে যা, তা না হলে প্রত্যেকেই সিংহের থাবা খাবি, ঘায়েল হবি।'

পূজারিনির লোকদের তখন কথা শোনার অবস্থা ছিল না। তাদের চার-পাঁচ জন ইতিমধ্যেই ঘায়েল হয়ে মাটিতে পড়ে ছটফট করছিল। একজন সিংহের মুখে আটকে চিৎকার করছিল। এর মধ্যে কয়েক জন কোনোমতে বেঁচে গিয়ে ভাঙা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছিল।

সিংহ একবার চারদিকে তাকাল। তাকে দেখে মনে হল সে কাউকে খেতে চায় না। পালাতে চায় বনে।

সিংহকে নিজের দণ্ড দেখিয়ে জীবদত্ত বলল, 'সিংহরাজ! তুমি ভাবছ কাউকে খেলে তোমার ক্ষতি হবে। কেউ দেখে ফেলবে। তুমি আর কোনোদিন পালাতে পারবে না। কোনো ভয় নেই। এই পাশ দিয়ে সিঁড়ি আছে। এই পথ ধরে গেলেই তুমি শিথিল ভবনগুলো পাবে। সেখান থেকে সোজা বেরিয়ে গেলেই বনে যেতে পারবে।' এই কথাগুলো বলতে বলতে জীবদত্ত সিংহের দিকে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে দণ্ড দিয়ে সিংহকে সিঁড়ির পথ দেখিয়ে দিল।

সিংহ গর্জন করতে করতে জীবদত্তের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। পেছনের দুটো পায়ে ভর দিয়ে সামনের দুটো পা তুলে দাঁড়াতেই জীবদত্ত সিংহের পেটের নীচে দণ্ড ঠেকিয়ে জোরে পাশে ঠেলে দিল। সেই ঠেলা খেয়ে সিংহ নীচে পড়ে গড়াতে গড়াতে সিঁড়িওলা কামরার দরজার কাছে গিয়ে আটকে গেল।

'সিংহরাজ! এবার উঠে দাঁড়াও। পূজারিনির সেবকেরা পূজারিনির কাছে খবর দেওয়ার আগেই তুমি এখান থেকে পালাও। এ ছাড়া তোমার রক্ষা নেই!' জীবদত্ত দণ্ড তুলে সিংহের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

ভাঙা দরজার কাছে পূজারিনির লোকগুলো দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। তারা অবাক হল জীবদত্তের সাহস দেখে। কেমন করে দণ্ড দিয়ে সিংহকে ঠেলে দিল! ওদের একজন জীবদত্তকে নমস্কার করে বলল, 'হে মহাতান্ত্রিক শিরোমণি! আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনার মন্ত্রশক্তি সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে। মহাশক্তি পূজারিনিকে বধ করে আপনিই শিথিল নগরের শাসনভার গ্রহণ করুন। আমরা আপনার অধীনে ভালোভাবে থাকব। পূজারিনির জ্বালায় আমরা মরে যাচ্ছি। একজন নারীর অধীনে থাকার চেয়ে একজন মহাবরের সেবক হয়ে থাকা অনেক বেশি সম্মানের।'

তার কথা শেষ হতে-না-হতেই ওর সাথী 'গুরুদ্রোহ! গুরুদ্রোহ!' বলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাঙা দরজার কাছে দু-জনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হল। পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে দু-জনেই পা হড়কে নীচে পড়ে গেল। সিঁড়ির কাছে ছিল সিংহ। সে গর্জন করতে করতে ওদের দিকে এগিয়ে গেল।

জীবদত্ত দণ্ড তুলে রেগে গিয়ে কর্কশ স্বরে বলল, 'তুমি সিঁড়ি থেকে নেমে সোজা নিজের পথ ধর। পূজারিনির অনুচরদের ঝগড়ার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ো না। যাও, পালাও।'

সিংহ আগেই ওই দণ্ডের গুঁতো খেয়েছিল তাই আবার সেই দণ্ড উঁচিয়ে জীবদত্ত কথা বলতেই সিংহ গোঁ গোঁ করতে করতে চলে গেল সেখান থেকে।

খড়গবর্মা এতক্ষণ চুপচাপ সব দেখছিল। আর থাকতে পারল না। সে বলল, 'জীবদত্ত, আমরাই বা এখানে আর থাকব কেন? এখন এখানে আর আমাদের বাধা দেবার কেউ নেই। আমরাও এখন এই শিথিল ভবন ছেড়ে চলে যেতে পারি।'

'ভালো কথা, সিংহ যে পথে গেছে আমরাও সেই পথে গিয়ে দেখে নিতে পারব গুহা থেকে বেরুনোর রাস্তা।' বলতে বলতে জীবদত্ত এগিয়ে গেল।

শিথিল ভবনে এখন আর তাদের মোকাবিলা করার কেউ নেই বলে ভাবাটা খড়গবর্মার মোটেই উচিত হয়নি। কারণ পূজারিনি ততক্ষণে খবর পেয়ে গেছে যে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত এখন মুক্ত। তার সেবকদের সিংহ আক্রমণ করেছে। সিংহের থাবা খেয়ে কয়েক জন সেবক ভীষণভাবে ঘায়েল হয়েছে।

খবরটা একজন সেবকের কাছ থেকে পেয়েই পূজারিনি চোখ লাল করে বলল, 'হে মহাভূত! এ কেমন অদ্ভুত কাণ্ড! বৃদ্ধ পূজারির মতো মহান ব্যক্তিকেও আমি মন্ত্রের প্রভাবে পরাজিত করে অন্ধকার ঘরে আটকে রেখেছি! আমাদের শক্তি অপরিসীম। সাধারণ দুটো মানুষ আমাদের উপর আক্রমণ করল? আমার রাজ্যে ঢুকে আমারই লোককে অপমান করার মতো সাহস ওরা পায় কোথা থেকে? এ আমি কোনোমতেই সহ্য করব না। ওরে এই উজবুক সেবকের দল। আমাকে দেখিয়ে দে ওই মানুষ দুটো কোথায়! আমি নিজে গিয়ে তাদের বন্দি করব।'

পূজারিনির দু-জন সেবক আগেই দেখেছিল জীবদত্ত এবং খড়গবর্মার অসীম ক্ষমতা। ওরা দেখেছিল কীভাবে ওরা সিংহকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওরা দেখেছিল কীভাবে ওরা লোমশ ভূতকে ল্যাজে-গোবরে অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল। সেসব ঘটনা ওরা মনে রেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'মহাশক্তি পূজারিনি! মানুষ দুটো মনে হচ্ছে মস্তবড়ো তান্ত্রিক। ওরা আমাদের তান্ত্রিক আর লোমশ ভূতকে...'

ওদের কথা শেষ হতে-না-হতেই পূজারিনি ওদের একজনের পিঠে শূল ঠেকিয়ে বলল, 'চুপ কর কাপুরুষের দল! আমি ওই দু-জনকে এখনই বন্দি করে ওদের মহাভূতের কাছে বলি দিতে যাচ্ছি। সর আমার পথ থেকে।' দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে পূজারিনি এগিয়ে চলল।

সেবকের দল ভয়ে ভয়ে এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছে। তাদের সামনে যাচ্ছে তান্ত্রিক আর লোমশ ভূত। তান্ত্রিক আর লোমশ ভূত পূজারিনির পেছনে পেছনে যাচ্ছে। তারা কিছু একটা ভাবছে।

'গুরু! ওদের দু-জনকে ধরে আমি কিন্তু খেয়ে ফেলব!' লোমশ ভূত তান্ত্রিককে বলল।

'ওরে শিষ্য! এরকম ভুল কাজ কখনো করো না। আমাদের শিথিল ভবনে যে দু-জন যুবক এসেছে ওরা আমাদের পূজারিনিকে নিশ্চয়ই হারাবে। ওরা পূজারিনিকে হারালে আমি হব রাজা আর তুমি হবে মন্ত্রী। বুঝলে? তখন বুড়ো তান্ত্রিককে অন্ধকার কোঠর থেকে মুক্ত করে তার কাছ থেকে আমরা আরও কিছু মন্ত্রশক্তি লাভ করব।' তান্ত্রিক ফিসফিস করে বলল।

লোমশ ভূত তান্ত্রিকের কথা শুনে খুব খুশি হল। পিছনের দিকে একবার ঘুরে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলল, 'গুরু! কী মজা হবে! আপনি রাজা হবেন আর আমি হব মন্ত্রী।'

পূজারিনি এবং তার অন্য শিষ্যরা অনেক পিছনে আসছিল। পূজারিনি তার সেবকদের নির্দেশ দিল শিথিল ভবন থেকে ওই যুবক দু-জনকে খুঁজে বের করতে। কিন্তু ততক্ষণে খড়গবর্মা এবং জীবদত্ত শিথিল ভবন ছেড়ে অন্য অঞ্চলে পৌঁছে গিয়েছিল। সেখান থেকে তারা বনের পথের খোঁজ করছিল। কিন্তু যে গুহা দিয়ে ওরা ওই শিথিল নগরে প্রবেশ করেছিল সেই গুহার কোনো খোঁজ তারা পেল না।

'খড়গবর্মা! আমরা যে পথে এই শিথিল নগরে ঢুকেছি তার তো কোনো হদিশ পাচ্ছি না। আমরা বাইরে বেরুব কী করে! পূজারিনির দু-একজন সেবককে ধরে এনে পথ দেখাতে বলতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ দেখছি না।' জীবদত্ত বলল।

'মনে হচ্ছে পূজারিনির সেবকদের নাগালের বাইরে অনেক দূর চলে এসেছি। ওই সিংহটার হল কী! সিংহটা এই শিথিল ভবন থেকে বেরিয়ে বনের পথ ধরেনি তো?' খড়গবর্মা বলল।

'হয়তো সেও আমাদেরই মতো এখানেই কোথাও আটকে গেছে। তুমি কি মাঝে মাঝে সিংহ গর্জন শুনতে পাচ্ছ না?' জিজ্ঞেস করতে করতে জীবদত্ত শিথিল ভবনের একটি ঘরের দিকে উঁকি মেরে তাকিয়ে বলল, 'খড়গবর্মা এদিকে দেখবে এসো! দেখছ, কত ধনদৌলত এখানে ফেলে রাখা আছে। এগুলো নিশ্চয় পথচারীদের থেকে লুঠ করা জিনিস। মনে হচ্ছে এদের কারবারই লুন্ঠন। ঘরে ঠাসা রয়েছে সব।' জীবদত্তের কথা শুনে খড়গবর্মাও ওই ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখল। একটার পর একটা বস্তা সারি সারি রাখা রয়েছে। কোনোটাতে আছে গম আর কোনোটাতে আছে ধান। আরও কত কী!

'তার মানে এই লোমশ ভূতকে দেখিয়ে পথচারীদের ভয় পাইয়ে দিয়ে তান্ত্রিক আর তার লোকজন লুঠ করে। মনে হচ্ছে পূজারিনি অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে। যা কিছু এরা করছে, মনে হচ্ছে পূজারিনির পরিকল্পনাতেই করছে।' খড়গবর্মা বলল।

'এমন ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে যাতে এই খাদ্যের ভাণ্ডারে পূজারিনির কোনো লোক ঢুকতে না পারে। ওরা এখান থেকে খাদ্য না পেলে খুবই বিপদে পড়বে। ওরা খেতে

পাবে না। খেতে না পেলে এই শিথিল ভবন থেকে বাইরে যেতেই হবে।' জীবদত্ত বলল।

'আমাদের দু-জনের মনে একই চিন্তা এসেছে।' এই কথা বলে খড়গবর্মা হেসে উঠল। তারপর নিজের ট্যাঁক থেকে চকমকি পাথর বের করল। পাথর ঘষে আগুন ধরিয়ে দিল ওই খাদ্যের বস্তায়।

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। দেখতে দেখতে একের-পর-এক খাদ্যের বস্তায় আগুন ধরে যাচ্ছিল। ধোঁয়া আর আগুনে ওই ঘর ভরে গিয়েছিল।

'আগুন ধরানো তো গেল। এবার কী করা যাবে?' খড়গবর্মা বলল।

জীবদত্ত বলল, 'আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক। ভালোভাবে আগুন ধরে গেলে এই ভাণ্ডারের সমস্ত খাদ্য পুড়ে যাবে। আবার আর একটা ব্যাপারও হবে। পূজারিনি আগুন লাগার খবর পেয়ে সেবকদের নিয়ে চলে আসবেন। তখন...'

জীবদত্তের কথা শেষ হতে-না-হতেই জ্বলন্ত ভাঁড়ার ঘরের পাশের ঘর থেকে মানুষের আর্তনাদ শোনা গেল।

'খড়গবর্মা, পাশের ঘরের দরজা বন্ধ। মানুষের আর্তনাদ যেন শুনতে পাচ্ছি!' বলতে বলতে জীবদত্ত তাড়াতাড়ি ওই বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে দরজায় সজোরে ধাক্কা মারতে লাগল।

খড়গবর্মা তার কাছে গিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'জীবদত্ত, তাড়াহুড়োর মধ্যে তুমি বোধ হয় দরজায় লাগানো ঝুলন্ত তালাও দেখতে পাচ্ছ না। তুমি তোমার মন্ত্র দণ্ড দিয়ে আঘাত করে এই তালা ভেঙে ফেল।'

তৎক্ষণাৎ জীবদত্ত নিজের মন্ত্র দণ্ড দিয়ে দরজার ঝুলন্ত তালায় জোরে মারল। তালা ভেঙে নীচে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি ছিটকিনি খুলে খড়গবর্মা দরজায় জোরে ধাক্কা মারল।

ঘরে অন্ধকার ঘন ছিল না। দরজার উপরের দিকের একটা জানালা দিয়ে ঘরে আলো ছড়িয়ে পড়ছিল। ওই আলোতে দেখা গেল খুঁটির সাথে শেকল দিয়ে বাঁধা আছে এক বুড়ো। তার হাত হাঁটু পর্যন্ত ঝুলছে। বুড়োটাকে খুব দুর্বল দেখাচ্ছিল। তার লম্বা দাড়ি হাওয়ায় উড়ছিল।

নয়

খড়গবর্মা ও জীবদত্তকে দেখতে পেয়েই বৃদ্ধ বলল, 'কে তোমরা? ওই পাজি পূজারিনির শিষ্য বলে তো তোমাদের মনে হচ্ছে না! তোমরা যেই হও না কেন আমাকে বাঁচাও। পাশের ঘরের খাদ্য হয়তো পুড়ছে। তার আগুনের তাপে আমাকে যেখানে বেঁধে রেখেছে তা পুড়ে যাচ্ছে। আমার পিঠ জ্বালা করছে। পুড়ে যাচ্ছে আমার পিঠ। আমাকে খুলে দাও। আমি পুড়ে যাব।'

'কিছুক্ষণেই মধ্যেই ঘরের ছাদ ধ্বসে পড়বে।' বলতে বলতে জীবদত্ত বৃদ্ধের কাছে গেল। নিজের দণ্ডের আঘাতে বৃদ্ধকে বাঁধা শেকলগুলো ভেঙে ফেলল। বৃদ্ধের হাত ধরে তৎক্ষণাৎ তাকে টেনে বের করল ঘর থেকে।

বৃদ্ধ হতবাক হয়ে চারদিক তাকিয়ে বলল, 'ও! কতদিন পরে আমি মুক্তি পেলাম। ওই পাজি পূজারিনি কি এখনও এই শিথিল নগরে নিজের শাসন চালাচ্ছে। তোমরা কারা? এখানে এলে কেন? কী তোমাদের পরিচয়?'

'আমরা যেই হই না কেন তুমি যে পূজারিনির কথা বলছ আমরা তার শিষ্য নই। বিন্ধ্যাচলে অনেক বড়ো একটা কাজ করতে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু পথে ছোটোখাটো গোলমালে পড়ে এখানে কেমন করে যেন চলে এসেছি। আমাদেরও এখানে বন্দি করার চেষ্টা হয়েছিল। তোমার কথায় মনে হচ্ছে তুমি এখানকার আসল পূজারি। এখানকার পূজারিনি তোমাকে যেকোনোভাবে এই অন্ধকার ঘরে বেঁধে রেখেছে। ঠিক কথা বলছি না?' জীবদত্ত বলল।

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। ওই পাজি মেয়েটাকে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে আমি এই বনে কুড়িয়ে পেয়েছি। তখন সে বালিকা। কেমন যেন মায়া হল তার উপর। ওকে আমি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। আমার মন্ত্রতন্ত্র যা ছিল শেখালাম। কিন্তু ফল কী হল? এক ভয়ংকর ঝড় বাদলের দিনে, কী ভয়ংকর মারাত্মক রাত্রি, আকাশ যেন ভেঙে পড়ছে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে আর তখনই...।'

জীবদত্ত বৃদ্ধ তান্ত্রিকের কথা শেষ হতে-না-হতেই বলল, 'তোমার সমস্ত কথা শোনার সময় আমার নেই। আমরা পূজারিনির খপ্পর থেকে বেরিয়ে বনে যেতে চাইছি। আমাদের ঘরে বন্দি করতে এতক্ষণে পূজারিনি হয়তো সদলবলে বেরিয়ে পড়েছে। আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে। তুমি কি এখানেই থাকতে চাও না ভবন জ্বলে পুড়ে যাওয়ার আগে আমাদের পথ দেখিয়ে আমাদের সাথে বেরিয়ে বনে যেতে চাও?'

'আমি ওই পাজি পূজারিনির অপরাধের বদলা না নিয়ে, তার হাড় না ভেঙে এখান থেকে নড়ব না। আমার পুরোনো শিষ্যরা এই অবস্থায় দেখলে ওরা চট করে আমার দিকে চলে আসবে। ওদের সাহায্যে আমি ওই পাজি মেয়েটাকে মেরে টুকরো টুকরো করে চিল আর কাককে খাওয়াব। যতক্ষণ না আমি তা করছি ততক্ষণ আমার শান্তি ফিরে আসবে না।' বৃদ্ধ তান্ত্রিক বলল।

এই কথা শুনে খড়গবর্মা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, 'জীবদত্ত, আর দেরি নয়। এবার আমরা নিজেদের পথে যেতে পরি। পূজারিনি ও এই বৃদ্ধের মধ্যে যা হওয়ার হোক। এরা পরস্পরের মাথা কাটাকাটি করুক।' এ-কথা বলে সে এগিয়ে গেল।

জীবদত্ত খড়গবর্মার পেছনে যেতে যেতে বলল, 'ওই পাজি পূজারিনিকে ধরে টুকরো টুকরো করে তার মাংস কাক চিলকে খাওয়াতে চাইছ কেন? এই অঞ্চলে একটা ক্ষুধার্ত

সিংহ ঘোরাঘুরি করছে। তাকে খেতে দাও না কেন? তোমারও পুণ্য হবে আর তারও পেট ভরবে।'

বৃদ্ধ কী যেন বলতে যাচ্ছিল ওই কথার জবাবে। কিন্তু ততক্ষণে পূজারিনি তার তান্ত্রিক, লোমশ ভূত ও পাঁচ-ছ-জন শিষ্যকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেল। সেখানে বৃদ্ধ তান্ত্রিক, জীবদত্ত ও খড়গবর্মাকে দেখে চোখ বড়ো বড়ো করে রক্তচক্ষু করে ত্রিশূল উঁচিয়ে গর্জে উঠলেন, 'ও! এই বুড়োটা অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে! চোরা পথে চোরের মতো আমাদের নগরে যে দু-জন ঢুকেছে তারাও দেখছি এখানেই আছে! তোমাদের শেষ মুহূর্ত এসে গেছে! সবাইকে ধরে আমি মহাভূতের কাছে বলি দেব।' ঘোষণা করে সে এগিয়ে এল।

খড়গবর্মা ঝট করে দু-পা পিছিয়ে পূজারিনির দিকে তির তাক করে সাবধান করে দিয়ে বলল, 'পূজারিনি আর এক-পা এগিয়েছ কী আমার এই তেজতির তোমার গলা এফোঁড় ওফোঁড় করে দেব! সাবধান!'

এই সাবধান বাণী শুনে পূজারিনি পাথরের মতো সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তান্ত্রিক ও লোমশ ভূত তার কাছ থেকে একটু সরে দাঁড়াল। দু-এক মুহূর্ত নীরব থাকার পর পূজারিনির এক শিষ্য নিজের শূল তুলে ধরে বলল, 'মহাশক্তি পূজারিনি! দেরি না করে এই বৃদ্ধ পূজারি আর এই দু-জনকে মন্ত্রবলে ভস্ম করে ফেলুন!'

'না আমি এত সহজে এদের প্রাণনাশ করতে চাই না। এদের জ্যান্ত ধরে মহাভূতের কাছে বলি দিতে চাই।' তারপর পাশ ফিরে তান্ত্রিক ও লোমশ ভূতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরে, তোমরা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? ওই যুবক দু-জনকে বন্দি কর। ইতিমধ্যে আমি বুড়োটাকে দেখছি।'

এ-কথা শুনে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত হো-হো করে হেসে উঠল। জীবদত্ত লোমশ ভূতের দিকে এক-পা এগিয়ে বলল, 'ওরে ভূত, আমাদের ঠিক জানা নেই তোর আদৌ কোনো ক্ষমতা আছে কি না। পূজারিনির আদেশ পালন না করে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী?'

লোমশ ভূত কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে বলল, 'গুরু এখন কী করব? ওদের দু-জনকে ধরে কাঁচা চিবিয়ে ফেলব?'

'না শিষ্য তা করো না। অত বড়ো অপরাধ করা মহাপাপ হবে। পূজারিনি তাদের জ্যান্ত ধরে মহাভূতের কাছে বলি দিতে চান। আমাদের অত তাড়াতাড়ি কিছু করার নেই।' তার গুরু বলল।

তান্ত্রিকের কথা শুনে পূজারিনি চোখ লাল করে শূল তুলে তার দিকে এগিয়ে যেতেই খড়্গবর্মা বলে উঠল, 'পূজারিনি, তোমাকে একবার সাবধান করে দিয়েছি। এগোবে না। একটু নড়েছ কী তোমার গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে আমার তির। পার তো ওখান থেকেই তোমার মন্ত্রশক্তি বলে তোমার শত্রুদের শেষ করে ফেল। আমাদের কোনো আপত্তি নেই।'

এই সমস্ত ব্যাপার এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করে বৃদ্ধ পূজারি উচ্চকণ্ঠে বলল, 'এখন ওই গুরুদ্রোহিণীর কাছে কোনো মন্ত্রশক্তি নেই। আমি আমার সমস্ত মন্ত্রগুলো ফিরিয়ে নিয়েছি।'

'ওই বুড়োর একটি কথাও সত্য নয়। তোমরা ওই হারামির কথা বিশ্বাস করো না। শিষ্যগণ, আমি এক্ষুনি তাকে শূলে ফুঁড়ে তুলে ফেলছি।' বলতে বলতে পূজারিনি বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে গেল।

'থাম!' খড়্গবর্মা পূজারিনির হাতে তির ছুড়ল। 'উফ!' আর্তনাদ করে উঠল পূজারিনি। তার হাত থেকে শূল নীচে পড়ে গেল।

'পূজারিনি! তুমি আমার সাবধানবাণী ভুলে গেছ! তাই বাধ্য হয়ে তোমার উপর তির ছুড়তে হল। আবার বলছি, সাবধান, এগিয়ো না আর!' খড়্গবর্মা দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

পূজারিনির হাত থেকে শূল পড়ে যেতেই তার দু-জন শিষ্য লাফিয়ে উঠে বলল, 'মাটিতে ফেলে দিয়ে পূজারিনি অপবিত্র করেছে এই পবিত্র শূল। এবার থেকে আমাদের গুরু ওই বৃদ্ধ পূজারি। বৃদ্ধ পূজারির জয় হোক!'

'খড়্গবর্মা, আমরা আমাদের আসল কাজের কথা ভুলে যাচ্ছি। এই বোকা হাবাদের এই শিথিল ভবনেই থাকতে দাও। এখানেই এদের থাকা ভালো। এরা বাইরে বেরুলে সাধারণ মানুষ এদের সাথে মিশে বোকা হয়ে যাবে।' জীবদত্ত বলল।

নিজের পক্ষে পূজারিনির দু-জন শিষ্য আসার ফলে বৃদ্ধ পূজারি খুশি হয়ে বলল, 'হে মহাভূত! তুমি কতদিন পরে আমার শিষ্যদের অন্ধকার থেকে টেনে আনলে আলোয়। এবার থেকে, আগের চেয়ে অনেক বেশি জীবন তোমার কাছে আমি বলি দেব।'

'খড়্গবর্মা, এই পাজি বৃদ্ধ দেখছি পূজারিনির চেয়ে কম বদমাইশ নয়।' এ-কথা বলে জীবদত্ত মুখ ফেরাল সেখানে সমবেত অন্যদের দিকে। তাদের সম্বোধন করে বলল, 'তোমাদের ঝগড়ার মধ্যে আমরা কোনো পক্ষ নিচ্ছি না। তোমাদের কেউ একজন আমাদের এখান থেকে বাইরে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দাও। আমরা বনে চলে যেতে চাই।'

'তোমরা এখান থেকে পালাতে চাও? তা হয় কখনো? দাঁড়াও, আমি তোমাদের দু-জনকে শূলে গেঁথে মহাভূতের কাছে নিয়ে যাই। তবে তো...' বলতে বলতে পূজারিনি নীচে পড়ে থাকা শূল নিতে ঝুঁকল।

'একটা তির খেয়েও এই পূজারিনির জ্ঞান হল না।' বলতে বলতে খড়গবর্মা পূজারিনির দিকে আবার তির ছুড়তে উদ্যত হল। তক্ষুনি জীবদত্ত তার হাত চেপে ধরল।

'খড়গবর্মা, এ যত পাজিই হোক না কেন মেয়েছেলেকে মারা উচিত হবে না। এই বৃদ্ধ আর পূজারিনি শিথিল ভবনে লড়ে মরুক, আমাদের কী। চল। আমরা চলে যাই।' এ-কথা বলে জীবদত্ত মন্ত্র দণ্ড তুলে ধরে তান্ত্রিক ও লোমশ ভূতের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দেবার স্বরে বলল, 'তোমরা দু-জনে বনের পথ ধর। কোই? উঁ, হুঁ। দেরি করো না।'

তান্ত্রিক বৃদ্ধ পূজারি ও পূজারিনির দিকে ফিরে হাত জোড় করে তাদের বলল, 'আমার গুরুজন, যেকোনো কারণে গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে আমার মন্ত্রশক্তিতে কোনো কাজ হচ্ছে না। আমি এই দু-জনকে পথ দেখাতে পারব না। আপনারা আমাকে এদের হাত থেকে রক্ষা করবেন।'

বৃদ্ধ পূজারি ও পূজারিনি একে অন্যের দিকে তাকিয়ে নীরব ছিল। খড়গবর্মা কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে খাপ থেকে তরবারি বের করে তান্ত্রিক ও লোমশ ভূতকে ধমক দিয়ে বজ্রকণ্ঠে বলল, 'আজেবাজে কথা বলে সময় নষ্ট না করে চল আমাদের পথ দেখিয়ে দাও।'

খাপ খোলা তরবারি দেখে তান্ত্রিক আর লোমশ ভূত ভয়ে কেঁপে উঠল। গুরু-শিষ্য ওদের বলল, 'হে মহাবীরগণ, আমাদের মেরো না! চল আমরা বনে যাওয়ার সুড়ঙ্গ পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ওই চার জনের চলে যাওয়ার পর বৃদ্ধ পূজারি ও পূজারিনির দলের মধ্যে লড়াই বেঁধে গেল। জীবদত্ত ওদের দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'খড়গবর্মা, এরা কেন লড়ছে জানো তো? মহাভূতের পূজারি কে হবে সেটাই এরা লড়াই করে ঠিক করতে চায়। এই ঝগড়ায় জড়িয়ে এই ধোকাবাজ তান্ত্রিক আর তার শিষ্যও লড়ে মরতে চায়।'

'এইসব পাজিদের মরতে দাও। এই ক্ষুধার্ত সিংহ কয়েক দিন পেট পুরে খেয়ে বাঁচুক।' খড়গবর্মা কথার পিঠে বলল।

এ-কথা শুনে লোমশ ভূত থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে তান্ত্রিককে বলল, 'গুরু! ওই খেতে না পাওয়া সিংহ পথে যদি কোনো গুহায় লুকিয়ে থেকে থাকে! যদি আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে কী হবে? গুরু, যাহোক ভেবে বল।'

'কী আর করবে যার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাকে খেয়ে ফেলবে। বিশ্বাসঘাতক কোথাকার! চল। হুঁ।' খড়গবর্মা তরবারি ঝনঝন শব্দ করে বলল।

'ওরে শিষ্য তুমি অত ভয় পেয়ো না। সিংহ সামনে পড়ে গেলে আমি তাকে মুহূর্তের মধ্যে মন্ত্র দিয়ে বিড়াল করে ফেলব। চল আমরা গুহার সুড়ঙ্গ পর্যন্ত এসে গেছি। গুহায় প্রথমে তুমি ঢোক।' তান্ত্রিক বলল।
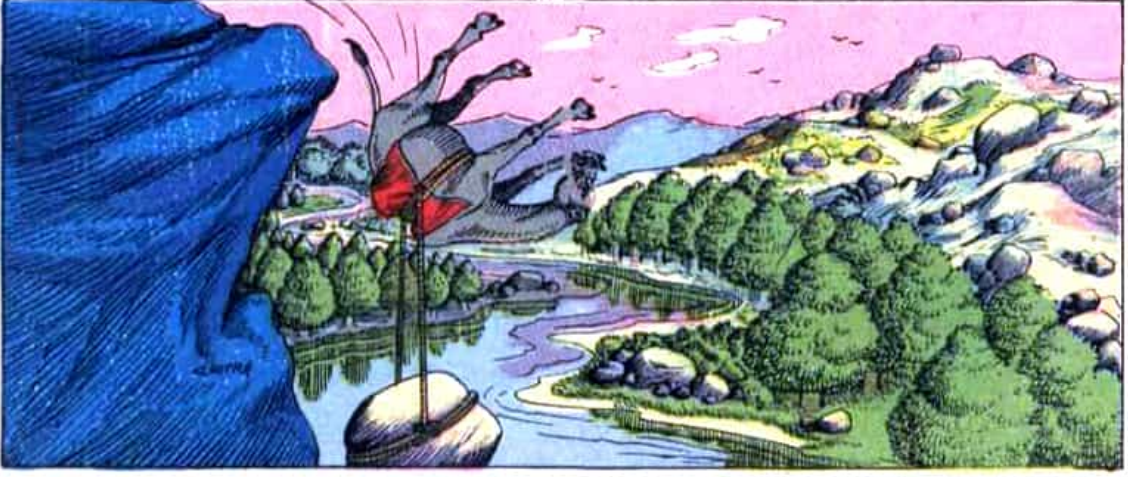
ওই গুরুর শিষ্যের পিছনে পিছনে সুড়ঙ্গপথে এগোতে লাগল জীবদত্ত ও খড়্গবর্মা। ওইখানেই ওরা আগের দিন রাত্রে শিথিল নগরে ঢুকেছিল। ওরা শেষে বনে যাওয়ার গুহার মুখে পৌঁছাল। তারপর তারা গুহাপথে নামতে নামতে চারদিকে একবার তাকিয়ে লোমশ ভূত ও তান্ত্রিককে বলল, 'এবার তোমরা নিজেদের শিথিল নগরে ফিরে গিয়ে ভক্তিভরে মহাভূতের পূজা কর।'

এ-কথা শুনে তান্ত্রিক খড়্গবর্মা ও জীবদত্তকে নমস্কার করে বলল, 'হে মহাবীরগণ আমরা আর শিথিল নগরে ফিরে যাব না। ওই দূরের পাহাড়ে গিয়ে কোনোরকমে দিন কাটাব।'

'তবে মনে রেখো, আর কোনোদিন লুঠপাট করো না। বিপদে পড়ে যাবে। সেখানে পৌঁছানোর আগে হঠাৎ গণ্ডক জাতের নজরে পড়ে গেলে ওরা তোমাদের আস্ত রাখবে না। ওরা ভীষণ চটে আছে তোমাদের উপর।' জীবদত্ত বুঝিয়ে বলল।

তান্ত্রিক ও লোমশ ভূত চলে যাওয়ার পর খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত নদীতে স্নান করলে। কাছের বনে ঢুকে ফল পাড়ল। পেট ভরতি খেয়ে গাছের নীচে এক ঘণ্টা বিশ্রাম করল। তারপর নদীতীরে গেল। তাদের মনে হল স্বর্ণাচারিকে যারা ধরে এনেছিল তারা ওই অঞ্চলেই কোথাও আছে। তখন ওরা ঠিক করল যেকোনোভাবে স্বর্ণাচারিকে উদ্ধার করব।

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত ঘণ্টাখানেক নদীর তীরে হাঁটতে লাগল। তীর ধরে হাঁটা পথে ওরা ছোটো-বড়ো অনেক পাহাড় দেখতে পেল। ওরা দেখল, বড়ো বড়ো পাথর উটের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

'খড়্গবর্মা, এরা হয়তো ওই লুণ্ঠনকারীদের দলের লোক। এরা হয়তো জানে না যে সমতল ভূমি বা বালিতে যে উট চলে তাকে দিয়ে পাহাড়ের উপর পাথর চাপিয়ে টানানো

অনুচিত। ফলে কত বড়ো বিপদ যে হতে পারে সে সম্পর্কে এদের কোনো ধারণা নেই।' জীবদত্ত বলল।

জীবদত্তের মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই পাথর বোঝাই একটা উট গড়াতে গড়াতে মুখ থুবড়ে নীচে পড়ে গেল। তার পিঠে যে বসেছিল সেও রেহাই পেল না।

দশ

একটি উট পাহাড় থেকে গড়াতে গড়াতে পড়ছে। এই দৃশ্য খড়গবর্মা ও জীবদত্ত দেখতে পেল। উঁচু থেকে পড়ার ফলে উটের পা ভেঙে গেল। পা ভেঙে উট মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। আর তার সঙ্গে যে লোকটা পড়ল তারও হাঁটুতে খুব চোট লেগেছিল। সে হাঁটুর উপর দুই হাত দিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে কষ্ট সহ্য করার চেষ্টা করছিল। তার চোখে-মুখে যন্ত্রণার করুণ ছাপ। লোকটার পোশাক দেখে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত অনুমান করল যে লোকটা নিশ্চয় লুণ্ঠনকারীদের দলের।

জীবদত্ত ওই লুণ্ঠনকারীর কাছে গিয়ে বলল, 'ওহে লুণ্ঠনকারী, তোমার দেখছি কঠিন প্রাণ। তোমার সাথে যে উট ছিল তার পা ভেঙে গেল, সে উট মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে আর তোমার কিছুই হল না।'

এতক্ষণ লুণ্ঠনকারী নিজের আঘাতের জন্য দাঁতে দাঁত চেপে কষ্ট পাচ্ছিল। চোখে অন্ধকার দেখছিল সে। জীবদত্ত ও খড়গবর্মা যে তার কাছে আসছে তা সে লক্ষ করেনি। জীবদত্তের গলার স্বর কানে যেতেই সে মাথা তুলে অবাক হয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'হুজুর, আমাকে মারবেন না। গণ্ডক জাতির খেতের ফসল লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে আমি ছিলাম না। আমার কথায় বিশ্বাস না হলে স্বর্ণাচারিকে জিজ্ঞেস করে সত্য ঘটনা জেনে নিতে পারেন।'

তার কথা শুনে খড়গবর্মা ও জীবদত্তের বিস্ময়ের সীমা রইল না। ওরা বুঝল যে স্বর্ণাচারি জীবিত এবং লুণ্ঠনকারীরা তাকে এখনও সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছে।

খড়গবর্মা তৎক্ষণাৎ খাপ থেকে তরবারি বের করে আহত লুণ্ঠনকারীর বুকে ধরে বলল, 'এখন যা যা জিজ্ঞেস করব ঠিক ঠিক জবাব দাও। তা না হলে এই উট যেমন শেয়ালের খাবার হবে, তোমাকেও তাই হতে হবে। তুমি হয়তো লুণ্ঠনকারীদের সাথে গণ্ডক জাতের খেতের ফসল লুণ্ঠন করনি। কিন্তু আমাদের দেখেই তুমি বুঝলে কী করে যে আমরা গণ্ডক জাতের লোককে সাহায্য করতে এসেছি।'

জীবদত্ত খড়গবর্মাকে তরবারি খাপে পুরতে ইশারা করে বলল, 'খড়গবর্মা, এ পাজিটা প্রাণের ভয়ে আগে থেকেই কাঁপছে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা চালিয়ে আর কী হবে। গণ্ডক জাতের এবং তাদের ফসলের কথা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই।'

তারপর জীবদত্ত ওই লুণ্ঠনকারীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তুমি আমাদের কোথায় দেখলে বলত? কী করে চিনলে আমাদের?'

'হুজুর, আমি আপনাদের কোথাও এর আগে দেখিনি। আমার সাথী আপনাদের বনে দেখেছিল। সেই আপনাদের পোশাক আর অস্ত্রের কথা জানিয়ে ছিল। তাই আপনাদের দেখার সঙ্গেসঙ্গে চিনতে পেরেছি।' লুণ্ঠনকারী বলল।

'না তুমি দেখছি বুদ্ধিতে একেবারে বৃহস্পতি। কোথাও একটা আখড়া খুলে কিছু শিষ্য জুটিয়ে নিলেই তো পারতে, এসব লুণ্ঠনকারীদের দলে যোগ দিলে কেন? ভালো কথা, এত পাথর উটের পিঠে চাপিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে বলত? কী করতে অত পাথর নিয়ে যাচ্ছ? বল।' পরিহাস করার স্বরে জিজ্ঞেস করল খড়গবর্মা।

'হুজুর, আমাদের নেতা আমাদের রাজধানীতে একটা দুর্গ বানাতে চান। সেইজন্যই আমাদের নেতা স্বর্ণাচারিকে নিয়ে যাচ্ছেন। ওই দুর্গ বানাতে অনেক পাথর লাগবে। তাই এত পাথর আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কী করব আমাদের কাছে এই উট ছাড়া আর কোনো বাহন তো নেই।' লুণ্ঠনকারী বলল।

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত লুণ্ঠনকারীর সঙ্গে কথা বলছিল। অন্যদিকে পাহাড়ের উপর যে কী হচ্ছিল তা তাদের নজরে পড়েনি। অন্য লুণ্ঠনকারীরা উটের উপর পাথর চাপিয়ে পাহাড় থেকে নামতে নামতে দেখতে পেল তাদের দলের একজনের উট পড়ে গেছে। ওদের কাছে দাঁড়িয়ে আছে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত।

ওই ক্ষত্রিয় যুবকদের দেখেই পাহাড়ের উপরের লুণ্ঠনকারীরা থমকে গেল। খড়গবর্মা ও জীবদত্ত তাদের কীভাবে যে নাস্তানাবুদ করেছে তা তাদের মধ্যে কিছু লোক হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। সেই দুরবস্থার কথা তাদের মনে আছে। তারা ভোলেনি খড়গবর্মা ও জীবদত্তের তরবারির আঘাতের জ্বালা। খড়গবর্মা ও জীবদত্ত যে কীভাবে তান্ত্রিক এবং লোমশ ভূতকে তাড়া করতে করতে পাহাড়ের গুহায় ঢুকে গেল তাও তারা স্বচক্ষে দেখেছে।

'এই মরেছে, এখন আমাদের নেতা নেই। ওই ক্ষত্রিয় যুবকরা আমাদের দেখে নিয়েছে। এখন তো আর রক্ষা নেই। ওরা সোজা পাহাড়ের উপর এসে আমাদের উপর চড়াও হবে। আর দেরি নয়, এখন পালানো উচিত। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।' একজন লুণ্ঠনকারী বলল।

যে বিপদ আসছে তার হাত থেকে বাঁচতে হলে আমদের সামনে মাত্র একটি পথই খোলা আছে। তা হল স্বর্ণাচারির কাছ গিয়ে সব জানিয়ে তার কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া। শুনেছি স্বর্ণাচারি এই ক্ষত্রিয় যুবকদের বন্ধু। একমাত্র সেই এখন এই বিপদের হাত থেকে

আমাদের বাঁচাতে পারে। চল, আর দেরি নয়, এখনই স্বর্ণাচারির কাছে যাওয়া যাক।' অন্য এক লুণ্ঠনকারী বলল।

তারপর দশ-বারো জন লুণ্ঠনকারী স্বর্ণাচারির কাছে ছুটে গেল। স্বর্ণাচারি তখন এক উঁচু পাহাড়ের উপর বসে লুণ্ঠন নেতার জন্য দুর্গের নকশা আঁকছিল।

লুণ্ঠনকারীদের তার কাছে দাঁড়ানো দেখে, নকশা আঁকা থামিয়ে স্বর্ণাচারি গর্জে উঠে বলল, 'আরে, তোমরা নিজেদের কাজকর্ম ছেড়ে এভাবে ছোটাছুটি করছ কেন? শিকার করে তোমাদের নেতা ফিরে আসুক, সব বলব তাকে, মজা টের পাবে।'

লুণ্ঠনকারীদের একজন কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'হুজুর, নেতার অনুপস্থিতিতে আপনি তো আমাদের নেতা। একটা উট পা হড়কে পাহাড়ের উপর থেকে গড়াতে গড়াতে নীচে পড়ে গেছে। তার সাথে যে সাথী ছিল সেও পড়ে গেছে। ওদের পড়ে যাওয়া দেখতে পেয়েছে আপনার পুরোনো ক্ষত্রিয় যুবক বন্ধুরা। উট আর আমাদের সাথী মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর ওই যুবক দু-জন তার পাশে দাঁড়িয়ে সাথীকে কী যেন জিজ্ঞেস করছে। আমাদের ভয় হচ্ছে, ওরা না শেষে এই আস্তানার খবর পেয়ে যায়।'

ক্ষত্রিয় যুবকদের নাম শুনেই স্বর্ণাচারি চমকে উঠল। দাঁড়িয়ে পড়ল মহানন্দে। লুণ্ঠনকারীদের কাছে সব কথা শুনে তার ধারণা হল ক্ষত্রিয় যুবক দু-জন কাছাকাছি কোথাও এসে গেছে।

স্বর্ণাচারি পাহাড়ের নীচে নেমে আসতে আসতে লুণ্ঠনকারীদের বলল, 'তোমরা এত ধানাইপানাই না করে ঝট করে বললেই পারতে যে ক্ষত্রিয় যুবকরা এসেছে। এখন চুপ করে আমার সঙ্গে চলে এসো। তোমাদের কোনো ভয় নেই, বুঝলে?'

'ঠিক আছে আচার্য মশাই, আমাদের প্রাণে মারা পড়তে হবে না তো?' লুণ্ঠনকারীরা আশঙ্কা ও সন্দেহ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করল।

'ওরে ভীতুর দল, তোমরা এত ভয় পাচ্ছ কেন? ওরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না। তোমাদের বাঁচতে, প্রয়োজন হলে, আমি প্রাণ দেব। তবে তোমরা কিন্তু খুব সাবধানে তাদের সাথে ব্যবহার করবে।' স্বর্ণাচারি ভালো করে বুঝিয়ে বলল তাদের।

তারপর পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে নামতে নামতে সে চেঁচিয়ে ডাকল খড়গবর্মা ও জীবদত্তকে। খড়গবর্মা ও জীবদত্ত মাথা তুলে স্বর্ণাচারিকে দেখেই চিনতে পারল। তার পিছনে কয়েক জন লুণ্ঠনকারীকে দেখে খড়গবর্মা বলল, 'জীবদত্ত, আমার কেমন যেন সন্দেহ জাগছে। পদ্মপুরের বাস্তুশাস্ত্রী ও যন্ত্রের হাতি নির্মাণকারী স্বর্ণাচারি এই লুণ্ঠনকারীদের দলে যোগ দেয়নি তো! আমাদের খুব সাবধান হতে হবে।' খড়গবর্মার কথা শুনে জীবদত্তের মনেও সন্দেহ জাগল। স্বর্ণাচারিকে এরা জোর করে ধরে এনেছে। বলা যায় না পরে স্বর্ণাচারির সঙ্গে ওদের হয়তো বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।...

'খড়গবর্মা বিন্ধ্যাচল পৌঁছানো পর্যন্ত আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে। আমরা তো স্বর্ণাচারিকে মুক্ত করতেই এসেছি। এখন দেখা যাক স্বর্ণাচারির কী মতলব আছে!' জীবদত্ত বলল।

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত নিজেদের মধ্যে কথা বলছে এমন সময় চার জন লুণ্ঠনকারী সহ স্বর্ণাচারি তাদের কাছে এসে শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করল। তারপর পালা করে প্রত্যেক লুণ্ঠনকারী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

জীবদত্ত হাসতে হাসতে স্বর্ণাচারির পিঠ চাপড়ে বলল, 'স্বর্ণাচারি, কেমন আছ? লুণ্ঠন নেতার জন্য জাদুর হাতি বা ঘোড়া বানাচ্ছ না তো? আমরা ভেবেছিলাম এদের হাতে পড়ে তোমাকে খুব কষ্ট পেতে হচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে তুমিও লুণ্ঠনকারীদের ছোটোখাটো নেতা হয়ে গেছ।'

এই কথা শুনে স্বর্ণাচারি কিছুক্ষণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থেকে পরে হাতজোড় করে বলল, 'আপনারা একবার আমাকে বাঁচিয়েছেন তারজন্য সারাজীবন আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমি নিরুপায় হয়ে লুণ্ঠন নেতার জন্য একটা দুর্গ তৈরির আয়োজন করছি। কাজটা শেষ হয়ে গেলেই আমি নিজের পথ ধরব। ফিরে যাব বিঘ্নেশ্বর পূজারির কাছে। একসঙ্গে আমরা কোনো বনে গিয়ে তপস্যা করব।'

'বিঘ্নেশ্বর পূজারি গণ্ডক জাতের অরণ্যপুরে আরামেই আছে। এখানে তুমি ভালো আছ তো? এবার আমরা নিজেদের পথ ধরব।' জীবদত্ত বলল।

এ-কথা শুনে স্বর্ণাচারি বিহ্বল হয়ে বলল, 'আপনারা আমার আতিথ্য গ্রহণ না করে চলে যাবেন? তা কখনোই হতে পারে না। আপনারা দয়া করে আজকের দিন আর রাতটা আমার এবং সমরবাহুর অতিথি হিসেবে কাটিয়ে যান।'

'সমরবাহু আবার কে?' জীবদত্ত অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

'ভালো কথা, আপনারা কি লুণ্ঠন নেতার নাম শোনেননি। সিন্ধু রেগিস্থান থেকে আসা লুণ্ঠন নেতার নাম ওটা। এখন সে আস্তানায় নেই। দু-জন অনুচর নিয়ে সে শিকার করতে বনে বেরিয়ে পড়েছে। চলুন এবার।' বলতে বলতে স্বর্ণাচারি এগিয়ে যেতে লাগল।

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত তার পেছনে যেতে যেতে আহত লুণ্ঠনকারীকে দেখিয়ে বলল, 'একে কাঁধে তুলে তোমাদের নিয়ে যেতে হবে।'

তৎক্ষণাৎ দু-জন লুণ্ঠনকারী ওই আহত সাথীটিকে তুলে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা সবাই লুণ্ঠন নেতার আস্তানায় পৌঁছাল। ভালুকের চামড়া জড়িয়ে একটা লোক সেখানে বসে আছে। তাকে ঘিরে আছে কয়েক জন লুণ্ঠনকারী। ওরা নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করছিল। খড়গবর্মা, জীবদত্ত ও স্বর্ণাচারিকে দূর থেকে আসতে দেখে তারা এক ছুটে তাদের কাছে গেল।

'তা তোমার এত অস্থিরতা কীসের? তুমি কি ভালুকের বেশ পরে এখানে নাচানাচি করার তালে আছ নাকি?' স্বর্ণাচারি বলল।

ভালুকের চামড়া পরা লোকটা স্বর্ণাচারির সামনে এসে মাথা নত করে নমস্কার করে বলল, 'স্বর্ণাচারি মশাই, আমি এই চামড়া শখ করে পরিনি। আজ সকালে নেতার সাথে আমিও শিকার করতে বেরিয়ে ছিলাম। আমাদের নেতাকে জংলি জাতের ভয়ংকর নেতা বন্দি করে নিয়ে গেছে। আমি কোনোরকমে ওই জংলিদের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে এসেছি।'

'লুণ্ঠনকারীদের নেতা সমরবাহুকে কি জঙ্গলবাসীরা ধরে নিয়ে গেছে? এত বড়ো বীরকে বন্দি করার মতো জঙ্গলবাসী এতদঞ্চলে কোথাও আছে?' খড়গবর্মা হাসতে হাসতে বলল।

'খড়গবর্মা, সে যত বড়ো পাজিই হোক না কেন, এখন এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে সে তার চেয়ে বড়ো পাজির খপ্পরে পড়ে গেছে। ওভাবে হাসবে না। বেচারার এতক্ষণে কী অবস্থা হয়েছে কে জানে!' জীবদত্ত বলল।

লুণ্ঠন নেতার বন্দি হওয়ার খবর শুনে স্বর্ণাচারির মনে নানা আশঙ্কা জাগতে লাগল। তার নিজেরও তো অভিজ্ঞতা আছে। সেও তো একদিন বন্দি হয়েছিল লুণ্ঠনকারীদের হাতে। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রহর গুনতে হয়েছে তাকে। তারপর ধীরে ধীরে লুণ্ঠনকারীরা তার সাথে ভালো ব্যবহার করতে লাগল। শেষে একদিন লুণ্ঠন নেতার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠল।

'হে ক্ষত্রিয় বীরগণ, মনে হচ্ছে ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেল। আপনারা অপরিসীম শক্তির অধিকারী। যেকোনোভাবে জঙ্গলবাসীদের হাত থেকে সমরবাহুকে উদ্ধার করুন।' স্বর্ণাচারি কাতর কণ্ঠে বলল।

জীবদত্ত খড়গবর্মার দিকে তাকাল। খড়গবর্মা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা নেড়ে বলল, 'জীবদত্ত, এ ব্যাপারে কি করবে না করবে তা ঠিক করার ভার তোমার। আমাদের বন্ধু স্বর্ণাচারির অনুরোধ তো আর আমরা ফেলতে পারি না। লুণ্ঠন নেতাকে বাঁচাব কি না ঠিক কর। তুমি যা বলবে তাই হবে।'

জীবদত্ত কিছুক্ষণ ভেবে ভালুকের চামড়া পরা লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'ওহে, তোমার নেতা আর তার অনুচরকে জঙ্গলবাসীরা বন্দি করল কীভাবে? জঙ্গলে কী ঘটেছিল সব ভালো করে বুঝিয়ে বল দেখি?'

ভালুকের চামড়া পরা লোকটা বলল, 'হুজুর, সমস্ত ঘটনা অল্প কথায় বলছি। আপনারা তাড়াতাড়ি গিয়ে আমাদের নেতাকে উদ্ধার না করলে ওই নরখাদক আমাদের নেতাকে হয়তো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলবে।'

এগারো

লুণ্ঠনকারীদের কথা শুনে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত অবাক হল। এতদিন ওরা বনে ঘুরে বেড়িয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত ওরা কোনো মানুষখেকো জাতির লোককে দেখতে পায়নি।

জীবদত্ত কিছুক্ষণ চুপচাপ কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, 'তোমাদের নেতাকে ওরা পুড়িয়ে খাবে কী এমনি কাঁচা খেয়ে নেবে সে-কথা আমরা পরে ভাবতে বসব। এখন আমাদের বল তো কেমন করে তোমাদের নেতা বন্দি হল? কী হয়েছিল?'

'হুজুর আমরা সকালে শিকার করতে গিয়েছিলাম। আমাদের চোখে পড়ল একটা হরিণ। হরিণ মেরে আমরা ফিরছিলাম। পথে আমরা একটা বাঘের গর্জন শুনতে পেলাম। আর শোনা গেল একটা মানুষের আর্তনাদ। যেদিক দিয়ে আওয়াজ আসছিল আমরা তিন জনে

সেইদিকে ছুটে গেলাম। চোখে পড়ল একটা বাঘ আর একটা আদিবাসী। আর বাঘের বুকে বল্লম ঢুকে গেছে। বাঘের একটা বাচ্চা কাছাকাছি গর্জন করতে করতে ঘোরাঘুরি করছিল। লুণ্ঠনকারীরা বলল।

'ওটা হয়তো ওই মড়া বাঘিনীর বাচ্চা। আচ্ছা তারপর কী হল?' জীবদত্ত জিজ্ঞেস করল।

লুণ্ঠনকারীরা বলল, 'আমাদের নেতা জানালেন যে তিনি ওই বাঘের বাচ্চাকে এনে পুষবেন। আমি আস্তে আস্তে গিয়ে বাচ্চাটাকে ধরে ফেললাম। ইতিমধ্যে দশ-বারো জন আদিবাসী কোত্থেকে হাজির হল আমাদের সামনে। তাদের পরণে ভালুকের চামড়া। হঠাৎ তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের বন্দি করে ফেলল। আদিবাসীদের নেতা ভালুকের মাথার চামড়া ধারণ করেছিল। তাই তাকে ঠিক চেনা যাচ্ছিল না। নেতা আমার দিকে চোখ রেখে নিজের অনুচরদের বলল, 'আরে এই লোকটা তো চমৎকার করে ফেলেছে বাঘের বাচ্চাটাকে। লোকটা খুব হুঁশিয়ার মনে হচ্ছে। সাহসীও বটে। একে আমরা আমাদের দলে ঢুকিয়ে নেব। নাও একেও তোমরা ভালুকের চামড়া পরিয়ে দাও।' নেতার নির্দেশমতো তৎক্ষণাৎ তারা আমাকে ভালুকের চামড়া পরিয়ে দিল। আমাদের নেতা ও আমাদের এক সাথীকে ওরা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। বাঘের বাচ্চা নিয়ে ওদের সাথে আমাদের চলার হুকুম হল। আমরা চলতে লাগলাম। তারপর আমি...

লুণ্ঠনকারীর কথা শেষ হতে-না-হতেই জীবদত্ত বলল, 'তাহলে তো তোমার ভাগ্য খুলে গিয়েছিল। ওদের দলে থেকে গেলে একদিন-না-একদিন তুমি ওদের নেতা হয়ে যেতে পারতে।'

এ-কথা শুনে খড়গবর্মা ও স্বর্ণাচারির সঙ্গে যারা এসেছিল তারা সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। ওই লুণ্ঠনকারীও হেসে বলল, 'কিছুক্ষণ যাওয়ার পর আমি বাঘের বাচ্চাটাকে ওদের নেতার উপর ছুড়ে দিলাম। বাঘের বাচ্চাটা নেতার কাঁধে পড়ে রাগে গর্জন করতে করতে তাকে কামড়ে আঁচড়ে অস্থির করে তুলল। নেতা বাঘের বাচ্চার সঙ্গে যুঝতে লাগল। তখন নেতাকে উদ্ধার করতে তার অনুচররা ব্যস্ত হয়ে উঠল। সেই সুযোগে আমি এক ফাঁকে ছুটে পালালাম।

জীবদত্ত লুণ্ঠনকারীকে বলল, 'বা! তুমি তো দেখছি খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছ।' এ-কথা বলে জীবদত্ত স্বর্ণাচারির দিকে ঘুরে বলল, 'স্বর্ণাচারি, এখন আমাদের কর্তব্য কি ওই আদিবাসীদের নেতার কবল থেকে লুণ্ঠন নেতা সমরবাহুকে উদ্ধার করা?'

স্বর্ণাচারি জীবদত্তের কথার জবাব দিতে যাচ্ছে এমন সময় পাহাড়ের এক উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে যে লোকটা বনের সবদিক নজর রেখেছিল সে লাফাতে লাফাতে খড়গবর্মা ও

জীবদত্তের কাছে গিয়ে বলল, 'হুজুর, আমাদের এই পাহাড়ের নীচের বনে একদল আদিবাসী বাজনা বাজাতে বাজাতে ভালুক নাচাতে নাচাতে এদিকে আসছে।'

'ওরা কি আমাদের দিকে আসছে না বনের দিকে আপন মনে চলেছে? এই প্রশ্ন করতে করতে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত বনের দিকে তাকাল।

লুণ্ঠনকারীরা ঠিকই বলেছিল। নানান ধরনের বাজনা বাজাতে বাজাতে দশ-বারো জন আদিবাসী লুণ্ঠন নেতা সমরবাহু ও তার এক অনুচরকে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল।

'খড়গবর্মা, মনে হচ্ছে আদিবাসীরা আমাদের দিকে আসছে না। ওরা নিজেদের আস্তানার দিকে যাচ্ছে। ওরা যদি সত্যি মানুষখেকো হয় তাহলে তাদের কবল থেকে আমরা সমরবাহুকে উদ্ধার করতে পারব না।' জীবদত্ত বলল।

স্বর্ণাচারি পাহাড়ের নীচের বনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল আদিবাসীদের। সমরবাহুকে দেখেই সে বিচলিত হয়ে বলে উঠল, 'দেখুন আপনার যেকোনোভাবে ওদের কবল থেকে সমরবাহুকে উদ্ধার করুন। ওই ভালুক নাচানো আর বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকের মধ্যে সমরবাহু বেশিদিন বাঁচতে পারবে না। আমার মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করতে না পারলে সমরবাহুর জীবন বিপন্ন হতে পারে।'

'স্বর্ণাচারি, তোমার অনুরোধে আমরা সমরবাহুকে বাঁচানোর চেষ্টা করব। ওই আদিবাসীদের অনুসরণ করে ওদের খপ্পর থেকে সমরবাহুকে উদ্ধার করতে একটু সময় লাগবে। এর মধ্যেই ওরা সমরবাহুকে মেরে ফেললে সেটা তার দুর্ভাগ্য মনে করতে হবে।' জীবদত্ত বলল।

'আপনাদের উদ্ধার কাজ যাতে তাড়াতাড়ি হতে পারে তারজন্য সমরবাহুর দলের কয়েক জনকে আপনাদের সঙ্গে পাঠাচ্ছি। ওদের এই অঞ্চলে মেরে ফেলে সমরবাহুকে উদ্ধার করুন।' স্বর্ণাচারি নিবেদনের সুরে বলল।

স্বর্ণাচারি ভূত-ভবিষ্যৎ কিছু না ভেবে কথা বলায় জীবদত্ত হেসে উঠে বলল, 'স্বর্ণাচারি ওই পাজি লোকগুলোকে মেরে ফেলা অত সহজ কথা নয়। আমরা ওদের উপর হামলা করতে যাচ্ছি টের পেলে ওরা তৎক্ষণাৎ সমরবাহুকে বধ করবে।... তাই বলে আমরা যে দেরি করতে চাই তা নয়, আমরা এক্ষুনি বেরুচ্ছি। আমরা ওকে মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব।' জীবদত্ত বলল।

তারপর খড়গবর্মা ও জীবদত্ত পাহাড় থেকে নেমে বনের দিকে এগিয়ে গেল। ওরা আদিবাসীদের দেখতে পেল না বটে কিন্তু ওদের ডমরু প্রভৃতি নানান ধরনের বাজনার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল।

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত ঠিক করল পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি ওদের কাছাকাছি চলে যাবে। পিছন দিক থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করে ওদের পর্যুদস্ত করে ফেলবে। কিন্তু গাছের ফাঁক দিয়ে ওদের কখনো দেখা যাচ্ছিল আবার কখনো ওরা গাছের আড়ালে পড়ে যাচ্ছিল।

'খড়গবর্মা, ভালুকের চামড়া পরা লোকগুলোকে ওদের আস্তানায় গিয়েই আক্রমণ করতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। এই ঘন বনে এদের আক্রমণ করে ঠিক সুবিধা করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।' জীবদত্ত নিরাশ হয়ে বলল।

খড়গবর্মা জীবদত্তের কথার জবাব দিতে যাবে এমন সময় ওরা আর ওই বাজনার আওয়াজ শুনতে পেল না। সমস্ত বনে যে এক কঠিন নীরবতা!

'খড়গবর্মা, এ কি! মনে হচ্ছে যেন কোনো এক রাক্ষস একসঙ্গে সমস্ত আদিবাসীদের যেন গিলে ফেলেছে। কোনো সাড়া নেই, কোনো শব্দ নেই। হল কী?' জীবদত্ত বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল।

'কেমন যেন গোলমেলে লাগছে সব কিছু। এতক্ষণ আওয়াজ শুনে শুনে আমরা ওদের অনুসরণ করছিলাম। কিন্তু এখন, আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না, এগোবো কোন দিকে? আর না এগোলে ওদের ধরব কী করে? মারব কী করে? আর সমরবাহুকে উদ্ধারই বা করব কী করে? আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।' খড়গবর্মার প্রশ্নে উদবেগ প্রকাশ পেল।

ঠিক সেইসময় কাছের গাছের আড়াল থেকে নেকড়ের ডাক শোনা গেল। তাদের আর্তনাদ শুনে জীবদত্ত বলল, 'এ তো তাজ্জব ব্যাপার। দিনদুপুরে এই ধরনের নেকড়ের ডাক, কী ব্যাপার! নিশ্চয় কিছু ঘটেছে।' বলতে বলতে জীবদত্ত ওই গাছের দিকে এগিয়ে গেল।

গাছের কাছে গিয়ে দেখে ওই গাছের ডালগুলো নুয়ে আছে। তাদের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওরা দেখতে পেল দূরের সবুজ খেত। চাষ-আবাদ করা খেতের মতো দেখাচ্ছিল ওই খেত। অন্যান্য গাছের ডালে ডালে ফলের বাহার। কিন্তু জীবদত্ত বা খড়গবর্মার কাছে ওসব বিশেষ আকর্ষণের বস্তু নয়। নজরে পড়ল চার জন লোক খেতে জল ঢালছে। ভালুকের চামড়া পরা বাকি দু-জন গাছের নীচে দুটো ভেড়া নিয়ে বসে আছে। এখন তারা গোটা ব্যাপার অনুমান করতে পারল।

'খড়গবর্মা, ভালুকের চামড়া পরা লোকগুলো বনের কিছুটা জমিতে চাষ-আবাদ করছে। ওরা যাদের দিয়ে খেতের কাজ করাচ্ছে তাদের অন্য জাতের লোক মনে হচ্ছে। হয়তো ওরা এই চামড়া পরা লোকগুলোর গোলাম।' জীবদত্ত বলল।

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মনে হচ্ছে ওই মানুষগুলোকে পাহারা দেবার জন্যই নেকড়ে রাখা হয়েছে। সমরবাহুকে বেঁধে একদল নিয়ে গেছে অন্য কোথাও।' খড়গবর্মা

বলল।

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত এইসব কথা বলাবলি করছিল। আর তখনই ওরা দেখতে পেল খেতের গাছের আড়ালে আড়ালে নুয়ে হাঁটতে হাঁটতে একজন এগিয়ে যাচ্ছে। ভালুকের চামড়া পরাদের একজনের ঘুম পেয়েছিল। সে একটি গাছের নীচে বসে ঘুমে ঢুলে পরছিল। তা লক্ষ করে জীবদত্ত খড়গবর্মাকে বলল, 'খড়গবর্মা, মনে হচ্ছে ওই লোকটা ভালুকের চামড়া পরা ঝিমানো লোকটাকে শেষ করার তালে আছে। দেখতে পাচ্ছ ওর চলা...।' জীবদত্ত হঠাৎ চুপ হয়ে গেল।

গোলাম পাহারাদারের পিছনে ছিল। জলপাত্র থেকে একটা পাথর তুলে পাহারাদারের মাথায় আঘাত করল। পাহারাদার আঘাতের চোটে জোরে আর্তনাদ করে উঠল। পরক্ষণেই সামনের দিকে তার মাথা ঝুঁকে পড়ল। গোলাম এক দৌড়ে বনে ঢুকে গেল।

সাথীর অবস্থা দেখে অন্য পাহারাদার গোলামকে ধরার জন্য তার পেছনে ধাওয়া করল। নেকড়েগুলোকেও তার দিকে লেলিয়ে দিল। নেকড়ে দুটো ভয়ংকর গর্জন করতে করতে ওই গোলামের পিছু ধেয়ে গেল। আর নেকড়ের পেছনে ছুটতে লাগল ওই পাহারাদার।

'খড়গবর্মা, সমরবাহুর কপাল ভালো যে আমরা এদিকে এসেছি। তিনটে গোলাম এখানেই রয়ে গেছে। আমরা তো ওই গোলামদের কাছ থেকে ভালুকের চামড়া পরা লোকদের আস্তানা কোথায় জেনে নিতে পারি।' এ-কথা আলোচনা করতে করতে জীবদত্ত খেতের গাছের আড়ালে ভয়ে ভয়ে দাঁড়ানো সেই লোকগুলোকে জোরে ডাকল।

জীবদত্তের কথা শুনে গোলামরা চমকে উঠল। খড়গবর্মা হাত তুলে ওদের ইশারা করে কাছে ডাকল। পরক্ষণেই ওই তিন জন গোলাম একসঙ্গে বনের দিকে ছুটে পালাল।

জীবদত্ত হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'খড়গবর্মা, মনে হচ্ছে আমরা পথ ভুলে এই পাগলদের মধ্যে এসে পড়েছি। পাহারাদার একজন গোলামের পিছনে ধাওয়ার করে চলেছে। এদের পাহারা দেবার কোনো লোক নেই তবু এরা এমনভাবে জল তুলছে যেন কিছুই হয়নি এখানে। আমাদের দিকে ওই তিন জন এমনভাবে তাকাল যেন ভূত দেখছে!'

এখন আমরা কী করব? পালানো গোলামকে ধাওয়া করব? নেকড়ের গর্জন শুনতে পেয়েছ তো? এবার চল এগিয়ে দেখি সমরবাহুকে যারা বেঁধে নিয়ে গেল সেই ভালুক চমড়াধারীদের দেখা পাই কি না। ওদের সন্ধান পেলেও পেতে পারি।' খড়গবর্মা বলল।

তারপর খড়গবর্মা ও জীবদত্ত দু-জনে বনে ঢুকল। যেদিকে নেকড়ের গর্জন শোনা যাচ্ছিল সেইদিকে ওরা গেল। কিছুক্ষণ যাবার পর ওরা ডমরু ও অন্য ধরনের বাজনার আওয়াজ শুনতে পেল। দু-জনে ওদিকে তাকল। দূরে দেখতে পেল কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশ যেন ছেয়ে ফেলেছে।

'খড়গবর্মা মনে হচ্ছে ভালুক চামড়াধারী লোকগুলো সমরবাহুকে নিয়ে মারাত্মক কিছু একটা করে ফেলবে। ওরা আগুন ধরাচ্ছে কেন? সমরবাহুকে পুড়িয়ে ফেলবে না তো?' জীবদত্ত জিজ্ঞেস করল।

'হয়তো পোড়াবে। আমাদের আরও জোরে পা চালিয়ে যাওয়া উচিত।' এ-কথা বলে খড়গবর্মা খাপ থেকে তরবরি বের করল। তারপর ওরা দু-জনে ওই আগুন আর ধোঁয়ার দিকে এগিয়ে গেল।

বারো

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত সেই গাছের কাছে গেল যেখানে আগুন আর ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল। একটা গাছে উঠে ওরা দেখতে লাগল ভালুকের চামড়া পরা লোকের কাজকর্ম। কাজেই তারা দেখতে পেল এক বিল। ওরা শিকার করে আনা জন্তুজানোয়ারদের পোড়াচ্ছিল। কেউ আবার বাজনা বাজিয়ে ভালুক নাচিয়ে আনন্দ করতে লাগল।

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত যখন যেখানে পৌঁছাল তখন সেখানে সমরবাহু ছিল না। ভালুক জাতের নেতা তাকে সেই বিলের ভেতর নিয়ে গিয়েছিল। খড়গবর্মা ও জীবদত্ত দু-জনেই উঁচু গাছ থেকে অনুমান করল বিলে নামার সিঁড়ি থাকতে পারে। তাদের অনুমান যে সত্য তার প্রমাণও তারা পেল।

'জীবদত্ত, এই বুনোদের বাস মনে হচ্ছে এই বিলের ভেতরেই আছে। এই বিলের ভেতর থেকে নিশ্চয়ই বনে যাওয়ার অন্য কোনো রাস্তা আছে। এই লোকগুলো

সমরবাহুকে পুড়িয়ে খাচ্ছে বলে আমার মনে হচ্ছে না।' খড়গবর্মা বলল।

জীবদত্ত ওই অঞ্চলটাকে ভালোভাবে লক্ষ করে দেখল। তারপর সে চাপা গলায় বলল, 'স্বর্ণাচারি ওদের মানুষখেকো ভেবেছে। তাই অতটা হাঁকপাক করছে। এরা বনে যেভাবে খেতের কাজ করছে তা দেখে এদের মানুষখেকো ভাবতে পারছি না। আমার মনে হয় এরা যেসব লোককে ধরে তাদের দিয়েই খেতের কাজকর্ম করায়। তাদের গোলাম করে খাটায়। সমরবাহু ও তার অনুচরদের এরা সুড়ঙ্গের ভেতরে নিয়ে গেছে বোধ হয়। আমি নিশ্চিত এরা মানুষখেকো নয়।'

খড়গবর্মাও মনে মনে এই কথাই ভাবছিল। সে গাছের অনেক উঁচু একটা ডালে উঠে বলল, 'এরা শিকার করা জন্তুজানোয়ার পোড়াচ্ছে। মানুষ পোড়াচ্ছে না।'

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত যখন এই ধরনের কথা নিজেরা বলাবলি করছিল তখনই ভালুক জাতের নেতা সমরবাহু ও তার অনুচরকে নিজেদের গুরুর কাছে নিয়ে গেল। ঝুঁকে তাকে প্রণাম করে বলল, 'গুরু ভালুক! এদের দু-জনকে আমরা বনে পেয়েছি। এদের দেখে মনে হচ্ছে এরা বীর, সাহসী এবং লড়াই করতে পারে। এদের আমাদের অধীনে আনা, মনে হচ্ছে শক্ত হবে গুরু!'

গুরু ভালুক গোলাকৃতি সমতলের উপর বসানো শিলার উপর বসেছিল। সেটা ঢাকা ছিল ভালুকের চামড়ায়। আসন থেকে সামনের দিকে ঝোলানো ছিল ভালুকের মাথা। গুরু ভালুকের দু-দিকে দুটো নেকড়ে ওত পেতে যেন মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল। বল্লম হাতে কয়েক জন ভালুক জাতের লোক এদিক-ওদিকে দাঁড়িয়ে বন্দিদের দিকে তাকিয়েছিল।

পরিবেশ এবং সকলের হাবভাব দেখে কেমন যেন লাগছিল। ভালুক জাতের লোক আর কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন সমরবাহু ও তার অনুচরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে। ওরাও নেকড়ের পেটে যাবে ভেবে নিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ভালুক জাতের নেতার কথা শুনে গুরু ভালুক মাথা নাড়তে নাড়তে সমরবাহুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার পোশাক দেখে মনে হচ্ছে তুমি শহুরে লোক। তুমি কোন উদ্দেশ্যে এই বনে এলে?'

সমরবাহু বুঝতে পারল না এই প্রশ্নের কী জবাব দেবে! কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'আমি শহরের লোক নই। সিন্ধু রেগিস্থান থেকে এই প্রদেশে এসেছি। আমার অনুচরের সংখ্যা কয়েক-শো। আমাকে যে বন্দি করা হয়েছে তা আমার অনুচররা এক সময় ঠিক জানতে পারবে। তখন ওরা দল বেঁধে এই সুড়ঙ্গে ঢুকে তোমাকে আর তোমার এই সুড়ঙ্গ বাড়িটার সর্বনাশ করে ফেলবে।'

'বেশ, বেশ! তোমার গলার জোর আছে। তোমার সাহস আর পৌরুষ তারিফ করার মতো।' বলতে বলতে গুরু ভালুক জোরে হেসে উঠে বলল, 'তোমার অনুচররা আমার সুড়ঙ্গে ঢোকার আগেই আমার ভালুক সেবকরা তাদের নেকড়ের পেটে পুরে দেবে। তাই বলছি, আমার সামনে বড়ো বড়ো কথা বলে বক বক করো না। আমি জানি তোমাকে আর তোমার অনুচরদের কীভাবে আমাদের অধীনে আনতে হয়। কীভাবে তোমাদের গোলাম বানিয়ে অন্য গোলামদের সাথে জুড়ে খেতখামারের কাজ করাতে হয়।'

গুরু ভালুকের মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই তার দু-জন অনুচর ছুটতে ছুটতে এসে সমরবাহু ও তার অনুচরকে দেখে থ বনে দাঁড়িয়ে পড়ল। গুরু ভালুক তাদের জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, বল? তোমরা অমনভাবে ওদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন?'

আগন্তুক এ-কথা শুনে সমরবাহুর দিকে তাকিয়ে রইল। তখন গুরু ভালুক রেগে গিয়ে বলল, 'হোক গোপন কথা, বল। এরা আমাদের হাতে বন্দি। এদের কোনো ক্ষমতা নেই। এদের আমি এক্ষুনি নেকড়ের আস্তানায় ছুড়ে দিচ্ছি।'

'গুরু ভালুক, কথাটা যে অত্যন্ত গোপনীয়। আপনার একার এই কথা শোনা উচিত।' এ-কথা বলে দু-জনে গুরুর কাছে গিয়ে তার কানে কানে কী যেন বলল।

গুরু ভালুক কিছুক্ষণের জন্য থ বনে বসে রইল। তারপর সমরবাহুকে যে ভালুক নেতা ধরে এনেছিল তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'তোমার ঘটে দেখছি কিচ্ছু নেই।' কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে নীরব থেকে আবার বলল, 'ভালো কথা, এই দু-জন বন্দিকে নেকড়ের আস্তানায় ছেড়ে দিয়ে এসো। হ্যাঁ, সেখানে ছাড়ার আগে এদের বাঁধন খুলে দাও। এই দু-জনের হাতে দুটো বল্লম দিয়ে দেবে।'

গুরু ভালুকের আদেশ পেয়ে তার অনুচররা সমরবাহু ও তার অনুচরের বাঁধন খুলে দিল। ওদের হাতে বল্লম দিয়ে বলল, 'এবার চল।' তারপর ওদের সুড়ঙ্গপথে নিয়ে গেল।

ওদের যাওয়ার পরেই গুরু ভালুক নিজের অনুচরদের দিকে ফিরে বলল, 'এই নবাগতরা আমাদের সুড়ঙ্গের রহস্য হয়তো জেনে গেছে। ওদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। ওরা এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করলে তৎক্ষণাৎ ধরে আনবে আমার কাছে।'

'আজ্ঞে তাই হবে হুজুর!' বলে মাথা নত করে নমস্কার করে দশ-বারো জন অনুচর সুড়ঙ্গপথে চলে গেল।

গাছের ডালে বসে সব লক্ষ করে খড়গবর্মা ও জীবদত্তের মনে হল, দিনের বেলা ভালুক জাতের লোকের সুড়ঙ্গের ধারে-কাছে গেলে বিপদে পড়তে হবে। ভালুক জাতের লোক ভালুক নাচিয়ে শিকার করে ধরে আনা জন্তুজানোয়ার পুড়িয়ে পোড়া মাংস খাচ্ছিল। দুপুরের কড়া রোদে সমস্ত বন যেন তেতে ছিল। জীবদত্ত গাছ থেকে নীচে নামতে নামতে

খড়গবর্মাকে বলল, 'খড়গবর্মা, আমার যা দেখার, দেখা হয়ে গেছে। এখানে সময় কাটানো বৃথা। ভীষণ খিদে পেয়েছে। এখানকার কোনো পুকুরে স্নান করে গাছের ফল খেয়ে কাটাতে হবে। অন্ধকার হয়ে গেলে সুড়ঙ্গে ঢোকার চেষ্টা করতে হবে।

খড়গবর্মা জীবদত্তের কথা শুনে চুপচাপ গাছ থেকে নেমে পড়ল। দু-জনে জলের সন্ধানে বেরুল। কিছুক্ষণ পরে ওরা একটা পুকুরের সন্ধান পেল। ওই পুকুরের চারপাশে ঝোপঝাড় আর গাছপালা ভরা ছিল। জন্তুজানোয়ার যে ওই পুকুরে এসে জল খেয়ে যায় তার চিহ্ন জীবদত্ত লক্ষ করল।

'খড়গবর্মা, তাড়াতাড়ি স্নান করে এখান থেকে কেটে পড়া উচিত। মনে হচ্ছে এখানকার পশু আর ভালুক জাতের লোক এই পুকুরের জল ব্যবহার করে।' জীবদত্ত বলল।

জীবদত্তের মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই ঝোপঝাড় থেকে চার-পাঁচটা বুনো মুরগি ডাকতে ডাকতে সেদিকে আসছিল। ওদের দেখেই তির ছুড়ে খড়গবর্মা বলল, 'অনেক দিন হয়ে গেল মুরগির মাংস খাইনি।'

তির সাঁ করে ছুটল কিন্তু কোনো মুরগির গায়ে তা বিদ্ধ হল না। ডাকতে ডাকতে মুরগিগুলো মুহূর্তে উড়ে গেল। পরক্ষণেই শোনা গেল মানুষের আর্তনাদ, 'হে গুরু ভালুক মরে গেলাম!'

এই আর্তনাদ শুনে মুহূর্তের জন্য খড়গবর্মা ও জীবদত্ত নীরব রইল।

'খড়গবর্মা এ এক বিচিত্র ব্যাপার তো! তোমার ছোড়া তির মুরগির গায়ে লাগল না, লাগল গিয়ে ঝোপে বসে থাকা বুনো লোকের গায়ে। কিন্তু এই গুরু ভালুকটা আবার কে?' এ-কথা বলে জীবদত্ত ওই ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল। খড়গবর্মা তাকে অনুসরণ করল।

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত ঝোপের কাছে গিয়ে দেখতে পেল ভালুক চামড়াধারী একটা লোক রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। খড়গবর্মার তির তার বুকে বিদ্ধ ছিল।

জীবদত্ত তার কাছে গিয়ে বলল, 'তোমার পোশাক দেখেই আমরা বুঝতে পেরেছি তুমি কে? আমরা তোমাকে মারার জন্য তির ছুড়িনি। আচ্ছা, তুমি ঝোপে লুকিয়ে কী করছিলে?'

বিক্ষত লোকটা জীবদত্তের কথা শুনতে পেল কিন্তু জবাব দেবার মতো শক্তিসামর্থ্য তার ছিল না। মাটিতে গড়াতে গড়াতে বিড়বিড় করে বলছিল, 'গুরু ভালুক! গুরু ভালুক!'

'জীবদত্ত, লোকটা আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত বাঁচতে পারে। আমি বুঝতে পারছি না লোকটা মুরগি ধরার জন্য ঝোপে লুকিয়েছিল, না আমাদের লক্ষ করছিল।' খড়গবর্মা বলল।

'তোমার প্রশ্নের জবাব যে দিতে পারে তার আত্মা এতক্ষণে বোধ হয় গুরু ভালুকের মধ্যে মিশে গেছে।' এ-কথা বলে জীবদত্ত পিছনের দিকে ঘুরল।

খড়গবর্মা ভালুক জাতের লোককে ভালোভাবে লক্ষ করে দেখল। বুঝল লোকটা মারা গেছে। তখন সেও জীবদত্তের সাথে ঝোপ থেকে বেরিয়ে পুকুরের ধারে গেল। তারপর দু-জনে পুকুরে স্নান করল। আশপাশের গাছের ফল পেড়ে খেল। একটি গাছের নীচে শুয়ে তারা বিশ্রাম করল। অনুমান করল ভালুক জাতের লোক তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখছে। অনেক ভেবে তারা ঠিক করল ওদের হাত থেকে সমরবাহুকে মুক্ত না করে সেখান থেকে যাওয়া উচিত হবে না।

সূর্যাস্তের একটু পরে সমস্ত বনে অন্ধকার ছেয়ে গেল। তারপর সুড়ঙ্গপথে পা বাড়াল খড়গবর্মা ও জীবদত্ত। খুব সাবধানে তারা এগোচ্ছিল। কেউ তাদের অনুসরণ করছে কি না সেদিকেও তারা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সুড়ঙ্গের কাছে গিয়ে তারা লক্ষ করল সেখানে কোনো পাহারাদার নেই।

'খড়গবর্মা এখানকার ব্যাপার বুঝতে পারছ তো? এই সুড়ঙ্গের ভালুক জাতের লোক ভাবছে ওরা আমাদের বেশ কায়দা করে বন্দি করতে পারবে।... ব্যাটারা বুঝতে পারছে না যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের একটা বিরাট সর্বনাশ হতে যাচ্ছে।' জীবদত্ত সুড়ঙ্গপথে নামতে নামতে বলল।

খড়গবর্মাও তাকে অনুসরণ করে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। ওরা এইভাবে অন্ধকারে সিঁড়ি ভেঙে যেতে যেতে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পৌঁছাল। হঠাৎ অন্ধকার থেকে বল্লম উঁচিয়ে দশ-বারো জন ভালুক জাতের লোক বেরিয়ে এসে বলল, 'দাঁড়াও! আর এক-পা এগিয়েছ কী তোমাদের বুকে বল্লম গেঁথে দেব।'

জীবদত্ত ওদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'তোমরা অত কষ্ট করতে যাচ্ছ কেন? সোজা নিয়ে গিয়ে নেকড়েদের খেতে দাও না। কিন্তু তার আগে একটু গুরু ভালুকের দর্শন

করিয়ে দাও।'

এ-কথা শুনে ভালুক জাতের একজন আস্তে আস্তে বলল, 'আ! অত জোরে বোলো না।' গুরু ভালুক এখন বৃকেশ্বরীর পূজা করছেন। তোমাদের আমরা এখন নেকড়ের আস্তানায় ফেলে আসব। সেখান থেকে নিজের ক্ষমতাবলে যদি ফিরে আসতে পার তখন গুরু ভালুকের দর্শন করিয়ে দেব।'

'ভালো কথা, তাড়াতাড়ি বল, ওই নেকড়ের আস্তানা কোথায়?' জীবদত্ত হাসি চেপে জিজ্ঞেস করল।

'তাড়াহুড়ো করো না। সেখানেই যাচ্ছি।' এ-কথা বলে ভালুক জাতের লোকেরা খড়গবর্মা ও জীবদত্তকে ঘিরে নিয়ে যেতে লাগল। দূর থেকে ভেসে আসছে নেকড়ের গর্জন আর মানুষের ভয়ার্ত চিৎকার আর আর্তনাদ। সুড়ঙ্গের গায়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

'খড়গবর্মা, এই আর্তনাদ সমরবাহু ও তার অনুচরের হবে। নেকড়েগুলো ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে কি না কে জানে!' জীবদত্ত বলল। এই কথার জবাবে খড়গবর্মা কী যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় ভালুক জাতের একজন বল্লম উঁচিয়ে বলল, 'চুপচাপ চল। আর কিছুক্ষণের মধ্যে নিজের চোখেই দেখতে পাবে নেকড়েগুলো কী করছে!'

তেরো

সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ ধরে এগোতে এগোতে হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা।

সামনের লোকটা পিছনের লোকটাকে বলল, 'ওরে ও ভাই এ ব্যাটারা নেকড়েদের আস্তানাকে একটা মজার জায়গা ভেবে বসে আছে। এর আগের বারে যাদের এনেছিলাম তারা তো নেকড়ের গর্জন শুনেই ভয়ে কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু এই দু-জনকে দেখলে মনে হয় এরা একটুও ভয় পায়নি। এদের ভালো করে দেখিয়ে দিই নেকড়ের আস্তানা কী জিনিস!' তখন এদের পিলে চমকে যাবে।

দ্বিতীয় লোকটা খিঁচিয়ে উঠল, 'এখানে অহেতুক আজেবাজে কথা ভেবে সময় নষ্ট করে কী লাভ? এদের তো শেষপর্যন্ত সেখানেই নিয়ে যেতে হবে। এরা নিজেদের চোখে না দেখলে তো বিশ্বাস করতেই পারবে না।' তখন সবাই টের পাবে নেকড়ে কী জিনিস।

'না, আমি বলছি প্রথমেই যদি আমরা এদের সেই ভয়ংকর জায়গাটা দেখিয়ে দিই তাহলে এরা ভীষণভাবে ঘাবড়ে যাবে।'

এ-কথা বলে প্রথম লোকটা অন্ধকারে কিছুক্ষণ কী যেন খুঁজতে লাগল।

তারপর একটা কী যেন নাড়াল। তৎক্ষণাৎ একটা দরজা খুলে গেল।

সেই খোলা দরজা দিয়ে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ল ঘরে।

সেই জ্যোৎস্নার আলাকে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত সুড়ঙ্গের ভিতরে কী আছে না আছে দেখে নিল। সুড়ঙ্গটা কেমন যেন খাড়া ও চওড়া। সোজা একটা পথ চলে গেছে। আবার ডাইনে বাঁয়েও দুটো পথ আছে। সেই পথগুলোও নজরে পড়ল খড়গবর্মা ও জীবদত্তের।

'খড়গবর্মা এটাকে খুব একটা ছোটোখাটো সুড়ঙ্গ বলে মনে হচ্ছে না। এই সুড়ঙ্গ ধরে এগোলে আমরা হয়তো একটা বিরাট অঞ্চল দেখতে পাব যা এই ভালুক জাতের লোক গঠন করেছে। এতে নিশ্চয় ওরা এমন সব জায়গা করে রেখেছে যাতে শত্রুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে।' জীবদত্ত বলল।

জীবদত্তের মুখ থেকে এই ধরনের কথা শুনে ভালুক জাতের একজন হেসে বলল, 'তোমার দেখছি অনুমান করার অসীম ক্ষমতা আছে। এতে যে শুধু লোকজন লুকোতে পারে তাই নয় প্রয়োজন বোধে অনেক দিন লুকিয়ে থেকে বসে বসে খেতেও পারে। বহুলোকের খাবার মতো খাদ্যের গোপন গোদামও অনেক আছে।'

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত ওর কথা মন দিয়ে শুনছে দেখে লোকটা উৎসাহিত হয়ে বলল, 'কোনোরকমে তোমরা যদি ওই নেকড়েদের কাছ থেকে বেঁচে আসতে পার তাহলে বাকি জীবনটা তোমরা বেশ ভালোভাবেই গুরু ভালুকের সেবা করে কাটিয়ে দিতে পারবে।'

'আমরাও নেকড়েদের আস্তানাটা তাড়াতাড়ি দেখে নিতে চাই। ওটা যে কতখানি ভয়ংকর জায়গা তা একবার নিজের চোখে না দেখে শান্তি পাচ্ছি না।' জীবদত্ত বলল।
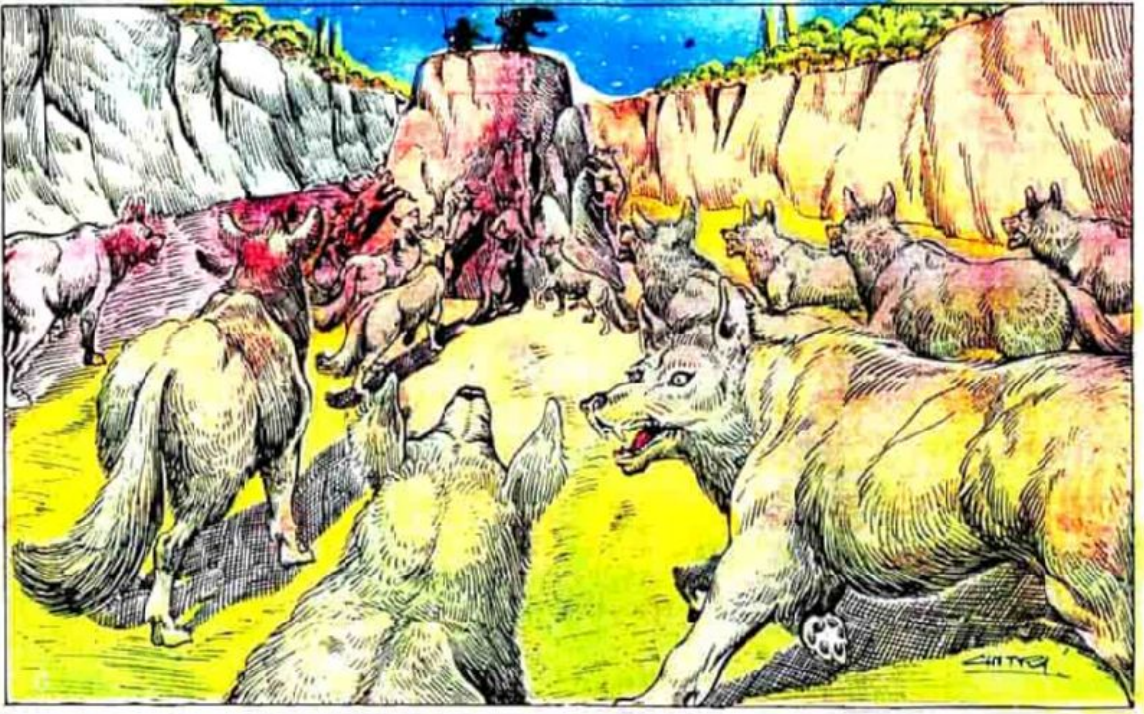
তক্ষুনি ভালুক জাতের একটা লোক ওই দরজা দিয়ে ঢুকে বেরুল। খড়গবর্মা ও জীবদত্ত বাইরের দৃশ্যটা একবার দেখতে পেল। ভালুক জাতের লোকটা যা বলেছিল তাই সত্য।

জ্যোৎস্নার আলাকে তারা দেখতে পেল বহু নেকড়ে এক জায়গায় অস্থিরভাবে ঘোরাঘুরি করছে। বিরাট এক সমতলভূমির মাঝখানে চোদ্দো পনেরো ফুট উঁচু এক পাহাড়ের উপরে দুটো বল্লম নিয়ে দু-জন লোক যথাসাধ্য জোরে ধমক দিচ্ছে নেকড়েদের। আর নেকড়েগুলো গর্জন করতে করতে ওই উঁচু পাহাড়ের অংশে উঠে ওই দু-জনকে টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে খেতে চাইছে।

'আচ্ছা, ওই দু-জনের একজনকে দেখে, বিশেষ করে তার পোশাক দেখে মনে হচ্ছে ও সমরবাহু?' জীবদত্ত বলল।

প্রশ্নটা খড়গবর্মাকে করলেও একজন ভালুক জাতের লোক বলল, 'আমরা জানি না ও কোন বাহু। তবে এটুকু জানি যে সূর্যোদয়ের আগে ওরা নেকড়েদের পেটে যাবে। তারপর তোমাদের দু-জনকেও ওই পাথরের উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। তোমাদেরও ওই ওদের অবস্থাই হবে। তবে কোনোরকমে যদি দেবী বৃকেশ্বরীর কৃপায় তোমরা বেঁচে যেতে পার তাহলে তোমাদের বাকি জীবন গুরু ভালুকের সেবা করে সুন্দরভাবে কেটে যাবে।'

তার মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই জীবদত্ত তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'আরে বাবা, কথায় কথায় অত গুরুর নাম করছ কেন? ওই পাথরের উপর আমাদের রেখে দেওয়া হবে তো? ভালো কথা। আমরা ওই পাথরের উপরে যেতে চাই। আমাদের এক্ষুনি যেতে দাও না কেন। আমরা নিজেরাই চলে যেতে পারি। তোমরা তোমাদের কাজে যাও।'

'অদ্ভুত কথা। এখান থেকে ওই পাথরের উপরে যেতে হলে দরজার ওপার থেকে দশ ফুট নীচে লাফাতে হবে। তারপর নেকড়ের ভিতর দিয়ে হেটে গিয়ে ওই পাথরের উপর উঠতে হবে। নেকড়েদের কাছে গেলে তোমরা আর প্রাণে বাঁচতে পারবে? নেকড়েগুলো তোমাদের একেবারে ফেড়ে ফেলবে। চোখের পলকে তোমাদের দু-জনকে খেয়ে শেষ করে ফেলবে।' ভালুক জাতের একজন বলল।

'বেশ ভালো কথা। এখন তোমরা কীভাবে নিয়ে যেতে চাও বল?' খড়গবর্মা দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের প্রশ্ন করল।

'আর একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে। সেই পথ ধরে গেলে সোজা ওই নেকড়েদের মাঝের পাথরের কাছে পৌঁছে যাবে। ওই পথে না গেলে কোনো উপায় নেই।' ভালুক জাতের লোক বলল।

'বেশ চল। অযথা দেরি করে আর আজেবাজে কথা বলে সময় কাটানোর কী দরকার!' জীবদত্ত বলল।

তাদের কাছে মনে হল বেশি দেরি হলে সমরবাহু ও তার অনুচরকে নেকড়েগুলো শেষ করে ফেলবে। এবং তা যদি হয় তাহলে এত কষ্ট করে এই সুড়ঙ্গপথে আসা অসার্থক

হবে।

তারপর ভালুক জাতের লোক সুড়ঙ্গের উপরের দরজা বন্ধ করে দিল। কিছুদূর ওরা এগিয়ে গেল।

সেখানে সিঁড়ি দিয়ে তুলল খড়গবর্মা ও জীবদত্তকে।

ওরা দেখতে পেল অদ্ভুত আলগা একটা পাথরের টুকরো। ওই পাথরের সংলগ্ন এক সোনার ছড়ি ধরে ওরা জোরে টান মারল। পাথরটা নড়ে একপাশে সরে গেল। ওরা সেখান থেকে দেখতে পেল সমরবাহু ও তার অনুচরকে। খুব কাছ থেকে তাদের এই প্রথম দেখা গেল ও পরিষ্কার চিনতে পারল।

পাথরটা সরার সময় যে আওয়াজ হল তা কানে যেতেই সমরবাহু আর্তনাদ করে উঠল, 'ওরে চন্দু, পাথরের পেট থেকে নেকড়েগুলো উপরের দিকে উঠে আসছে!'

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত উপরে উঠতে উঠতে বলল, 'সমরবাহু, ভয় পেয়ো না। আমরা তোমার বন্ধু।'

খড়গবর্মা ও জীবদত্তকে দেখে সমরবাহুর তো চক্ষুস্থির! কী যেন বলার চেষ্টা করল কিন্তু তার মুখে কোনো কথা সরল না। ওই পথটা পাথরের টুকরো দিয়ে বন্ধ করতে করতে ভালুক জাতের লোক বলল, 'ও তোমরা তাহলে এক গোয়ালের গোরু। তাহলে তো ভালোই হল সবাই একসঙ্গে নেকড়ের পেটে যাবে। বেশ মজা হবে!'

খড়গবর্মা রক্তচক্ষু করে তার দিকে তাকাল কিন্তু তক্ষুনি ওই পাথরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। জীবদত্ত সমরবাহুর কাঁধ চাপড়ে বলল, 'সমরবাহু, ভয় পেয়ো না। স্বর্ণাচারির কাছে আমরা সব খবর পেয়েছি। সে আমাদের পুরোনো বন্ধু। এই মারাত্মক জায়গা থেকে নিরাপদে নিজেদের আস্তানায় যাব। বিশ্বাস রাখ।'

'আমরা পৈত্রিক প্রাণটা নিয়ে এখান থেকে যেতে পারব! এ কী করে সম্ভব! এই পাথর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ তো ওরা পাথর চাপা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। আর এমনি নামতে গেলে তো নেকড়েদের পেটে যেতে হবে।' সমরবাহু নিরাশ হয়ে বলল।

'ওই নেকড়ে আর আমাদের যারা বন্দি করেছে তারাই আমাদের পথ দেখাবে। এই পাথরের চারপাশে দুর্গের প্রাচীর। উপরে আমরা চাঁদ দেখতে পাচ্ছি। সব দেখে-শুনে মনে হচ্ছে এই অঞ্চলে ঢোকার দু-একটা সুড়ঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।' জীবদত্ত বলল।

'আপনার কথা বুঝলাম। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না কীভাবে, কোন কৌশলে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পালাতে পারব।' সমরবাহু বলল।

জীবদত্ত এই কথার জবাবে কী যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় একটা নেকড়ে লাফিয়ে ওদের প্রায় কাছে এসে পড়ল। পাথরের খাঁজে একটা পা রেখে উপরে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা

করছে ঠিক সেই মহূর্তে খড়গবর্মা তরবারি তুলে তার ঘাড়ে দিল একটা কোপ বসিয়ে। নেকড়ে ওই এক কোপেই মাটিতে পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় গড়াগড়ি খেতে লাগল।

'খড়গবর্মা, খুব ভালো কাজ সময়মতো করেছ।' জীবদত্ত খড়গবর্মাকে প্রশংসা করল। বলল, 'বুঝলে সমরবাহু, এই মরা নেকড়েটা আমাদের কাজে দেবে। আচ্ছা তুমি কি শুনেছ ওরা নেকড়েদের খেতে দেয় কখন?'

'ওদের মুখে শুনেছি, সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তের সময় ওরা কোনো জন্তুজানোয়ার মেরে ওদের সামনে ফেলে দেয়। তবে আজ আর ওদের সেই পরিশ্রম করার দরকার হবে না। কারণ আমাদের সবাইকে ছিড়ে খাবার পর নেকড়েদের আর খিদে থাকবে না।'

'খড়গবর্মা আমরা প্রথমে যে সুড়ঙ্গ পথ দেখতে পেয়েছিলাম সেই পথ দিয়েই ওরা বোধ হয় খেতে দেয়।' জীবদত্ত বলল।

দূরে একটা দরজা দেখতে পেল খড়গবর্মা। মাটি থেকে দশ ফুট উঁচুতে ছিল সেটা।

সেদিকে দেখিয়ে সে বলল, 'নেকড়েদের খাবার দেবার এটাই একমাত্র পথ আছে মনে হচ্ছে। কী ভাবছ? ভালো একটা পরিকল্পনা মাথা থেকে বের কর। তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরোতেই হবে।'

'গুরু ভালুক এমন একটা জায়গায় আমাদের পাঠিয়েছে যাতে কোনো পথ দিয়েই আমরা বেরোতে না পারি। এবং এটাই ওদের আর ওদের গুরুর কাল হবে।' জীবদত্ত চারদিক তাকাতে তাকাতে বলল।

তারপর কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই চুপচাপ। রাত গভীর হয়েছে। কোনোদিকে কোনো সাড়াশব্দ নেই নেকড়েদের গর্জন ছাড়া। একজন বাদে বাকি সবাই ওই পাথরের উপর ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হতেই নেকড়েদের গর্জন যেন হাজার গুণ বেড়ে গেল। চারদিকে ছড়ানো নেকড়েগুলো যে পথে খাবার দেয় সেই পথের দরজার দিকে ধেয়ে গেল।

নেকড়েদের গর্জন শুনে সবার ঘুম ছুটে যায়। জীবদত্ত খড়গবর্মাকে ওই পথ দেখিয়ে বলল, 'আমরা যা ভেবেছিলাম সেটাই ঠিক। ভালুক জাতের লোকটা ওই দরজা দিয়ে নেকড়েদের খাবার ছুড়ে দেবার আয়োজন করছে। তুমি তির-ধনুক নিয়ে প্রস্তুত থাক। লোকটাকে দেখামাত্র তির ছুড়বে।'

জীবদত্তের কথামতো খড়গবর্মা তাক করে বসে রইল। সমরবাহু সে দৃশ্য দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'অতগুলো লোকের মধ্যে আমরা দু-একজনকে মেরে ওদের কোনো ক্ষতি করতে পারব কি? আরও ঝামেলা বাড়বে। সবাই মারমুখী হয়ে যাবে। তখন

আর কোনোদিক দিয়েই পালানোর পথ আমরা খুঁজে পাব না। ওরা আমাদের কাঁচা চিবিয়ে ফেলবে।'

সমরবাহুর সে-কথা শুনে হাসতে হাসতে জীবদত্ত বলল, 'সমরবাহু, এখন তো ওরা আমাদের নেকড়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। নেকড়েগুলো যাতে টেনে ছিঁড়ে খেতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অপরাধীকে ঘৃণা করতে শেখ। ওদের বাঁচিয়ে রাখার অর্থ আমাদের মৃত্যু। মরার আগে মরিয়া হয়ে শেষ বারের মতো কিছু করা ভালো নয় কি?'

জীবদত্তের কথা শেষ হতে-না-হতেই ভয়ংকর এক আওয়াজ হয়ে দরজা খুলে গেল। ভালুক জাতের একটা লোক পশুর মাংস ভরতি একটা ঝুড়ি এনে নেকড়েদের দিকে মাংস ছুড়ে দিতে লাগল। ঠিক তখনই জীবদত্তের ইশারা পেয়ে খড়গবর্মা তির ছুড়ল। তির সোজা গিয়ে ভালুকজাতের একজনের মাথায় গভীরভাবে বিধল। সে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পরক্ষণে আর একজনও সুড়ঙ্গের পথে পড়ে গেল।

সাড়া সুড়ঙ্গে কোলাহল শুরু হয়ে গেল। বৃকেশ্বরীর সামনে পদ্মাসনে বসে ধ্যান করছিল গুরু ভালুক। আর্তনাদ আর কোলাহল শুনে চমকে উঠে বলল, 'এ কীসের চিৎকার? কোলাহল কীসের? নেকড়েগুলো কি খেতে পায়নি? কাল যাদের পাথরে তুলে দেওয়া হয়েছে তারা কি বেঁচে আছে?'

'গুরু! গুরু সর্বনাশ হয়ে গেছে। ওরা তির ছুড়ে আমাদের একজনকে মেরে ফেলেছে! ওদের কাছে আরও তির আছে! এখন আমাদের কী হবে গুরু?'

গুরু ভালুক চোখ লাল করে বলল, 'আমি বৃকেশ্বরীর শ্রেষ্ঠ ভক্ত! সাধারণ মানুষ কী করতে পারে আমার! ওদের সবাইকে আমি এক্ষুনি পঞ্চশূলের আহুতি করে দিচ্ছি।' বলে গুরু ভালুক সুড়ঙ্গপথে এগিয়ে গেল।

চোদ্দো

খড়গবর্মার তির লাগার সঙ্গে সঙ্গে ভালুক জাতের একজন শিষ্য আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ওর পড়ে যাওয়ার পর খড়গবর্মা ও জীবদত্তের টনক নড়ল। তারা তখন বুঝতে পারল যে তাদের বিপদ আসবে নেকড়েদের দিক থেকে নয়, তাদের এবার বিপদে ফেলবে ভালুক জাতের শিষ্যরা।

জীবদত্ত সুড়ঙ্গের উপরের দরজার দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকাল। লক্ষ করল তার দিকে কোনো শিষ্য এগিয়ে আসছে কি না। তারপর মাথা ঘুরিয়ে বলল, 'সমরবাহু, আমরা অবিলম্বে দু-দিক থেকে আক্রান্ত হতে পারি। আমরা যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছি তার নীচের সুড়ঙ্গপথে ওরা আসতে পারে আর অন্য পথ হল আমাদের সামনের ওই সুড়ঙ্গ

পথ। তাই এই দুটো পথের দিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাহাহুড়ো করে কিছু করলে আবার হিতে বিপরীত হবে।'

এ-কথা শুনে সমরবাহুর চোখ-মুখের অবস্থা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভাঙা গলায় বলল, 'হুজুর, আপনারা দু-জন আমার নেতা। আমাকে একমাত্র আপনারাই বাঁচাতে পারেন। আপনারা যা বলবেন তাই করব।'

সমরবাহুর অতটা ঘাবড়ানো দেখে খড়্গবর্মার হাসি পেল। হাসি চেপে সে বলল, 'সমরবাহু, বিঘ্নেশ্বর পূজারি ও স্বর্ণাচারির কাছে তোমার সম্পর্কে শুনেছি। জানতে পারলাম তুমি নাকি রেগিস্তান থেকে এসেছ এখানে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে? এত বড়ো কাজে বেরিয়ে এই সামান্য ঘটনায় তোমার এত ভয়? এই বিপদ থেকে কীভাবে মুক্ত হতে পারি সে সম্পর্কে একটু ভাবতে পার না?'

'কী ভাবব? এরা যে কি মারাত্মক ধরনের আপনি তা জানেন না। শত্রু ক্ষত্রিয় হলে আমি তৎক্ষণাৎ তরবারি দিয়ে আক্রমণ করতে পারতাম। কিন্তু এরা যে মন্ত্রতন্ত্র জানা নেকড়ে আর ভালুকের চামড়া পরা অদ্ভুত মানুষ নামক জন্তু। এদের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়তে হয় আমি যে তা জানি না।' সমরবাহু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল।

সমরবাহুর কথা শুনে জীবদত্তের হাসি পেলেও সে তা প্রকাশ না করে বলল, 'সমরবাহু, তুমি যে কত বড়ো বীর তার প্রমাণ দেবার সময় এসেছে। এই পাথরের নীচের সুড়ঙ্গ দিয়ে যাতে কোনো শত্রু না আসে তার ব্যবস্থা তোমরা দু-জনে কর। এতক্ষণে গুরু ভালুক খবর পেয়ে গেছে যে তার এক শিষ্য তিরবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। এবার দেখা যাক ও কী করে!'

জীবদত্তের মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই গুরু ভালুক সুড়ঙ্গের দরজায় দাঁড়িয়ে রক্তচক্ষু করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ওরাও তাকিয়ে ছিল গুরু ভালুকের দিকে। গুরু ভালুক বলল, 'পাজি বদমাইশের দল! তোমাদের এত বড়ো সাহস! হুঁ! তোমরা স্বয়ং বৃকেশ্বরীর শিষ্যকে তির দিয়ে মেরে ফেলেছ! এখন তোমাদের পঞ্চশূলে বিদ্ধ করে নেকড়েদের খাবার করে ফেলছি। প্রস্তুত হও।'

গুরু ভালুকের আওয়াজ শুনতে পেয়ে নেকড়েগুলো গর্জন করতে লাগল। তারা যেন জোট পাকিয়ে অভিযোগ করছে তাদের খাবার-দাবার দেওয়া হয়নি বলে। প্রত্যেক দিন এই সময় খাবার দেওয়া হয় অথচ আজ খাবার দেবার লোকের পাত্তা নেই। তারা গুরু ভালুকের দিকে মাথা উঁচু করে তাকিয়ে গর্জন করে প্রার্থনা করছে কি দাবি জানাচ্ছে বোঝা গেল না। নেকড়েগুলো অস্বাভাবিকভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে গর্জন করছে। গুরু ভালুক যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ছিল তা মাটি থেকে মাত্র দশ ফুট উঁচু। নেকড়েগুলো যেরকম করছে হঠাৎ ওই পাথরের উপর লাফিয়ে উঠে পড়াও বিচিত্র নয়। আবার তক্ষুনি সুড়ঙ্গপথে

ফিরে গেলে সমরবাহু প্রমুখরা তাকে ভীত ভাবতে পারে। এইসব সাত-পাঁচ ভেবে গুরু ভালুক না পারছে এগোতে না পারছে পেছতে। আবার পারছে না দাঁড়িয়ে থাকতেও। সে কেমন যেন হয়ে গেল। পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

জীবদত্ত এমন ভাব করল যেন সে গুরু ভালুকের মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছে। হঠাৎ হাতের মন্ত্র দণ্ড উপরে তুলে চিৎকার করে বলল, 'ওরে এই গুরু ভালুক! আমি বুঝতে পারছি না, তুমি নিজে ভালুক জাতের হয়ে কেন বৃকেশ্বরীর পুজো করছ। তোমার তো ভালুকেশ্বরীর পুজো করা উচিত। বেশ বুঝতে পারছি তুমি বুদ্ধি খাটো আছ। এই দেখ আমি তোমার সামনে এতগুলো নেকড়ের মাঝ দিয়ে তোমার কাছে যাচ্ছি। তুমি পালিয়ো না। ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক। নড়বে না কিন্তু।'

এই ঘোষণা শুনে সমরবাহুর ভীষণ ভয় করল। জীবদত্ত যা বলেছে তাই করেছে। এখন যা বলছে তাও করতে পারে ভেবে সে বলল, 'কী বলছেন হুজুর! এই এতগুলো নেকড়ের ভিতর দিয়ে ওর কাছে যাবেন? এ কিন্তু সেধে বিপদ ডেকে আনা হচ্ছে। তা ছাড়া গুরু ভালুক মন্ত্রতন্ত্রও জানে।'

এ-কথার পিঠে খড়্গবর্মা হাতের তরবারি উপরে তুলে বলল, 'সমরবাহু, আমার এই তরবারি আর জীবদত্তের ওই মন্ত্র দণ্ডের ক্ষমতা যে কত বেশি তা তুমি জানো না বলেই অত ভয় পাচ্ছ ওই গুরু ভালুককে।'

খড়্গবর্মার কথা শেষ হতে-না-হতেই ওরা যে পাথরের উপর দাঁড়িয়েছিল তার ওপার থেকে অনেকগুলো মানুষের গলা শোনা গেল। ওই চিৎকার হইচই শুনে জীবদত্ত সঙ্গীসাথীদের সাবধান করে দিয়ে বলল, 'তোমরা সাবধানে থেকো। গুরু ভালুক এই পাথরের নীচের সুড়ঙ্গপথে কিছু শিষ্যকে পাঠিয়ে আমাদের আক্রমণ করার ব্যবস্থা করেছে।'

এই সাবধানবাণী শুনেই সমরবাহু ও অনুচর বল্লম তুলে পাথরের নীচের সুড়ঙ্গপথের দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে রইল। তা দেখে ওদিক থেকে গুরু ভালুক তার এক শিষ্যকে বলল, 'এরা এত বোকা হয়ে গেল কেন বুঝতে পারছি না। আমি বলেছিলাম চুপচাপ গিয়ে অতর্কিতে ওদের উপর আক্রমণ করতে। কিন্তু এই জানোয়ারগুলো হইহই করে একটা দেশ জয় করার মতো গেল! ওরা তো বুঝে গেছে। এখন কী হবে! ওদের হাতে অস্ত্র দিয়ে ওই পাথরের উপর পাঠানোই ভুল হয়েছে দেখছি।'

জীবদত্ত অনুমান করতে পারল গুরু ভালুকের চিন্তাভাবনা। খড়্গবর্মাকে সে বলল, 'খড়্গবর্মা, এখন গুরু ভালুকের উপর তির চালানো বৃথা, তুমি তার দিকে তির-ধনুক ঠিক করে দাঁড়ালেই সে টের পেয়ে পালাবে। ও সুড়ঙ্গপথে ঢুকে গেলে আর তাকে ধরা যাবে না।'

'তোমার কথা ঠিক। কিন্তু সমরবাহুকে এদের হাত থেকে উদ্ধার করে স্বর্ণাচারির কাছে পাঠানো যাবে কী করে?' খড়গবর্মা জীবদত্তকে জিজ্ঞেস করল।

জীবদত্ত কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'খড়গবর্মা, সমরবাহুকে কী করে মুক্ত করা যায় তা আমি ভেবেছি। মনে আছে, আমরা সিংহ শিকার করে পদ্মপুরের রাজার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। ঠিক ওইভাবেই নেকড়ে শিকার করে এই সুড়ঙ্গে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে হবে।'

'তাহলে আর দেরি কেন? শুরু করা যাক।' খড়গবর্মা উৎসাহভরে বলল।

'তবে তাই হোক। তুমি ওই মরা নেকড়েটাকে কাঁধে ফেলে নাও। এর মাংস খাওয়ার জন্য নেকড়েগুলো তোমার পিছনে ধাওয়া করবে। সুযোগ পেলে অবশ্য তোমাকেও আক্রমণ করতে ছাড়বে না। অতএব সতর্ক থেকো। নিজের তরবারি সবসময় উঁচিয়ে রাখতে ভুলো না।' জীবদত্ত বলল।

জীবদত্ত মরা নেকড়েকে কাঁধে ফেলে নিল। জীবদত্তের কথা আর খড়গবর্মার কাজ সমরবাহু বুঝতে পারল না। ভয়ে ভয়ে বলল, 'হুজুর, আপনারা কী বলছেন আর কী করছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি কিন্তু ভীষণ ভয় পাচ্ছি।'

'সমরবাহু, ভয় পেয়ো না। নীচের সুড়ঙ্গপথ দিয়ে ওরা যদি এখানে আসতে চেষ্টা করে এক-এক জনকে বল্লম দিয়ে মেরে ফেলবে। ওরা দল বেঁধে এখানে আসতে পারবে না। এক-এক করেই এই সরু পথে আসতে বাধ্য। আমরা দু-জনে নেকড়েদের মধ্যে নেমে যাচ্ছি। চেষ্টা করব যে পথে গুরু ভালুক এসেছে ওই পথেই নেকড়েদের ঢুকিয়ে দিতে। তাহলেই এই সুড়ঙ্গে, এই দুর্গে দারুণ ছোটাছুটি পড়ে যাবে।'

'হুজুর, এ কিন্তু দুঃসাহসের কাজ হচ্ছে।' সমরবাহু বলল।

'সাহসের কাজ হতে পারে কিন্তু এটাকে দুঃসাহসের কাজ কোনোক্রমেই বলা যায় না। সমরবাহু আর কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি নিজেই দেখতে পাবে।' জীবদত্ত হাসতে হাসতে বলল।

'জীবদত্ত, আজেবাজে কথাতেই সময় চলে যাচ্ছে। আমি আর কতক্ষণ এই মরা নেকড়ে কাঁধে করে দাঁড়িয়ে থাকব?' খড়গবর্মা বলল।

'এবার তাহলে নামছি। যতগুলো সম্ভব নেকড়েকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। আমি তোমার পিছনে পিছনে ছুটতে থাকব। তারপর...'

জীবদত্তের কথা শেষ হতে-না-হতেই খড়গবর্মা চিৎকার করে বলল, 'ওহে গুরু ভালুক, আমরা তোমার কাছে যাচিছ। জানে বাঁচতে চাও তো তুমি আর তোমার বৃকেশ্বরীদেবী এই

সুড়ঙ্গ আর দুর্গ ছেড়ে পালাও।' এ-কথা বলে খড়গবর্মা পাথরের উপর থেকে নীচে ঝাঁপ দিল।

দু-জন মানুষকে মরা নেকড়ে কাঁধে নিয়ে লাফিয়ে পড়তে দেখে নেকড়েগুলো গর্জন করে ওদের দিকে ধেয়ে এল।

খড়গবর্মা মরা নেকড়ে কাঁধে নিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছোটাছুটি করতে লাগল। নেকড়েদের পিছনে ছুটল জীবদত্ত। জীবদত্ত মন্ত্র দণ্ডের আঘাতে আঘাতে বহু নেকড়েকে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে দিল।

সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে এইসব ব্যাপারকে তামাশা ভেবে চিৎকার করে হাততালি বাজাতে বাজাতে বলল, 'এ সবই মা বৃকেশ্বরীর ইচ্ছা। শত্রুর মতিভ্রম ঘটিয়ে তাদের নিজের বাহনের মধ্যে নামিয়ে দিয়েছেন। স্বয়ং মা বৃকেশ্বরী ইচ্ছা করলে কী না করতে পারে।' এ-কথা বলে সে চোখ বুজে ভক্তিভরে উপরের দিকে তাকাল।

এতক্ষণ ঘুরছিল খড়গবর্মা ও জীবদত্ত। গুরু ভালুকের অবস্থা দেখে তারা ঠিক করল এই সুযোগেই যা করার করে ফেলতে হবে। জীবদত্ত খড়গবর্মাকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, 'খড়গবর্মা, এই হল মোক্ষম মুহূর্ত।'

খড়গবর্মা পরমুহূর্তেই মরা নেকড়েকে কাঁধ থেকে তুলে সোজা ছুড়ে দিল গুরু ভালুকের উপর।

নিজেদের খাদ্যকে পড়তে দেখে চার-পাঁচটা নেকড়ে লাফিয়ে পড়ল সেইখানে। চোখ খুলে গুরু ভালুক দেখে তার কাছে একটি মৃত ও চার-পাঁচটা জ্যান্ত নেকড়ে লাফালাফি করছে।

তারপর গুরু ভালুক 'হে বৃকেশ্বরী!' বলে ডেকে উঠে নেকড়েদের ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিলে, 'নেকড়ে! নেকড়ে!' বলে চিৎকার করতে লাগল শিষ্য ক-জন। তারা সুড়ঙ্গে চিৎকার করতে করতে ছোটাছুটি করতে লাগল।

গুরু ভালুক কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল, তার কাছেই মৃত নেকড়েকে টেনে ছিঁড়ে খাচ্ছে কয়েকটা নেকড়ে। একটি নেকড়ে কিছুতেই সুযোগ পাচ্ছে না এক টুকরো ছিঁড়ে নেবার। সে একটু সরে দাঁড়িয়ে গুরু ভালুকের দিকে গর্জন করতে করতে তাকাচ্ছিল। তার মতলব বুঝতে পেরে গুরু ভালুক শূলে বিদ্ধ করে বলল, 'দেবী বৃকেশ্বরীর প্রধান ভক্তকেই তুই খেতে চাস! তোর এত বড়ো সাহস!' বলে পেছিয়ে সুড়ঙ্গপথে ঢুকে গেল গুরু ভালুক।

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করছে অন্য নেকড়েদের তাড়া করে ওই সুড়ঙ্গপথে ঢুকিয়ে দেবার। ওরা বুঝতে পারল না সুড়ঙ্গে ইতিমধ্যে কী ঘটে গেছে! তারা এও জানতে পারল না যে গুরু ভালুক নেকড়ের পেটে গেছে কি না।

'খড়গবর্মা, আমাদের আর এখানে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। একটা খটকা রয়ে গেল। গুরু ভালুক মারা গেছে কি না সঠিক জানা গেল না। তবে এটা ঠিক নেকড়ে ঢোকার ফলে সুড়ঙ্গে এক দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হবে। একটা কোলাহল শুনতে পাচ্ছ?' জীবদত্ত বলল।

'শুনতে পাব না কেন? আমার ধারণা এতক্ষণে ওই ভীতু লোকগুলো সুড়ঙ্গ ছেড়ে বনে পালিয়েছে। তবে যেকোনোভাবে গুরু ভালুককে জ্যান্ত ছাড়া উচিত নয়।' খড়গবর্মা নিজের মত জানাল।

'আমরাও চল ঢুকি ওই সুড়ঙ্গপথে। সমরবাহু ও তার অনুচরকে তাড়াতাড়ি ডাক এখানে।' জীবদত্ত বলল।

'খড়গবর্মার ডাক শুনে সমরবাহু ও তার অনুচর এক লাফে ওই পাথরের উপর থেকে নেমে ছুটে এল তাদের কাছে। জীবদত্ত ওদের বলল, 'সমরবাহু, আমরা এখন ওই পথ দিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকতে যাচ্ছি।'

'আমরা এই সুড়ঙ্গের সবাইকে জব্দ করতে পারব? সবচেয়ে ভালো হত অন্য কোনো পথ দিয়ে এখান থেকে পালিয়ে বনে চলে যাওয়া।' সমরবাহু ভয়ে ভয়ে বলল।

'আমরা নেকড়েদের মধ্যে ছিলাম। এখান থেকে বাইরে যাওয়ার অন্য কোনো পথ নেই। এই পথেই যেতে হবে আমাদের।' বলে জীবদত্ত এক লাফে সুড়ঙ্গপথের মুখে পৌঁছে গেল। তার পিছনে গেল খড়গবর্মা।

সমরবাহু ও তার অনুচর কী করবে ঠিক করতে না পেরে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক তখনই ওদের খাবার আশায় এক এক করে নেকড়েগুলো ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

পনেরো

সমরবাহু এদিক-ওদিক তাকিয়ে সুড়ঙ্গের দুর্গ এড়িয়ে অন্য কোনো পথে পালানো যায় কি না ভাবছে। হঠাৎ তার অনুচর লাফ দিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'প্রভু, নেকড়েগুলো আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমাদের আর বাঁচার কোনো উপায় দেখছি না। চলুন যাই ওই সুড়ঙ্গের দরজায়।'

জীবদত্ত সমরবাহুর দিকে এগিয়ে আসতে দেখল নেকড়েদের। তৎক্ষণাৎ নিজের মন্ত্র দণ্ড নিয়ে তা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেকড়েদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়ে বলল, 'সমরবাহু, যাই ঘটুক না কেন, আমদের দুর্গে যেতেই হবে। শত্রুকে হটাতেই হবে। তা ছাড়া আমাদের মুক্তি নেই। তোমরা দু-জনে তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গের দরজার কাছে চলে যাও। দেরি করো না। দেরি করেছ কী মরেছ!'

ইতিমধ্যে খড়গবর্মা দরজার ওপার থেকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'সমরবাহু, চন্দু, তোমরা তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে উপরে উঠে এসো।'

সমরবাহু আর তার অনুচর খড়গবর্মার কথামতো তার হাত ধরে এক লাফে উপরে উঠে গেল। জীবদত্তও ওদের সঙ্গে ওই পথে এগিয়ে গেল।

এখন চার জনে মিলে সুড়ঙ্গপথে এগোচ্ছে। ওই ঘন অন্ধকারে ওরা সেই মরা নেকড়েকে দেখল। খড়গবর্মাই ওটাকে ছুড়ে ফেলেছিল।

'জীবদত্ত, আমরা যে কথা ভেবেছিলাম সেইমতোই সব হচ্ছে দেখছি। মরা নেকড়েকে ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে চার-পাঁচটা নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওগুলো কোথায়? আর ভালুক দলের লোকগুলো গেল কোথায়? ওরা কি দুর্গে আছে, না জঙ্গলে পালিয়েছে?' বলল খড়গবর্মা।

জীবদত্ত সাথে সাথে তাকে কোনো জবাব দিল না।

কান খাড়া করে কিছু শোনার চেষ্টা করে বলল, 'খড়গবর্মা, দুর্গে কী যেন হইচই হচ্ছে। মনে হচ্ছে কী যেন ঘটেছে! সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে শোনার চেষ্টা কর। তারপর আমরা কর্তব্য স্থির করব।'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর চন্দু বলল, 'হুজুর, নেকড়েদের ভয়ংকর চিৎকার শুনতে পাচ্ছি।'

সমরবাহু চোখ বড়ো বড়ো করে মাথা নেড়ে বলল, 'আমি শুধু নেকড়েদের গর্জনই শুনতে পাচ্ছি না, গুরু ভালুকের চিৎকারও শুনতে পাচ্ছি। এখানে আমাদের এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয়। আক্রান্ত হওয়ার আগেই আমাদের পালানো উচিত।'

'তুমি না একটা সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখছিলে? তুমি এত ভীরু কেন? তোমার প্রাণের এত ভয়?' খড়গবর্মা কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করে ও বিরক্ত হয়ে বলল।

সমরবাহু হাতের বল্লমটাকে শক্ত করে ধরে দৃঢ়তার সাথে বলল, 'সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছে আছে বলেই এত তাড়াতাড়ি মরতে চাই না। আপ্রাণ চেষ্টা করে বাঁচতে চাই।'

সমরবাহুর কথা শুনে খড়গবর্মা হাসতে গিয়ে জীবদত্তের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। হাসতে পারল না। প্রতিপক্ষের বিষয়ে কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না। তার চোখে নির্দেশের ছাপ। জীবদত্ত এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'সমরবাহু, তুমি এই মন্ত্র দণ্ড আর খড়গবর্মার তরবারি দেখেছ? এই দুটো তোমাকে অক্ষত দেহে স্বর্ণাচারির কাছে পৌঁছে দেবে। তার মানে এই নয় যে চরম বিপদেও তোমাকে তোমার বল্লম ব্যবহার করতে বারণ করছি। আমরা তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি। এটা ঠিক যে তোমাকে উদ্ধার করার মূল দায়িত্ব আমাদের। আমরা সমস্ত রকমের ঝুঁকি নিয়ে তোমাকে উদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর। আমাদের সঙ্গে থেকে তুমিও নিশ্চয় চেষ্টা করবে উদ্ধার হতে। আমাদের মতো তোমাকেও আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে।'

তারপর তারা এগিয়ে যেতে লাগল সুড়ঙ্গপথ ধরে।

তারা যত এগোতে থাকে ভালুক জাতের লোকের আর্তনাদ ও নেকড়েদের গর্জন বেশি করে শুনতে পায়।

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত আশ্চর্য হয়ে ভাবে মাত্র চার-পাঁচটা নেকড়ে দুর্গের মধ্যে এতটা আতঙ্কের সৃষ্টি করতে পারল কী করে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা ভালুক জাতের লোকের আস্তানায় পৌঁছে গেল। জীবদত্তের সন্দেহ হল গুরু ভালুক বৃকেশ্বরী দেবীর কাঠের মূর্তির ঘরে আছে।

'খড়গবর্মা, আমার মনে হচ্ছে ভালুক জাতের সবাই জঙ্গলে পালিয়ে যায়নি। ওরা চলে গেলে নেকড়েগুলো এখানে থাকত না। আবার ওদের নজরে পড়ে গেলে এখান থেকে বেরোনো আমাদের পক্ষে কঠিন হবে।' চারদিকে তাকাতে তাকাতে জীবদত্ত বলল।

জীবদত্তের কথা শেষ হতে-না-হতেই ভালুক জাতের একজন আর্তনাদ করতে করতে ছুটে এল।

আর তার পেছনে তাকে ধাওয়া করে আসছে একটা নেকড়ে। মুহূর্তে খড়গবর্মা তৎপরতার সঙ্গে দ্রুতবেগে তরবারি বের করে ওই নেকড়েকে আঘাত করল।

খড়গবর্মার কাছ থেকে আঘাত পেয়ে গোঙাতে গোঙাতে নেকড়ে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে গেল।

ভালুক জাতের লোক নেকড়ের তাড়া খেয়ে এসে একেবারে খড়গবর্মা ও জীবদত্তের সামনে পড়ে গেল। ওদের দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগল। ওর অবস্থা দেখে জীবদত্ত তার কাছে গিয়ে বলল, 'ওহে গুরু ভালুকের শিষ্য তুমি যে এখন আমাদের কাছে এসেছ এ সবই দেবী বৃকেশ্বরীর মহিমা। তুমি তাড়াহুড়ো করে জোরে জোরে কথা বল না। আমি যেসব প্রশ্ন করব তুমি আস্তে আস্তে তার জবাব দেবে।'

'আর শোনো, একটিও মিথ্যে কথা বলেছ কী গলা কেটে ফেলব।' খড়গবর্মা তরবারি দেখিয়ে বলল।

'এবার বল দেখি, তোমার গুরু ভালুক এখন কোথায়? তোমার দলের সবাই এখনও সুড়ঙ্গে আছে না জঙ্গলে পালিয়েছে। তাড়াতাড়ি সত্য কথা বল। আর তা না হলে...।' জীবদত্ত মন্ত্র দণ্ড নাড়তে নাড়তে বলল।

'আজ্ঞে আমাদের এই সুড়ঙ্গ থেকে একজনও পালিয়ে যায়নি। নেকড়েদের ভয়ে এদিক-ওদিক লুকিয়ে থাকতে পারে। গুরু ভালুক বৃকেশ্বরী দেবীর ঘরে পুজো করছেন।' ভালুক জাতের লোক বলল।

'তোমরা তো মানুষদের ধরে ধরে গোলাম বানিয়ে কাজ করাও! বীরপুরুষ! নেকড়েদের এত ভয় পাও কেন?' খড়গবর্মা বলল।

'মানুষগুলো তো ঠাণ্ডা হয়, পোষ মানে। কিন্তু ঠাণ্ডা হয় না এই নেকড়েগুলো। ওদের প্রাণের ভয় নেই।' ভালুক জাতের লোকটি বলল।

ওর কথায় জীবদত্ত হেসে বলল, 'ভয় পেয়েছ তা স্বীকার না করে বেশ ভালোভাবেই দেখছি তুমি অন্য কথা বলতে পার। যাক, গুরু ভালুক যদি বৃকেশ্বরী দেবীর ঘরে না থাকে তাহলে তোমাকে মেরে ফেলা হবে।'

'আমি মিথ্যা কথা বলি না হুজুর। ইচ্ছে করলে আপনারা গিয়ে দেখতে পারেন।' জীবদত্তের সামনে নুয়ে ভালুক জাতের লোকটা বলল। চারদিকে চোখ ফেরাতে ফেরাতে শুনছিল খড়গবর্মা।

'ঠিক আছে, চল। এখনই প্রমাণ পেয়ে যাব। ধোকা দেবার চেষ্টা করলে জ্যান্ত রাখব না।' জীবদত্ত গম্ভীর গলায় ধমক দিয়ে বলল।

তারপর গুরু ভালুকের শিষ্য খড়গবর্মা ও জীবদত্তকে নিয়ে এগোল। কিছুদূর গিয়ে ওদের বলল, 'ওই দেখুন হুজুর, বৃকেশ্বরী দেবীর ঘরে গুরু ভালুক রয়েছেন।'

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিল। এরপর কি করবে না করবে ঠিক করে নিল। অজানা জায়গায় অজানা মানুষের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানার প্রস্তুতি নিয়ে নিল তারা।

খড়গবর্মা পা টিপে টিপে এগিয়ে দরজা আস্তে আস্তে ঠেলল। একটু ঠেলতেই সহজেই খুলে গেল দরজাটা।

দেখতে পেল বৃকেশ্বরী দেবীর সামনে সাষ্টাঙ্গে গুরু ভালুক পড়ে আছে। কী যেন বিড়বিড় করে বলছে! ইঙ্গিতে জীবদত্তকে কাছে ডেকে ফিসফিস করে কী যেন বলল।

জীবদত্ত খড়গবর্মাকে পালটা প্রশ্ন করল, 'তুমি কি চাও এখানেই গুরু ভালুককে মেরে ফেলি।'

জীবদত্ত কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'খড়গবর্মা, এই গুরু ভালুককে মেরে কী হবে? আর ওর শিষ্যদেরই বা মেরে কোনো লাভ আছে? তার চেয়ে একটা মজা করা যাক। তুমি ওই মূর্তির পেছনে চলে যাও। সেখান থেকে অন্যরকম গলায় যেন বৃকেশ্বরী দেবী নির্দেশ দিচ্ছেন এমনভাবে বল যাতে গুরু ভালুক শিষ্যসহ এই সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে বনে চলে যায়।'

'বললেই চলে যাবে? তুমি বিশ্বাস কর? আমি আরও দু-চার কথা জুড়ে দেব। তবে একটা কথা ও যদি টের পেয়ে কায়দা করে এসে আমার উপরেই হামলা চালায় তাহলে

কিন্তু আমি এই তরবারি দিয়ে ওকে মেরে ফেলব।' বলল খড়গবর্মা জীবদত্তকে।

'যা করতে চাও তাড়াতাড়ি কর। ওর পুজো হয়ে গেলে আর আমরা কায়দা করতে পারব না।' অনেক কিছু ভেবে বলার মতো জীবদত্ত বলল।

খড়গবর্মা বিড়ালের মতো পা টিপে টিপে ওই মূর্তির পেছনে গিয়ে গুরুগম্ভীর গলায় বলল, 'গুরু ভালুক আমি তোমার ভক্তিতে প্রসন্ন। দেবদ্রোহীরা এই সুড়ঙ্গে ঢুকে এটাকে অপবিত্র করে ফেলেছে। আমি এই মুহূর্তে এখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে পূর্ব দিকের বনে চলে যাচ্ছি। বেশ কিছুদূর যাবার পর দেখতে পাবে একটি পুকুর আর তার পাশে বাবলা গাছ। তুমি তোমার সমস্ত শিষ্যদের নিয়ে এখান থেকে ওখানে চলে যাও।'

এ-কথা শুনেই গুরু ভালুক চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কী যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় ধমক দিয়ে মূর্তির পেছন থেকে খড়গবর্মা বসে অন্যরকম গলা করে এক-একটা শব্দ থেমে থেমে বলল, 'ওরে পাষণ্ড, তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস? এক্ষুনি চলে যা, শিষ্যদের নিয়ে যেতে ভুলবি না।'

গুরু ভালুক হতভম্ব হয়ে দেবীর সামনে আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। ওকে বেরিয়ে আসতে দেখেই জীবদত্ত ও তার সঙ্গের অন্য লোকগুলো লুকিয়ে পড়ল।

গুরু ভালুকের মনে, দেবীর কথা শোনার পর, পূর্ণ বিশ্বাস এবং শক্তি যেন ফিরে এল। তার মনে আর কোনো দ্বিধা নেই। নিজের পঞ্চশূল উঁচিয়ে চিৎকার করে বলল, 'হে বৃকেশ্বরী দেবীর ভক্তগণ, তোমরা সবাই এই মুহূর্তে এই সুড়ঙ্গ ছেড়ে দূরে যাবার জন্য রওনা হয়ে যাও। দেবীর নির্দেশমতো আমাদের এখান থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যেতে হবে বনে।'

নেকড়েদের ভয়ে যারা এতক্ষণ এদিকে-ওদিকে লুকিয়েছিল তারা সব সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে গেল হুড়মুড় করে। নেকড়েগুলো দুর্গের ভিতরে ঘুরতে ঘুরতে আপন মনে যেখানে-সেখানে ঢুকে খুঁজে দেখতে লাগল কোনো খাদ্য আছে কি না আর খাদ্য না পেয়ে গর্জন করতে লাগল।

গুরু ভালুক সুড়ঙ্গের চারদিকে তাকিয়ে তার শিষ্যদের খুঁজতে লাগল। কিন্তু তাদের দেখা তো দূরের কথা সাড়াও পেল না। তারপর একাকী সুড়ঙ্গ থেকে বনের দিকে এগিয়ে গেল।

গুরু ভালুক সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসে দেখে শিষ্যরা তার অনেক আগেই বনের ভেতরে চলে গেছে।

বৃকেশ্বরী দেবীর কথা শোনার পর গুরু ভালুকের মনে এক চিন্তা এক পরিকল্পনা। কী করে বনে যাওয়া যায়! তার লোকজন সব কোথায়? ওরা লুকিয়ে আছে কেন? নেকড়েদের খাবার ঠিকমতো দেওয়া হয়েছে কি না? নেকড়েদের নিয়ে কি বনে যাবে? একবারও খড়গবর্মা, জীবদত্ত, সমরবাহু ও চন্দুর কথা তার মনে উঁকি মারল না। সে ভাবতেই পারল না যে ওরা তার কোনো ক্ষতি করতে পারে।

গুরু ভালুকের সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত খুঁজে খুঁজে নেকড়েদের তাড়া করে বের করে দিল সুড়ঙ্গ থেকে। একটা নেকড়ে ওদের দিকে তেড়ে এসেছিল কিন্তু পরমুহূর্তেই তাকে মারা পড়তে হল। নেকড়েগুলো বেরিয়ে এসেই দেখতে পেল সামনে গুরু ভালুককে। ক্ষুধার্ত নেকড়েগুলো গুরু ভালুককে ধরে টেনে ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য ধাওয়া করতে লাগল।

নেকড়েদের এই হিংস্ররূপ দেখে প্রাণের ভয়ে গুরু ভালুক ছুটতে ছুটতে আর্তনাদ করতে লাগল, 'হে বৃকেশ্বরী দেবী, আমাকে বাঁচাও!'

ষোলো

গুরু ভালুকের আর্তনাদ ও নেকড়েদের গর্জন শুনে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত, সমরবাহু ও চন্দু তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল। ওরা সামনেই দেখতে পেল ভালুক জাতের কয়েক জন লোক বনের দিকে ছুটছে। তার পেছনে ছুটছে গুরু ভালুক। আর সবার শেষে ছুটছে নেকড়ে।

খড়গবর্মা এই দৃশ্য দেখে বলল, 'একটা ব্যাপার আমার খুব আশ্চর্য লাগছে। বৃকেশ্বরী দেবীর এত ভক্ত গোটা কয়েক নেকড়ের ভয়ে এভাবে ছুটে পালাচ্ছে।'

তোমার আশ্চর্য লাগুক অথবা হাসি পাক, ওদের যখন নেকড়েগুলো ছিঁড়ে খাবে তখন সেই দৃশ্য দেখা আমাদের বোধ হয় উচিত হবে না। মানুষকে জন্তু ছিঁড়ে খাবে এই দৃশ্য মানুষ হিসেবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা যায় না। আমার কাছে এ অসহ্য। তুমি বরং এক কাজ করো। ওই নেকড়েদের তাড়িয়ে দাও।' জীবদত্ত বলল।

জীবদত্তের কথা শুনে খড়গবর্মা কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে তির দিয়ে সকলের পেছনে যে নেকড়েটা ছিল তাকে বিদ্ধ করল। তির বিদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ নেকড়েটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে অন্য নেকড়েগুলো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভয়ংকর দেখাচ্ছিল নেকড়ের মাংস নেকড়েদের টেনে ছিঁড়ে খাওয়ার সেই দৃশ্য।

খড়গবর্মা নেকড়েদের দিকে তাক করে আর একটা তির ছুড়তে যাবে এমন সময় সমরবাহু বাধা দিয়ে বলল, 'হুজুর, কেন ওই নেকড়েগুলোকে মারছেন? কাঁটা দিয়ে কাঁটা

তোলার খেলাটা তো বেশ জমে উঠেছে, চলুক না। আপনি ওদের মেরে ফেললে গুরু ভালুক আর তার দলের লোককে খাবে কে?'

'সমরবাহু, গুরু ভালুক আর তার দলের লোক মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি সব বিপদ কেটে যেত তাহলে আর কথা ছিল না। আমরা এক মহান উদ্দেশ্যে বিন্ধ্যাচলের দিকে যাচ্ছি। পথে আমাদের একটা-না-একটা বাধা পড়ছে। কোনো বাধাই না সরিয়ে আমরা যেতে পারছি না।' জীবদত্ত বলল।

তারপর খড়গবর্মার দিকে ঘুরে জীবদত্ত বলল, 'এখান থেকে আমাদের তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া উচিত। গুরু ভালুকের ব্যাপারে আমাদের আর কিছু করার নেই। তবে ওকে একটা শেষ কথা বলে দেওয়া উচিত।' এই কথা বলে জীবদত্ত গুরু ভালুকের দিকে ছুটে গেল। তাকে অনুসরণ করল অন্যেরা।

জীবদত্তকে আসতে দেখে তিনটে নেকড়ে গর্জন করতে করতে বনের ভিতরে ঢুকে গেল।

তারপর গুরু ভালুকের কাছে যেতে যেতে জীবদত্ত গম্ভীর গলায় জোরে জোরে বলল, 'ওহে গুরু ভালুক, নাক-কান বুজে ছুটছ কেন? দাঁড়াও, আর তোমার কোনো ভয় নেই।' নিরুপায় হয়ে কাঠের মতো গুরু ভালুক দাঁড়িয়ে পড়ল।

গুরু ভালুক পরিষ্কার বুঝতে পারল যে শত্রুর খপ্পরে সে পড়ে গেছে। তার তখন আর শত চেষ্টা করেও পালানোর কোনো পথ নেই। জীবদত্ত ও তার সঙ্গে যারা ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে গুরু ভালুক বলল, 'মহাশয়, আমাকে প্রাণে মারবেন না। আমি যে পাপ করেছি তারজন্য আপনারা আমাকে যে শাস্তি দেবেন আমি মাথা পেতে তা মেনে নেব।'

'তুমি এমন একটা শাস্তির কথা বল তো, যাতে তোমার সমস্ত পাপ ধুয়ে-মুছে যায়? বল, এমন কোনো শাস্তি আছে যা তোমাকে দিলে তোমার হাতে যত লোক মারা গেছে প্রত্যেকে বেঁচে উঠবে। তুমি তো ইচ্ছে করলেই এই বনে মাটি খুঁড়ে গায়ে গতরে খেটে চাষ-আবাদ করে, ফসল ফলিয়ে তোমার অনুচরদের নিয়ে ভালোভাবেই দিন কাটাতে পারতে। ওসব না করে কোন এক বৃকেশ্বরী দেবীকে পুজো করার নামে কতগুলো লোককে প্রাণে মারলে বল দেখি? আমাদের আসার আগে কত নিষ্পাপ শিশু, নারী আর পুরুষ তোমার হাতে অকালে প্রাণ দিয়েছে বল তো!' জীবদত্ত বলল।

'আমি বসে বসে খেতে চেয়েছিলাম। আমি কোনোদিন পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলিয়ে খেতে চাইনি। আপনারা যতদিন না এখানে এসেছেন আমি আমার ইচ্ছেমতো চলতে পেরেছি। কেউ কোনো বাধা দেয়নি। ভেবেছিলাম ওইভাবেই সারাজীবন

কেটে যাবে, কেউ আমার চলার পথে বাধা দেবে না। খুব আরামেই ছিলাম।' গুরু ভালুক বলল।

'তা তো বুঝতেই পারছি। তা এখন কী করবে ঠিক করেছ? তোমার অনুচররা তো তোমাকে নেকড়েদের কাছে ফেলে পালিয়েছে! একা কী করবে?' খড়্গবর্মা প্রশ্ন করল।

'মশাই, আমার কোনো অনুচর আমাকে ছেড়ে যায়নি। ওরা সব একটা পুকুরঘাটে জড়ো হয়েছে। সেখানে দেবী বৃকেশ্বরীর আবির্ভাব ঘটবে। দেবী এখন আর সুড়ঙ্গে নেই। দেব-দেবীরা কখনো এক জায়গায় চিরকাল থাকেন না। আপনাদের আগমনের ফলে আমাদের সুড়ঙ্গ অপবিত্র হয়ে গেছে তাই দেবী পুকুরঘাটে চলে গেছেন।' গুরু ভালুক বলল।

'ঠিক আছে, চল সেখানে। আমি তোমার দেবীকেই জিজ্ঞাসা করব, তোমাকে কোনো শাস্তি দিতে চায়!' জীবদত্ত গম্ভীর স্বরে বলল।

ওরা কিছুদূর এগোতে না এগোতেই ভালুক দলের অনুচরদের ভয়ংকর আর্তনাদ শুনতে পেল।

ওরা চোখের সামনে দেখতে পেল ওদের গুরুকে খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের সঙ্গে। ওরা বুঝতে পারল ওদের গুরু শত্রুর কবলে পড়ে গেছে। বুঝেই ওরা অন্যদিকে পালাতে লাগল। তখন গুরু ভালুক চিৎকার করে বলল, 'তোমরা পালিয়ো না। বৃকেশ্বরী দেবীর দয়ায় আমাদের আর কোনো ভয় নেই।'

গুরুর কণ্ঠে অভয় বাণী শুনে ওরা কয়েক জন ভয়ে ভয়ে গুরুর কাছে এল। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'গুরু, ওই পুকুরের কাছে চার-পাঁচ জন রয়েছে। ওদের নেতা স্বর্ণাচারি। স্বর্ণাচারি আমাদের দু-জনকে মেরে ফেলেছে। আর পাঁচ জনকে বন্দি করে রেখেছে। আমরা কোনোরকমে পালিয়ে এসেছি। খবরটা আপনাকে দেবার জন্যই ছুটে ছুটে এসেছি।'

স্বর্ণাচারির নাম শুনে জীবদত্ত, খড়্গবর্মা ও সমরবাহু অবাক হয়ে গেল। ওরা ভেবে পেল না দুর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা করার দায়িত্ব যার উপর চাপানো আছে সে কেন চার-পাঁচ জন লোক নিয়ে পুকুরঘাটে এল!

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত স্বর্ণাচারিকে কথা দিয়েছিল শত্রুর কবল থেকে সমরবাহুকে মুক্ত করে আনবে। ওদের আসার কারণ আছে। খড়্গবর্মা ও জীবদত্তর অনুপস্থিতিতে ওরা আক্রান্ত হয়েছিল। কারণ সেই অঞ্চলটা ছিল বীরসিংহ নামক এক রাজার। বীরসিংহের রাজধানী বীরপুর। আর সেই বীরপুরেই একটি বনে পাহাড়ের পাশে স্বর্ণাচারি পরিকল্পনা করছিল দুর্গ তৈরি করার। সেখানকার আদিবাসীদের উপর মাঝে মাঝেই আক্রমণ চালিয়ে বীরসিংহ তাদের কাছ থেকে করস্বরূপ জন্তুজানোয়ারের চামড়া, মোটা চাল, তরিতরকারি

প্রভৃতি নানাপ্রকার জিনিসপত্র আদায় করে নিয়ে যেত। এইভাবে নানান দিকে আক্রমণ করে রাজা বীরসিংহ তার কোষাগার সোনা, রুপা, ফসল প্রভৃতি দিয়ে বৃদ্ধি করত।

গুপ্তচরদের মাধ্যমে বীরসিংহ জানতে পারল যে বনের মধ্যে পাহাড়ের পাশে উটে চড়ে একদল লোক এসেছে। আরও জানতে পারল যে ভালুক চামড়া পরা একদল লোক ওই অঞ্চলে ঘোরাফেরা করে। যুবকদের ধরে নিয়ে গিয়ে গোলাম বানায়। আর তাদের দিয়ে চাষ-আবাদের কাজ করিয়ে নেয়। ওদের দলে বেশ কয়েক জন লোক আছে।

বীরসিংহ প্রথমে গুপ্তচরদের এইসব কথায় কান দেয়নি। সে মনে মনে ভেবে নিয়েছিল উটে চড়া লোকদের বিরুদ্ধে ভালুক চামড়া পরা লোকগুলো যুদ্ধ করবে। এইভাবে দুটো দলই একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যাবে। আর যদি তা না হয়ে একটি দল পরাজিত হয়ে অন্যদল শক্তিশালী হয়ে যায় তখন অন্য পরিকল্পনা করে ওই শক্তিশালী দলকে পরাস্ত করা যাবে। অথবা তখন এমন কিছু করা যাবে যাতে ওই দল প্রাণের ভয়ে এই অঞ্চল ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে। এই বনে এসে কোনো নতুন দলের পক্ষেই সব পথ চিনে যুদ্ধ করে জয়ী হওয়া সহজ নয়। তার চেয়ে পালানো অনেক সহজ। অতএব সেরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তখন দেখে নেওয়া যাবে।

এদিকে এক সপ্তাহ আগে রাজা বীরসিংহ লোকজন সহ নতুন জন্তুজানোয়ার শিকার করার জন্য ওই বনে এসেছিল। ওরা জাল পেতে শিকার ধরার সবরকম আয়োজন করে শিকারের জন্য অপেক্ষা করছিল। যথাসময়ে তাদের জালে শিকার ধরা পড়ল। বহু বুনো পাখি ও বাঘ ধরা পড়ল। মনের আনন্দে ওরা ওই বনে রান্না সেরে খেতে বসেছিল।

বীরসিংহের সেনাদের মধ্যে একজন তাড়াতাড়ি খেয়ে বনে ঘুরে ঘুরে চারদিকে নজর রাখছিল। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে লোকটা সেখান থেকে অনেক দূরে চলে গেল। হঠাৎ এক জায়গায় সে দেখতে পেল কিছুটা দূরে একটা মোটা গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে চারটে উট বাঁধা রয়েছে। লোকটা উটদের আকার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিল। কিন্তু কোনোদিন নিজের চোখে সে দেখেনি। তাই দেখেই চিনতে পেরেছিল। আর কালমাত্র বিলম্ব না করে সে ফিরে গেল বীরসিংহের কাছে।

'উট? আমাদের রাজ্যে তো উট নেই? কোত্থেকে এল? কারা আনল?' এসব কথা ভাবতে ভাবতে সে ভয়ে কাঁপছিল।

খবর পেয়ে শিকারিদের মধ্যে যে নেতা সে খুব উৎসাহিত হয়ে বলল, 'কোথায়? কোথায় আছে উট? চল— চল, ধরে আনি।'

কিন্তু সেই সেনাটি নিরুৎসাহিত হয়ে বলল, 'আরে মশাই, অত হাঁকপাঁক করছেন কেন? এই চারটে উট কখনো কি একা একা আসতে পারে বনে? নিশ্চয়ই তার সঙ্গে কিছু লোক

আছে।'

'তাতে আমদের কি এসে যায়! থাক না লোক! এই বীরপুর রাজ্যের প্রজা, মাটি, বন-জঙ্গল, জল, আকাশ সব কিছুর উপর পুরো অধিকার আছে আমাদের মহারাজ বীরসিংহের। তোমরা তিন-চার জন গিয়ে ওই উটগুলো ধরে নিয়ে এসো। ওই উটের সঙ্গে কোনো লোকজন যদি থাকে তাদের বল এখানে এসে দেখা করে যেতে।' প্রধান শিকারি বলল।

ওরা ভয় পেল, কিন্তু নিরুপায়। প্রধান শিকারি যখন বলছে, যেতেই হবে। শেষপর্যন্ত চার জন সৈনিক বেরিয়ে পড়ল। উটগুলো আগে যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। আশেপাশে কোনো লোকজন নেই। চার জন সৈনিক সোজা গিয়ে উটগুলোর দড়ি খুলে টান দিতেই একটি উট পিছনের পা টান করে হিঁ হিঁ করে ডেকে উঠল। তার ডাক শুনে অন্য উটগুলোও ডাকতে শুরু করে দিল।

সমরবাহুর লোক উটগুলোকে গাছের সঙ্গে বেঁধে অদূরে প্রকাণ্ড একটা পুকুরের ঘাটে একটা গাছের নীচে বসে বিশ্রাম করছিল। হঠাৎ উটের ডাক শুনে ওরা ভাবল বাঘ কিংবা সিংহ হয়তো উটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে! ওরা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে খোলা তরবারি হাতে নিয়ে ছুটে এল উটের কাছে।

উটগুলোকে যারা নিয়ে যেতে এসেছিল তারা সমরবাহুর লোককে খোলা তরবারি নিয়ে ছুটে আসতে দেখে নিজেরাও খাপ থেকে তরবারি বের করল।

সমরবাহুর লোকের মধ্যে একজন দাঁতে দাঁত ঘষে চিৎকার করে বলল, 'কারা তোমরা? পরেছ তো সৈনিকের পোশাক! কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে তোমরা চোর! আমাদের উট চুরি করতে এসেছ কেন?'

'আমরা চোর নই। মহারাজা বীরসিংহের সৈনিক। তোমরা কেন আমাদের মহারাজাকে কর না দিয়ে উটগুলো নিয়ে এই বনে এসেছ? আমাদের উপর হুকুম হয়েছে উটগুলো নিয়ে যেতে।' একজন সৈনিক বলল।

'এখানে আবার বীরসিংহ নামে কেউ আছে নাকি? আমরা তো জানি এই বনটা আমাদের মহারাজা সমরবাহুর। তোমরা আমাদের উটগুলো চুরি করতে এসেছ। এইজন্য তোমাদের আমরা কঠোর শাস্তি দেব। তোমরা এক্ষুনি তরবারি মাটিতে ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ কর।' সমরবাহুর একজন অনুচর বলল।

পালানোর পথ নেই ভেবেও বীরসিংহের চার জন সৈনিক তরবারি হাতে সমরবাহুর অনুচরদের সামনে রুখে দাঁড়াল। সেই তরবারি যুদ্ধে বীরসিংহের দু-জন সৈনিক মারা

গেল। একজন ভীষণভাবে আঘাত পেল। আর চতুর্থজন প্রাণ মুঠো করে পালিয়ে গেল। সোজা শিকারিদের প্রধানকে গিয়ে খবর দিল।

'এ তো তাজ্জব কথা। উট কোনোদিন মাংস খায় বলে তো আমি জানি না? তোমার সঙ্গে বাকি যে তিন জন গিয়েছিল ওদের কি উট খেয়ে ফেলেছে?' প্রধান শিকারি ক্রোধের সঙ্গে সৈনিককে জিজ্ঞেস করল।

'আরে মশাই, উট আমাদের ঘায়েল করেনি। উট যারা এনেছে, ওরাই আমাদের লোককে মেরে ফেলেছে, ঘায়েল করেছে। তরবারি চালাতে ওরা খুব দক্ষ মনে হল।' সৈনিক বলল।

'আমি বিশ্বাস করি না যে তরবারি চালানোর ব্যাপারে আমাদের চেয়ে যোগ্য লোক আছে।' এ-কথা বলে হাতে খাপ খোলা তরবারি নিয়ে এগিয়ে গেল প্রধান শিকারি। তার সঙ্গে গেল বাকি সৈনিক।

আঘাত পেয়ে পালিয়ে আসা সৈনিক ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। হঠাৎ আর্তনাদ করে বলল, 'এই যে ওরা এদিকেই আসছে। ওরা যে কী ভয়ানক, এক্ষুনি টের পাবেন।'

শিকারি প্রধান নিজের সৈনিকদের সাবধান করে সমরবাহুর লোকের দিকে এগিয়ে গেল।

সতেরো

বীরপুর রাজার প্রধান শিকারির সঙ্গে আর মাত্র সাত জন সৈনিক রয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন সমরবাহুর অনুচরদের আঘাতে ঘায়েল হয়ে টলতে টলতে সবার পিছনে পড়ে গিয়েছিল। সমরবাহুর অনুচরদের মধ্যে মাত্র চার জন সেখানে ছিল। কিন্তু চার জন হলেও ওরা ওই সাত জনের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করছিল।

প্রধান শিকারি সমরবাহুর লোকজনকে চিৎকার করে বলল, 'ওহে তোমাদের দেখে তো মনে হচ্ছে তোমরা ব্যবসায়ী। তবে তোমাদের পাগড়ির বাঁধনটা কেমন যেন বেখাপ্পা।

এইভাবে পাগড়ি কেউ বাঁধে নাকি? জংলিদের মতো। তরবারি চালানোর কায়দাকানুনও তোমরা বোধ হয় ঠিক জান না।'

সমরবাহুর অনুচরদের ভীষণ রাগ হল। ওরাও গর্জে উঠল, 'আমাদের তরবারির আঘাতের মজা ইতিমধ্যে তোমাদের তিন জন সৈনিক পেয়েছে। ওরা মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমরাও তরবারির আঘাত পাবে। এবার সাবধান হও। জয় সমরবাহুর জয়!' ধ্বনি দিতে দিতে ওরা বীরসিংহের সৈনিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কিন্তু ওদের মধ্যে যুদ্ধ বেশিক্ষণ চলল না। বীরসিংহের সৈনিকদের মধ্যে তিন জন ইতিপূর্বেই সমরবাহুর লোকদের তরবারির আঘাতে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যে আসছিল সে সমরবাহুর লোকজনের রণধ্বনি শুনে মুখ ফিরিয়ে পালানোর চেষ্টা করল। প্রধান শিকারি নিজেই পালানোর পথ খুঁজতে লাগল। ওদের আত্মসমর্পণের ভঙ্গি দেখে সমরবাহুর লোকেরা খুশি হল।

এই সামান্য পাঁচ-সাত জনকে পরাজিত করে সমরবাহুর লোক এত আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল যেন ওরা এক বিরাট রাজ্য জয় করে এসেছে। ওরা পরাজিতদের এবং নিজেদের তরবারি উপরের দিকে তুলে উচ্ছ্বসিত আনন্দে চিৎকার করে 'মহারাজা সমরবাহুর জয়' ধ্বনি দিতে লাগল।

ওদের এই সোচ্চার ধ্বনিতে ওই বনের ডালপালা ও পাতা যেন মুখরিত হয়ে উঠেছে। ধ্বনি যত বাড়ে বীরসিংহের সেনাদের মনে ভয়ও তত বাড়ে।

সমরবাহুর লোকজনের সঙ্গে বীরসিংহের সেনাদের যুদ্ধ দেখার জন্য ওই বনের কয়েক জন অধিবাসী জড়ো হল। সমরবাহুর লোকের রণধ্বনি শুনে আরও কয়েক জন বনের অধিবাসী জড়ো হল। ওরা অবাক হয়ে দেখল বীরসিংহের সেনাদের পরাজিত হতে। ওরা দেখল কীভাবে বীরসিংহের সেনারা তরবারি মাটিতে ফেলে আত্মসমর্পণ করল। নিজেদের রাজার সেনাদের মাটিতে গড়াগড়ি খেতেও ওরা দেখল। এইসব দেখে ওরা বুঝল যে সমরবাহুর লোক অনেক বেশি ক্ষমতাবান। যুদ্ধ করার কৌশলও ওদের অনেক ভালো।

ওরা রাজা বীরসিংহের সেনাদের চেনে। কিন্তু তাদের যারা হারিয়ে দিল তারা যে কোন রাজার সেনা তা তারা জানে না। ভেবেছিল আরও বড়ো কোনো রাজার সেনা। তা না হলে এতটা ক্ষমতা ওরা পায় কোত্থেকে। ওদের ধারণা বেশি ক্ষমতাবান রাজাদের সেনার ক্ষমতাও বেশি থাকে। ওদের সামনে হাতের তরবারি ফেলে দিয়ে করুণভাবে বীরসিংহের সেনাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখ ওদের কেমন যেন লাগল। তারপর বনের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে ওই নতুন অচেনা ক্ষমতাবান রাজা সম্পর্কে নানা কথা বলাবলি করছিল।

বনের অধিবাসীদের বিস্ময় লক্ষ করে সমরবাহুর লোক গুরুগম্ভীর গলায় বলল, 'তোমরা এই বনের অধিবাসী? আজ থেকে তোমরা বীরপুরের রাজাকে কানাকড়িও কর দেবে না। এই বনের অধিবাসী হলেন আমাদের রাজা সমরবাহু। কর যা দিতে হবে রাজা সমরবাহুকে দিও। উনিই তোমাদের রক্ষা করবেন। আমাদের কথামতো না চললে তোমাদের বাঁচার পথ থাকবে না। কঠোর শাস্তি পেতে হবে বুঝেছ?'

বনের অধিবাসীদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এসে বলল, 'আজ্ঞে আপনারা যা বলবেন তাই করব। তবে আমরা বীরপুরের রাজা বীরসিংহকে দেখেছি। আপনারা রাগ করবেন না। দয়া করে আপনারা আপনাদের পরিচয় দিন। আপনারা কোন দেশের রাজার লোক জানান। আপনাদের রাজা কোথাকার রাজা?' ভয়ে ভয়ে বৃদ্ধটি এক এক করে প্রশ্নগুলো করল।

সমরবাহুর অনুচরদের মধ্যে একজন দূরের এক পাহাড়ের দিকে তর্জনী দেখিয়ে বলল, 'দেখ ওই পাহাড়ের দিকে তাকাও। ওই যে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে পাহাড়টা। ওই পাহাড়ে রয়েছে আমাদের রাজধানী। তোমাদের মধ্যে কারও যদি সন্দেহ থাকে সে আমাদের সঙ্গে আসতে পারে। নিজের চোখে দেখে আসতে পারে। পথঘাট চিনে রাখা ভালো। সব দেখে সবাইকে জানিয়ে দাও।'

ওই বুড়ো কী যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় ঘোড়ার ডাক শোনা গেল। সমরবাহুর লোক চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকাল। ওদের মধ্যে একজন বলল, 'মনে আছে বীরসিংহের দলের দু-জন ছুটে পালিয়েছিল? ওদের ওভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি। ওরাই আবার এখন ঘোড়া নিয়ে হয়তো এসেছে। ঘোড়া যখন এনেছে নিশ্চয়ই আরও কয়েক জন লোকও এনেছে। এখন সবাই সাবধান হয়ে যাও। সতর্ক থেকো। কেউ যেন পালাতে না পারে। সমরবাহুর চার জনই অজানা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হল। সুযোগ পেলেই আক্রমণ করবে। তা না হলে আত্মরক্ষা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। দুটো ঘোড়ার লাগাম ধরে দু-জন লোক তাদের কাছে এল। ওই দু-জনকে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল।

সমরবাহুর লোক ভেবে পাচ্ছে না কী বলবে, কী করবে! ততক্ষণে ওই বৃদ্ধ এগিয়ে গিয়ে ওদের জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? তোমরা এই ঘোড়াগুলো কোত্থেকে ধরে আনলে?'

'বীরপুরের রাজা বীরসিংহের সৈনিকরা ঘোড়ায় চড়ে পালাচ্ছিল। হঠাৎ ওরা একটা গাছের কাছে থেমে ওই গাছের সাথে বাঁধা ঘোড়া দুটোর দড়ি কেটে দিল। আমরা আড়াল থেকে এসব লক্ষ করেছিলাম। দড়ি কেটে ওরা আবার নিজেদের ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল।

আমরা কায়দা করে ঘোড়া দুটোকে ধরে এনেছি। ঘোড়াগুলোকে যারা এনেছিল তারা বলল।

'তোমরা খুব ভালো কাজ করেছ। আমরা আমাদের রাজাকে এই খবর জানাব। তিনি তোমাদের এই বুদ্ধির জন্য অনেক উপহার দেবেন। এই ঘোড়া দুটো নিয়ে চল আমাদের রাজধানীতে। ওই যে পাহাড় দেখতে পাচ্ছ ওই পাহাড়ের বুকেই আমাদের রাজধানী। কি যাবে?' সমরবাহুর একজন অনুচর বলল।

বনবাসী যুবকরা রাজি হল। সমরবাহুর অনুচর বীরসিংহের দুই পরাজিত সৈনিককে নিয়ে এগিয়ে যাবে এমন সময় ওই বনবাসীদের একজন যুবক বলল, 'এই যে কর্তারা পিঞ্জরায় বন্দি বাঘ ও সিংহকে নিয়ে যাচ্ছেন না? কয়েকটা পাখিকে জালে বেঁধে গাছে ঝোলানো আছে। ওদের কি ওখানেই রাখা হবে? নিয়ে যাবেন না?'

এই কথা কানে যেতেই সমরবাহুর লোকেরা তৎক্ষণাৎ থেমে বীরসিংহের বন্দি সেনাদের কাছে সিংহ, বাঘ ও পাখিদের ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে জানতে চাইল। নানা প্রশ্ন করে সৈনিকদের কাছে জানতে পারল যে প্রধান শিকারির নেতৃত্বে ওই পাখিগুলোকে ধরা হয়েছে। কীভাবে ওরা ওই পাখিগুলোকে ধরেছে সে বিষয়েও অনেক কিছু জানতে পারল সমরবাহুর অনুচরগণ।

সব কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে সমরবাহুর লোক চোখ উজ্জ্বল করে বলল, 'বাঃ, তোমাদের বুদ্ধির তো তারিফ করতে হয়! এসব পশুপাখিদের এখানে ফেলে রেখে লাভ কী? নিয়ে যাওয়া যাক আমাদের রাজধানীতে। সেখানেই ওরা খেয়ে বাঁচতে পারবে।'

সমরবাহুর অনুচরদের পেছনে পেছনে ওই বনের বহু অধিবাসী যেতে লাগল। যাওয়ার পথ বাঘ সিংহের গর্জনে ও পাখির ডাকে মুখরিত হয়ে উঠল। সমস্ত অঞ্চলে বিরাট কিছু ঘটে যাওয়ার আবহাওয়া।

সমরবাহুর অনুচররা সমস্ত ব্যাপার লক্ষ করে বলল, 'আমরা কোনোদিন হিংস্র জন্তুজানোয়ারদের ধরিনি, বন্দি করে রাখিনি পিঞ্জরায়। তাই এদের ভালোভাবে নিয়ে যাওয়ার ভার তোমাদের।'

বনের অধিবাসীদের মধ্যে কয়েক জনের মনে সমরবাহুর লোকদের দেখে আগেই সন্দেহ হয়েছিল। ওরা ভেবেছিল ওরা বিদেশি। কারণ ওরা কোনোদিন উট দেখেনি। উটের পিঠে ওদের দেখে এই সন্দেহ ওদের হয়েছিল। হিংস্র পশুদের সম্পর্কে সমরবাহুর লোকদের কথা শুনে একজন বৃদ্ধ বনবাসী এগিয়ে এসে বলল, 'হুজুর প্রত্যেকটা পিঞ্জরার নীচে চাকা লাগানো আছে। খুব সাবধানে ঘোড়াদের দিয়ে টানিয়ে নিয়ে গেলে কোনো অসুবিধা হবে না। তারপর একটা বাগানের চারদিকে উঁচু দেওয়াল তুলে তার ভিতরে এই বাঘ, সিংহ প্রভৃতিকে রাখা যায়।'

'এইসব কাজের ব্যাপারে আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আমাদের রাজা তোমাদের অনেক কিছু দিয়ে খুশি করবেন।' বলল সমরবাহুর একজন লোক।

বনবাসী সিংহ ও বাঘের পিঞ্জরাকে দড়ি দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে উটের সঙ্গে দড়ির অন্যপ্রান্ত বেঁধে দিল। অন্য উটের পিঠে পাখিদের জাল গুটিয়ে রেখে দিল। তারপর সবাই মিলে ওই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

পাহাড়ের উপর থেকে স্বর্ণাচারি হঠাৎ দেখতে পেল, বাঘ, সিংহ, পাখি নিয়ে সমরবাহুর অনুচর এবং বহু বনবাসী ওই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসছে। ওসব দেখে স্বর্ণাচারি বলে উঠল, 'আরে একি দেখছি? আমাদের লোক ঘোড়ায় চড়ে আসছে! পিঞ্জরা কোত্থেকে পেল! বনের অতগুলো লোক এদিকে আসছে কেন? কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।'

স্বর্ণাচারির কথা শুনে সমরবাহুর লোকজন, যারা স্বর্ণাচারির কাছে ছিল তারা অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। ওদের ওইভাবে চোখ ছানাবড়া করে তাকানো দেখে সমরবাহুর যে অনুচররা আসছিল, তাদের একজন বলল, 'দেখছ, মহামন্ত্রী স্বর্ণাচারি মশাই ও আমাদের লোকজন কীভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে? আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ওদের সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে দি।' বলে ঘোড়া থেকে একজন অনুচর লাফ দিয়ে নেমে লাফাতে লাফাতে পাহাড়ের উপরে উঠে স্বর্ণাচারির কাছে গেল।

তাকে ছুটতে ছুটতে লাফাতে লাফাতে আসতে দেখে স্বর্ণাচারি এগিয়ে এসে তাকে বলল, 'কী ব্যাপার বলত? তোমরা তো শিকার করতে গিয়েছিলে। এত ঘোড়া, বাঘ এসব

কী এনেছ? এত বনবাসী তোমাদের সাথে আসছে কেন?'

সমরবাহুর ওই লোকটা স্বর্ণাচারির কাছে এসে প্রণাম করে বলল, 'মহামন্ত্রী, আমরা শিকার করতে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু অত সহজে শিকার করতে পারিনি। বীরপুর রাজার সৈনিকরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমরা পালটা আক্রমণ করে তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছি। ওদের দু-জনকে এনেছি। বাকিদের মধ্যে দু-জন বীরপুরের দিকে পালিয়েছে। আর অন্যেরা আমাদের তরবারির আঘাতে মারা গেছে।'

বীরপুরের দু-জন সৈনিকের পালানোর কথা শুনেই স্বর্ণাচারির চোখে-মুখে আশঙ্কা ও আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল। এত বড়ো বিজয়ের খবর শুনেও স্বর্ণাচারির মুখে কোনো আনন্দের চিহ্ন ছিল না। তার মনে হল সমরবাহুর লোকেরা ভবিষ্যৎ না ভেবেই মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি নিয়েছে।

স্বর্ণাচারি রক্তচক্ষু করে সমরবাহুর ওই অনুচরকে বলল, 'তোমরা ওই দু-জন সৈনিককে পালাতে দিয়ে মারাত্মক ভুল করেছ। এর পর প্রস্তুত হও, বিরাট এক বিপদের মোকাবিলা করতে হবে। তা ছাড়া তোমরা এসব ঘোড়া আনতে গেলে কেন? আর তার চেয়ে বড়ো কথা বীরপুর রাজার সেনাদের বিরুদ্ধে ওরকম একটা মারাত্মক কাণ্ড করে বসলে কেন?'

স্বর্ণাচারির কথা শুনে আর তার রক্তচক্ষু দেখে বুঝল যে তারা ভুল করেছে। তবুও নিজেরা কোন অবস্থায় ওই কাজ করতে বাধ্য হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে বলল। তাতে কিছু সত্য কিছু মিথ্যাও ছিল।

স্বর্ণাচারি নিজের আগের কথাকে আরও গুরুগম্ভীর গলায় বলল, 'যাই হোক না কেন, তোমরা যা করেছ ভুল করেছ। আমাদের নিজেদেরই থাকার ভালো একটা ব্যবস্থা এখনও হয়নি। যে দু-জন সৈনিক পালিয়েছে, ওরা বীরপুরের রাজাকে গিয়ে বিস্তারিতভাবে সব বলবে। তারপর রাজা নিজেই সেনা পরিচালনা করে আসবে অথবা অসংখ্য সেনাদের নিয়ে আমাদের এই অঞ্চল আক্রমণ করতে সেনাপতিকে বলবে। তোমাদের বোঝা উচিত ছিল যে সমরবাহু এখন নেই। জীবদত্ত ও খড়গবর্মাও এখানে নেই!'

স্বর্ণাচারির কথা অনুযায়ী একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। স্বর্ণাচারির অনুমান অনুযায়ী ওই দু-জন সেনা বীরপুরে গিয়েছিল। সারা পথে তারা চিৎকার করতে করতে গেল, 'দেশ এখন বিপদের মুখে, কোথাকার এক রাজা আমাদের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছে। সবাই সাবধান।'

ওদের কথা নানাভাবে মুখে মুখে রটতে লাগল, সবাই অজানা এক বিপদের কথা ভাবতে লাগল। নগরবাসী আত্মরক্ষার জন্য তরবরি, বল্লম, কুড়ুল প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হল।

আঠারো

বীরপুর রাজার পশুপালকদের অধিকারী একজন অনুচরকে নিয়ে সারা পথ ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে হুঁশিয়ারি দিতে দিতে রাজধানীর দিকে এগোতে লাগল। ওদের ভয়ার্ত চিৎকার রাজা বীরসিংহ ও তাঁর মন্ত্রীর কানে গেল। রাজা ও মন্ত্রী তখন রাজপ্রাসাদে রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলেন।

রাজা বীরসিংহ তাঁর নিজের লোকের গলা শুনে তাড়াতাড়ি উপর থেকে নীচে পথের দিকে তাকালেন। মন্ত্রীকে ডেকে পশুপাখিদের রক্ষাকারীকে দেখালেন। এই দৃশ্য দেখে রাজা বীরসিংহ মন্ত্রীকে বললেন, 'কী ব্যাপার মহামন্ত্রী? চিড়িয়াখানার অধিকারী এভাবে একজনকে সঙ্গে নিয়ে পাগলের মতো চিৎকার করছে কেন? কী বলছে সে? এত জোরে ঘোড়া ছোটাচ্ছে যেন তাকে বাঘে তাড়া করেছে। শত্রুরা যেন তাকে তাড়া করছে! কী ব্যাপার! কী হল!'

রাজার কথা শুনে মন্ত্রী নীচের দিকে ঝুঁকে তাকাল। মন্ত্রী দেখতে পেল শুধু চিড়িয়াখানার অধিকারী ও তার সঙ্গীই ছুটছে না তাদের অবস্থা দেখে অনেক পথচারিও ছোটাছুটি করছে। তখন মন্ত্রী দুর্গের দ্বারপালকে আসল ঘটনা যে কী তা জানার জন্য পাঠাল। ঠিক তখনই চিড়িয়াখানার অধিকারী ও সঙ্গী সেনাটি রাজপ্রাসাদের দ্বারে পৌঁছে গেল। ওরা ঘোড়া থেকে নেমে ভিতরে যেতে চাইল।

প্রাসাদের দ্বারে যে দাঁড়িয়ে ছিল সে কী যেন বলতে গেল এমন সময় চিড়িয়াখানারা অধিকারী তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'কী বলতে চাইছ তুমি? এখন কি আজেবাজে কথা বলার সময় আছে? বাইরের শত্রু দেশের ভিতরে ঢুকে পড়েছে আর এরকম একটা চরম সংকটের সময় তুমি আজেবাজে প্রশ্ন করছ! সর সামনে থেকে!'

'দেশ বিপন্ন! দেশ আক্রান্ত!' বলে চিৎকার করতে করতে চিড়িয়াখানার অধিকারীর সঙ্গে যে সেনা ছিল সে কথার মাঝেই এগিয়ে গেল। ঢুকে গেল প্রাসাদে। মুহূর্তে তার পিঠে বিদ্ধ হল প্রাসাদের দ্বারে দণ্ডায়মান প্রহরীর বল্লম। সেনাটি, 'মহারাজ বীরসিংহের জয় হোক!' বলে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

প্রাসাদের উপর থেকে এই দৃশ্য দেখে রাজা খুশি হয়ে মন্ত্রীকে বললেন, 'দেখলে তো মন্ত্রী, আমার সেনাদের রাজভক্তি কত গভীর। এই ধরনের রাজভক্ত সেনাদের নিয়ে আমি ইচ্ছে করলে অনেক রাজ্য জয় করতে পারি।'

রাজার কথা মন্ত্রীর মনে ধরল না। মন্ত্রী চিড়িয়াখানার অধিকারীর কথা শুনেছিল। সে যে ভীষণভাবে বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় ছোটাছুটি করছিল তাও তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

মন্ত্রী হাত তুলে পাহারাদারকে ডেকে বললেন, 'ওহে, এক কাজ কর। ওকে ঘোড়াসহ অথবা ঘোড়া ছাড়া নিয়ে এসো।'

মন্ত্রীর আদেশে মুহূর্তে চিড়িয়াখানার অধিকারী মহলের ভিতরে ঢুকে গেল। আহত সেনাটিও গেল মহলের ভিতরে।

সেখান থেকে তাদের দু-জনকে মহলের উপরে মন্ত্রী ও রাজার কাছে নিয়ে গেল মহলের পাহারাদার সেনারা। মন্ত্রী তাদের গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা দু-জনে অনেক পুরোনো রাজকর্মচারী, তোমরা কি জানো না প্রাসাদের সামনে ঘোড়া ছুটিয়ে ঢোকা নিষেধ? এই সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি কি তোমাদের লোপ পেয়েছিল?'

মন্ত্রীর প্রশ্ন শুনে চিড়িয়াখানার অধিকারী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'মহামন্ত্রী, ক্ষমা করবেন। দেশ আক্রান্ত হওয়ায় সাধারণ নিয়মকানুনের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। উদবেগের ফলে জ্ঞানবুদ্ধি কিছুক্ষণের জন্য লোপ পেয়েছিল।'

ওর কথা শুনে রাজা বীরসিংহ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বীরপুর রাজ্যের উপর আক্রমণ করতে আসছে? কারা? কখন? রাজা বীরসিংহ অধিকারীকে প্রশ্ন করতে যাবেন এমন সময় মন্ত্রী গর্জে উঠে বলল, 'কী বললে? দেশ আক্রান্ত হয়েছে? কে আক্রমণ করেছে? কারা আসছে আমাদের দেশে? তুমি জানলে কী করে? দেশে কেউ পা রাখলে সীমান্ত সেনার কাছ থেকে প্রথমেই সেনাপতি খবর পেয়ে যায়। সেনাপতির আগে তোমাকে কে খবর দিয়েছে? তুমি থাক নগরে, পশুপাখিদের দেখাশোনার ভার তোমার। তোমার দৌড় চিড়িয়াখানা পর্যন্ত। তুমি সীমান্তের খবর জানলে কী করে? তাড়াতাড়ি আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

চিড়িয়াখানার অধিকারী আরও ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'মহামন্ত্রী ক্ষমা করবেন। আমি চিড়িয়াখানার পশুপাখিদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমাদের রাজ্যের উত্তর প্রান্তের বনে গিয়েছিলাম সেখানে সমরবাহু নামে এক রাজার সেনারা হঠাৎ আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমরা প্রবল পরাক্রমে তাদের পরাস্ত করেছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই উটে চড়ে আরও কয়েক জন লোক এসে আমাদের উপর আক্রমণ করল। আমরা বীরত্বের সঙ্গে তাদেরও মোকাবিলা করলাম। কিন্তু এইবার আমাদের কয়েক জন ওদের প্রচণ্ড আক্রমণের মোকাবিলা করতে গিয়ে আহত হল। আমাদের দু-একজন সেনা মারাও গেল। অবশ্য ওদের লোকও মারা গেছে। এরকম অবস্থায় আমি এই সেনাটিকে নিয়ে খবর দিতে জীবন মুঠোয় করে এসেছি।'

ওর কথা শুনে রাজা ও মন্ত্রী ভয় পেলেন। তাঁদের মনে হল কোনো এক প্রবল প্রতাপান্বিত পরাক্রমশালী রাজা বহু সেনা নিয়ে যেকোনো মুহূর্তে তাঁদের রাজধানী আক্রমণ

করতে পারে। যেকোনো মুহূর্তে তাঁরা শত্রুর কবলে পড়তে পারে।

রাজা ও মন্ত্রী দু-জনের কেউই মুখ খোলেন না। সব চুপচাপ। তাঁদের মুখে কথা সরছে না। অনেকক্ষণ পরে রাজা থেমে থেমে বললেন, 'আমাদের চিড়িয়াখানার অধিকারীর কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাদের দেশের উত্তরপ্রান্তে প্রবল শক্তিশালী কোনো রাজা এসে গেছে। শত্রুর কবলে হয়তো আমাদের উত্তর প্রান্ত আক্রান্ত। অবিলম্বে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। আপনি তাড়াতাড়ি সেনাপতিকে ডেকে পাঠান।'

মন্ত্রী সেনাপতিকে ডেকে পাঠানোর জন্য লোক পাঠিয়ে চিড়িয়াখানার অধিকারীর আপাদমস্তকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কাজ হল পশুপাখিদের ধরা, তাদের লালনপালন করা। তাইতো? কিন্তু উত্তরপ্রান্তে তোমরা যেভাবে যুদ্ধ করেছ বলছ তাতে মনে হচ্ছে তোমরা যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিলে। তোমরা কি কোনো শত্রুর আক্রমণের আশঙ্ক করেই প্রস্তুত হয়ে বেরিয়েছিলে?'

'মহামন্ত্রী, আমাকে বাঘ, সিংহ ধরতে গিয়ে অনেক কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। ওই হিংস্র জানোয়ারদের সঙ্গে একরকম যুদ্ধ করেই জয়ী হতে হয়। কাজেই প্রস্তুতি আমাদের থাকেই। প্রাণের দায়েই রাখতে হয়। তাই এই প্রস্তুতি নিয়ে হঠাৎ আক্রান্ত হলে আমরা শত্রুকে পালটা আক্রমণ না করে কী বা করতে পারি! শত্রুকে আক্রমণ না করার অর্থই তো মৃত্যু।' চিড়িয়াখানার অধিকারী বলল।

তার কথা শুনে মন্ত্রীর মন থেকে যেন সন্দেহের মেঘ কাটল না। মন্ত্রী তাকে কাছে ডেকে একবার ঘুরে দাঁড়াতে বলল। অধিকারী মন্ত্রীর নির্দেশমতো ঘোরার সময় মন্ত্রী দেখছিল তার গায়ে বা কাপড়ে তরবারির আঘাতের কোনো চিহ্ন আছে কি না। কিন্তু তা ছিল না।

মন্ত্রী মাথা নেড়ে একটু কেশে বলল, 'মহারাজ, এর কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাদের দেশের উত্তর প্রান্তে এক দল লোক উটে চড়ে এসেছে। তবে এ যে ধরনের আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ, যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে বলছে তাতে মনে হচ্ছে...'

ওর কথা শেষ হতে-না-হতেই সেনাপতি খাপখোলা তরবারি নিয়ে এসে রাজা ও মন্ত্রীকে নমস্কার করে দাঁড়াল।

মন্ত্রী তার নমস্কার করার পর চিড়িয়াখানার অধিকারীর বক্তব্য পরিবেশন করে, বলল, 'আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে দেশের ভিতরে উত্তর প্রান্ত থেকে কোথাকার কোনো রাজার সেনারা ঢুকে আমাদের লোকের উপর আক্রমণ করল অথচ সেনাপতির কিছুই জানা নেই। আপনি কি সীমান্ত গুপ্তচরদের রাখেননি? আশেপাশের দেশে কি আমাদের গুপ্তচররা ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে? কেন এরকম হল? কেন আপনি জানেন না?'

মন্ত্রীর কথা শুনে সেনাপতি অবাক হল। চিড়িয়াখানার অধিকারীর দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে চিড়িয়াখানার অধিকারী যা বলেছেন তার মধ্যে কিছুটা সত্য থাকতে পারে। তবে যতটুকু বুঝতে পারছি তাতে বেশির ভাগ কথাই তাঁর বানানো। উত্তর প্রান্তে উটের পিঠে চড়ে কিছু লোকের আসার খবর পেয়ে আমি ইতিমধ্যেই গুপ্তচর পাঠিয়েছি। কিন্তু গুপ্তচরদের মধ্যে সবচেয়ে যে বিশ্বাসী ছিল সে বনের অধিবাসী এক সুন্দরী যুবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে তাদের মধ্যে রয়ে গেছে। ফলে উটে চড়ে আসা লোকদের সম্পর্কে সঠিক খবর এখনও আমার কাছে এসে পৌঁছায়নি।'

'এই যে দেরি হচ্ছে এর মধ্যে নিশ্চয় শত্রু নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। পাঠালেন তো পাঠালেন এমন এক অবিবাহিত যুবককে পাঠালেন যে শত্রুপক্ষের মেয়েকেই ভালোবেসে বিয়ে করে ওদের খপ্পরে পড়ে গেল। এবার বুঝলেন তো কোনো অবিবাহিতকে গুপ্তচর বিভাগে রাখা কতখানি ক্ষতিকর।' মন্ত্রী রাগে গুরুগম্ভীর গলায় বলল।

রাজা গোঁফে তা দিয়ে বললেন, 'সেনাপতি আর দেরি করা যে কোনোক্রমেই উচিত নয় তা তো বুঝতে পারছ। শত্রুপক্ষের রাজার নাম যে সমরবাহু তাও জানলে। এরা আরও জানিয়েছে যে ওরা পাহাড়ের উপরে একটা দুর্গও তৈরি করেছে। আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি, তুমি আর কালমাত্র বিলম্ব না করে এক্ষুনি সেনা নিয়ে এগিয়ে যাও। ওদের হত্যা কর। আর ওই সমরবাহুকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে এসো।'

'যে-আজ্ঞে মহারাজ।' এ-কথা বলে সেনাপতি রাজা ও মন্ত্রীকে নমস্কার করে চলে গেল। সেনাপতি এক-শো ঘোড়সওয়ার ও দু-শো পদাতিক সেনা নিয়ে সমরবাহু যেখানে দুর্গ বানাচ্ছিল সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হল।

সমরবাহু যেদিন থেকে ভালুক জাতের লোকের হাতে বন্দি হয়েছিল সেদিন থেকে স্বর্ণাচারিই ছিল সমরবাহুর দলের নেতা। চিড়িয়াখানার অধিকারীর দলের সঙ্গে সমরবাহুর লোকের সংঘর্ষের পরেই স্বর্ণাচারি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দ্রুত দুর্গের কাজ করতে লাগল। স্বর্ণাচারির একটা ব্যাপারে দুর্ভাবনা ছিল। তা হল, সমরবাহুর আসার আগেই যদি দুর্গ আক্রান্ত হয়, সেই দেশের রাজা যদি তাদের ধরে নিয়ে যায় তাহলে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত জানবে যে সে কোথায়? এই চিন্তাই স্বর্ণাচারির মনে গেঁথে রইল।

এসব কথা ভেবেই স্বর্ণাচারি ঠিক করল যেকোনোভাবে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেতে হবে এবং তারজন্য চাই ভালো দুর্গ। দুর্গও যদি আক্রান্ত হয় তাহলে পালানোর জন্য সুড়ঙ্গ তৈরি করল দু-একটা। সমস্ত ব্যবস্থা করে অজানা বিপদের আশঙ্কায় দিন গুনতে লাগল। এত বড়ো কাজ করতে অনেক লোকের দরকার হয়েছে। তাই ওই বনের বহু অধিবাসীকে হাত করতে হয়েছে। তাদের অনেক পয়সাকড়ি দিয়ে কাজ করাতে হয়েছে। বাঘ ও

সিংহকে প্রতিরক্ষা শক্ত করার আশাতেই রাখা হয়েছিল। শত্রু যখন আক্রমণ করতে আসবে তখন প্রয়োজনবোধে ওই বাঘ ও সিংহকে ছেড়ে দেওয়া হবে। বাঘ সিংহের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য যখন শত্রু সেনারা ছোটাছুটি করবে তখন বিভ্রান্ত হয়ে, হকচকিয়ে গিয়ে কী ঘটেছে বুঝতে না পেরে বনের অধিবাসীদের বহু লোক হয় বন ছেড়ে পালাবে আর না হয় পয়সার লোভে ওই দুর্গে ঢুকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে।

স্বর্ণাচারি সমস্ত দিক থেকে যখন প্রস্তুত হয়ে গেল তখন সে খবর পেল যে বীরপুরের সেনারা আক্রমণ করতে আসছে। স্বর্ণাচারি নিজের লোকের হাতে বল্লম দিয়ে বলল যে, যে মুহূর্তে শত্রু সেনা পাহাড়ের নীচে পৌঁছে যাবে তক্ষুনি কোনো কথা না বলে, কোনোরকম ঘোষণা ছাড়াই যেন তারা বল্লম ছোড়ে তাদের দিকে।

বীরপুরের সেনাপতির নেতৃত্বে এক-শো ঘোড়সওয়ার ও দু-শো পদাতিক সৈন্য পাহাড়ের নীচে এসে দাঁড়াল। সেনাপতি উচ্চস্বরে বলল, 'ওহে শোনো! আমি বীরপুরের সেনাপতি বলছি, তোমরা তোমাদের অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করো। আর তা না হলে তোমাদের প্রত্যেককে কেটে টুকরো টুকরো করা হবে।'

আর সেই মুহূর্তে পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বল্লম বীরপুরের সেনাদের উপর পড়তে লাগল। সেই বল্লম-বৃষ্টির হাত থেকে সেনাপতিও নিস্তার পায়নি। তার কাঁধেও বিদ্ধ হল একটি বল্লম। সে আর্তনাদ করতে লাগল।

উনিশ

সমরবাহুর অনুচরদের ছুড়ে মারা একটি বল্লম তীব্রবেগে এসে বীরপুরের সেনাপতির কাঁধে বিঁধেছিল। সেনাপতি সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে ঘোড়া থেকে নীচে পড়ে যায়। তখন তাকে নিয়ে সেনাবাহিনীর একজন লোক তাড়াতাড়ি সরে যায় সেখান থেকে। সেনাপতির কাঁধে পটি বেঁধে দেয় সেনাটি।

স্বর্ণাচারি সমরবাহুর অনুচরকে প্রশংসা করে বলে ওঠে, 'প্রথম আঘাতেই আমরা শত্রুকে নাজেহাল করতে পেরেছি। গুনতে গেলে আমরা সংখ্যায় মাত্র ছাব্বিশ জন আছি কিন্তু শত্রুর এই আঘাতেই ধারণা হবে যে আমরা সংখ্যায় অনেক বেশি আছি। এই আঘাত হানার ফলে শত্রু আমাদের এই পাহাড়ের উপর ওঠার সাহস করবে না।'

এ-কথা শুনেই সমরবাহুর একজন অনুচর বলল, 'মহামন্ত্রী, শত্রু যদি পাহাড়ে উঠতে চায় তো ভয় পাবার কিছু নেই। আমাদের সঙ্গে যে বনবাসী এসেছে তারা শত্রুর উপর বাঘ এবং সিংহ লেলিয়ে দেবে।'

স্বর্ণাচারি পাহাড়ের নীচে বীরপুরের যে সেনারা জমেছিল তাদের দিকে একবার ভালো করে দেখে নিল। তাদের মধ্যে মাত্র কয়েক জন ঘোড়ায় বসেছিল। অন্যেরা আহত সেনাপতিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তার কাছ থেকে আদেশ বা নির্দেশ শোনার আশায়। আঘাতের ফলে কাতরাতে কাতরাতে সেনাপতি বোঝাচ্ছিল কীভাবে পাহাড়ের উপর উঠতে হবে।

সমরবাহুর দু-জন সাহসী অনুচর স্বর্ণাচারির কাছে গিয়ে বলল, 'মহামন্ত্রী, মনে হচ্ছে, শত্রুকে আক্রমণ করার এটাই উপযুক্ত সময়। আপনি নির্দেশ দিলে আমরা তাদের আঘাত হেনে এই মুহূর্তে তাদের ঘোড়াগুলো দখল করে নেব।'

সমরবাহুর অনুচরদের সাহস দেখে স্বর্ণাচারির খুব আনন্দ হল। কিন্তু নীচে নেমে বীরপুরের সেনাদের আঘাত হানার ব্যাপারটা তার কাছে কেমন যেন অবিশ্বাস্য ঠেকল। স্বর্ণাচারি তাদের বলল, 'দেখ, তোমরা তাড়াহুড়ো করো না। সংখ্যার দিক থেকে ওরা আমাদের দশ গুণ আছে। পাহাড় থেকে আমাদের নামতে দেখে ওরা মুহূর্তে সতর্ক হয়ে যাবে এবং আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে সর্বনাশ করে ফেলবে। ভালো কথা, আমাদের উটগুলো পাহাড়ের ওপাশের সমতল ভূমিতে সযত্নে রাখা আছে তো?'

'সমস্ত উট আমরা এক জায়গায় রেখে তাদের দেখাশোনার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করেছি। এখন আপনার নির্দেশ তাড়াতাড়ি জানান। আমাদের বল্লমের নাগালের বাইরে ওরা চলে যাচ্ছে। এখন কি ওরা সেখানে আর আমরা এখানে বসে থাকব? ব্যাস, এই হবে আমাদের কাজ?' বলল সমরবাহুর দু-জন অনুচর।

ওই অনুচর দু-জন এমনভাবে কথা বলছিল যেন সেই মুহূর্তে স্বর্ণাচারির নির্দেশ পেলে তারা শত্রুপক্ষকে দূর করে দিতে পারবে। তাদের এই অস্থিরতা লক্ষ করে স্বর্ণাচারি কোনোরকম রাগ প্রকাশ করল না। স্বর্ণাচারি একটু হেসে বলল, 'তোমরা এ-কথা ভেব না যে লড়াই শেষ হয়ে গেছে। তোমরা কি ভাবছ যে ওদের সেনাপতি ঘায়েল হয়েছে বলে তার সেনারা সব পালাবে? জলে কি মাছ দুর্বল থাকে। বীরপুরের সেনারা বীরপুরের একটা অংশ অত সহজে ছেড়ে দেবে? পালালে বীরপুরের রাজা কি তাদের দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করবে না? তাদের ফাঁসি দেবে না?'

স্বর্ণাচারি এসব কথা বলতে-না-বলতেই দেখা গেল বীরপুরের সেনারা ছোটাছুটি করতে লাগল এবং কয়েক জন ঘোড়ায় উঠে বসল। আর দু-জন সেনা ধরাধরি করে সেনাপতিকে ঘোড়ায় বসিয়ে দিল। তার পাশে ছিল চার-পাঁচ জন সৈনিক। সেনাপতি ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের চারদিক দেখতে লাগল।

সেনাপতির চালচলন লক্ষ করে স্বর্ণাচারি বুঝল যে সেনাপতি পথ খুঁজছে সহজে পাহাড়ে ওঠার।

প্রত্যেক দিন সমরবাহুর লোকেরা যে পথে পাহাড়ে ওঠানামা করে সেই পথ ওই সেনাপতির পক্ষে চিনে ফেলা খুব কঠিন কাজ নয়। এ-কথা মনে হতেই তার বুক আতঙ্কে কেঁপে উঠল। তখন স্বর্ণাচারি সমরবাহুর অনুচরদের বল্লম ও পাথর নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলল। আর নিজে গেল বাঘ ও সিংহ নিয়ে আসা বনবাসীদের সঙ্গে কথা বলতে।

স্বর্ণাচারিকে তাদের দিকে আসতে দেখেই বনবাসীরা খুশি হয়ে তাকে নমস্কার করে দাঁড়াল। ওদের নেতা সামনে এগিয়ে এসে শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করে স্বর্ণাচারিকে সবিনয়ে বলল, 'মহারাজ, বীরপুরের সেনার চেয়ে আপনার সেনা বেশি ক্ষমতাবান মনে হচ্ছে। না নাহলে প্রথম আঘাতেই ওরা সেনাপতিকে আহত করতে পারত না।'

'ওদের সেনাপতি আহত হয়েছে, মরেনি। শত্রুপক্ষের সেনাপতিকে আহত করার অর্থ ওই পক্ষের সমস্ত সেনাকে সতর্ক করে দেওয়া। এখন শত্রু সেনারা চেষ্টা করছে পাহাড়ের উপর উঠে এসে আমাদের আক্রমণ করতে। পাহাড়ের উপর উঠে আসার যে পথ আছে সেই পথে তারা খুব সহজেই উপরে উঠে আসতে পারে। তোমরা আমার ইশারা পেলেই যাতে সিংহ এবং বাঘকে ছেড়ে দিতে পার সেইভাবে প্রস্তুত থেকো।' স্বর্ণাচারি বলল।

তারপর স্বর্ণাচারি সেই বনবাসীদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ে ওঠার পথের পাশের একটি গুহা ওদের দেখিয়ে দিল। বাঘ ও সিংহের পিঞ্জরাগুলো ওই গুহার কাছে রাখা হল।

বনবাসীদের নেতা নিজের অনুচরদের দেখিয়ে স্বর্ণাচারিকে বলল, 'মহারাজ, যে মুহূর্তে বীরপুরের সেনারা এদিকে আসবে, আমার অনুচররা কালমাত্র বিলম্ব না করে এই বাঘ ও

সিংহকে এই পিঞ্জরা থেকে বের করে দেবে। এই প্রাণী আজ কতদিন খেতে পায়নি। মুহূর্তে যাকে সামনে পাবে তাকেই ছিঁড়ে খাবে।'

'ওই জানোয়ারগুলোকে ছেড়ে দেওয়ার পর ওরা শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে আবার ছুটে বনেও ঢুকে যেতে পারে। তা ঘটনা যাই ঘটুক, তোমরা তোমাদের কাজ ঠিক সময়ে করবে। আর একটি কথা তোমরা যে আমাকে রাজা ভাবছ তা কিন্তু ঠিক নয়। আমি মন্ত্রী। তবে মনে রেখো আমাদের রাজা এই কাজের জন্য তোমাদের উপযুক্ত পুরস্কার দেবেন।' স্বর্ণাচারি বনবাসীদের বলল।

স্বর্ণাচারি বনবাসীদের সাথে কথা বলে সমরবাহুর অনুচরদের কাছে ফিরে এসে বার বার নীচের দিকে তাকাল। ইতিমধ্যে বীরপুরের সেনাপতি একটি পরিকল্পনা করে ফেলল। তারা পাহাড়ের উপর ওঠা শুরু করে দিল। পাহাড়ের উপর থেকে যখন পাথর এবং বল্লম তাদের উপর পড়তে লাগল তখন তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ত আবার পরক্ষণেই উপরের দিকে উঠত। উঠতে উঠতে তির ছুড়ত।

তাদের এই কৌশল দেখে স্বর্ণাচারি বুঝে নিল যে এইভাবে তির ছুড়তে ছুড়তে এবং আত্মরক্ষা করতে করতে শেষপর্যন্ত কিছু সৈন্য অবশ্যই উপরে উঠে আসবে। তখন নিজের মাত্র ছাব্বিশটি সৈনিক নিয়ে শত্রুপক্ষের সেনাদের পরাজিত করা সহজ হবে না। এইকথা ভেবে স্বর্ণাচারি অনুচরদের ডেকে বলল, 'যুদ্ধ করার একটা কৌশল আছে। সবসময় যে শুধু এগিয়ে যেতে পারব তা নাও হতে পারে, পেছতেও হতে পারে। এমন বহু যুদ্ধ হয়েছে যেখানে এক-পা এগিয়ে দু-পা পেছতে হয়েছে। তাই যত বেশি সম্ভব শত্রুদের খতম করে এখান থেকে আমাদের গোপন পথে পালানো ছাড়া অন্য কোনো পথ দেখছি না। আমাদের দু-জন লোক আগে থেকেই ওখানে আছে। আরও দু-একজন গিয়ে উট নিয়ে প্রস্তুত থেকো।'

ইতিমধ্যে বীরপুরের সেনারা পাহাড়ের উপর ভালোভাবেই ওঠা শুরু করে দিয়েছিল। সেনাপতি নীচে থেকে যেভাবে নির্দেশ দিচ্ছিল ওরা সেইভাবে উপরের দিকে উঠছিল।

'হে উষ্ট্রবীরগণ, আমার কথা মন দিয়ে শোনো। বীরপুরের সেনাপতি মুর্খের মতো তার ঘোড়সওয়ারকে পাহাড়ের উপর তুলছে। ওর ধারণা আমাদের উটগুলো পাহাড়ের উপরেই আছে। তোমরা এখন উপর থেকে বড়ো বড়ো পাথর গড়িয়ে দাও। ওরা হকচকিয়ে তাল সামলাতে পারবে না। ফলে ওদের অনেকে আহত হবে এবং কিছু লোক মারা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে বল্লমও ছোড়।' স্বর্ণাচারি আদেশ দিল।

সমরবাহুর অনুচররা স্বর্ণাচারির নির্দেশ মতো পাথর গড়িয়ে দিতে লাগল। গড়িয়ে দেওয়া পাথরগুলো প্রত্যেকটা যে শত্রুর উপর পড়ছিল তা নয়। কয়েকটা গড়াতে গড়াতে এদিক-

ওদিক পড়ে যাচ্ছিল। ওদের এই অসফলতার ফলে বীরপুরের সেনাদের মনে উৎসাহ বেড়ে যাচ্ছিল। ওরা তরবারি বের করে নিজের রাজার জয়ধ্বনি করছিল। ওদের কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, 'বীর বীরপুরের রাজার জয়!'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরপুরের সেনারা বাঘ ও সিংহ নিয়ে যে গুহায় বনবাসীরা অপেক্ষা করে বসেছিল, সেইখানে এল। এদিকে স্বর্ণাচারি তখন ভাবছিল বনবাসীরা ঠিক সময়ে বাঘ ও সিংহকে শত্রুর উপর ছেড়ে দেবে না নিজেরাই ভয়ে পালাবে। নিজেদের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে কতটা যে এগিয়ে আসবে, সাহায্য করবে তার পরীক্ষা এখনও হয়নি। ঠিক তখনই শুনতে পেল সিংহ ও বাঘের গর্জন। উঁকি মেরে দেখতে পেল ওই জানোয়ারগুলো বীরপুরের সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই ঘটনার ফলে শত্রু সেনাদের মধ্যে দারুণ হাহাকার ও আর্তনাদ জেগে ওঠে। ওরা এই ধরনের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। চোখের পলকে চার-পাঁচ জন সেনা বাঘ ও সিংহের আক্রমণের ফলে পাহাড় থেকে নীচে গড়িয়ে পড়তে থাকে। কয়েক জন সেনা প্রাণ মুঠোয় করে পালাতে থাকে। ঘোড়সওয়ার সেনাদের মধ্যেও দারুণ অনিশ্চিত অবস্থা দেখা দিল। ঘোড়াগুলো যে যেদিকে পারল ছুটে পালাতে লাগল। কিছু ঘোড়া আহত হয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে পড়ে গেল। আর ওদের চাপে পড়ে বহু সেনা আহত হল। সেনাপতির নির্দেশ আর কেউ মানছিল না। অবস্থা দেখে সেনাপতিও হকচকিয়ে গেল। কী যেন হচ্ছে কীভাবে যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছিল না। গোটা ব্যাপারটা যেন তার নাগালের বাইরে। বহু সৈনিক যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল। বীরপুরের সেনাদের এই অবস্থা দেখে স্বর্ণাচারি ও সমরবাহুর অনুচরদের মধ্যে দারুণ আনন্দ হল। যত জন পাহাড়ের উপরের দিকে উঠছিল, তারা প্রত্যেকে পালিয়েছে অথবা আহত হয়েছে। এই অবস্থা দেখে সমরবাহুর অনুচররা স্বর্ণাচারিকে বলল, 'মহামন্ত্রী, আমাদের নির্দেশ দিন, বীরপুরের পলায়মান সেনাদের বল্লম দিয়ে মেরে শেষ করে দি।'
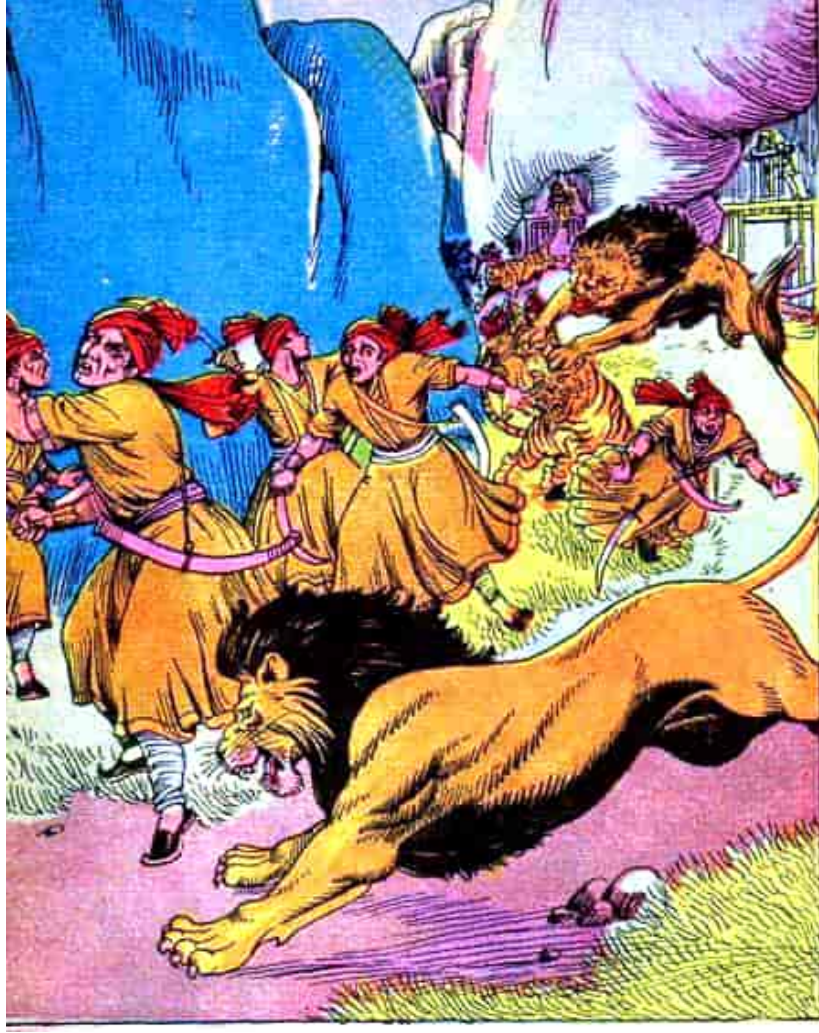
স্বর্ণাচারি তাদের এই কথার কোনো জবাব দিল না। সে হিসেব কষে দেখল বীরপুরের যে সেনাদের মেরে ফেলা হয়েছে তাদের সংখ্যা ওদের দশভাগের এক ভাগ হবে। বাকি নয় ভাগ নিশ্চয় আশেপাশে বনজঙ্গলে লুকিয়ে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সেই মুহূর্তে বাঘ বা সিংহ সমরবাহুর লোকের হাতে আর নেই।

এদিকে পাহাড়ের নীচে অদূরে বীরপুরের সেনাপতি পলায়মান সেনাদের জড়ো করে তারপর কী করবে না করবে বোঝাচ্ছিল। সেনাপতির নির্দেশে কয়েক জন ঘোড়সওয়ার পাহাড়ের অন্য প্রান্ত ঘুরে ঘুরে দেখছিল। স্বর্ণাচারি সমরবাহুর লোককে ওই ঘোড়সওয়ারদের দেখিয়ে বলল, 'দেখ, সাহস ভালো জিনিস কিন্তু যুদ্ধের সময় দুঃসাহস ভালো নয়। ওই দেখ বীরপুরের সেনাপতি আবার উঠে-পড়ে লেগেছে আমাদের আক্রমণ করতে। এখন আমরা যে কয় জন আছি, আমাদের পক্ষে ওদের আক্রমণের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। শত্রু যখন সবল তখন তাকে আক্রমণ করা মূর্খতা। ওরা লড়বে ওদের মতো, আমরা লড়ব আমাদের মতো। এখন আমাদের শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। তা না হলে ওদের মোকাবিলা করতে পারব না। এখন আমাদের উচিত এখান থেকে সরে পড়া।

আমাদের উট প্রস্তুত রয়েছে। বনে কিছুদূর যাওয়ার পর আমরা হয়তো দুই ক্ষত্রিয় যুবক ও সমরবাহুর সাক্ষাৎ পেতে পারি।'

'সিংহ ও বাঘ নিয়ে যে বনবাসী সঙ্গে এসেছিল ওরা আমাদের সঙ্গে কি নেই? ওদের সাহায্য পেলে শত্রুকে পরাজিত করা সহজ হত?' সমরবাহুর একজন অনুচর বলল।

'হয়তো ওরা ভয় পেয়ে বনে পালিয়েছে।' স্বর্ণাচারি বলল।

'মহামন্ত্রী, এখন যদি আমরা পালাই তাহলে কি শত্রু আমাদের কাপুরুষ ভাববে...' কথাটা শেষ হতে-না-হতেই সমরবাহুর সেই লোকটা দেখতে পেল তার অনুচররা ছুটতে ছুটতে আসছে। ওরা এসে স্বর্ণাচারিকে বলল, 'মহামন্ত্রী, শত্রু আমাদের উটগুলোর দিকে আসছিল। আমরা তখন তাড়া করতে এগিয়ে গেলাম। ওরা কিন্তু আমাদের কিছু না বলে চুপচাপ সরে পড়ল। ওদের গতিবিধি দেখে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে ওরা খুব সম্ভব আমাদের ওপর বড়ো ধরনের আক্রমণ করার জন্য জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ওরা যদি আমাদের উটগুলো নিয়ে যায়, তাহলে আমরা দু-দিক থেকে বিপদে পড়ব। অতএব আর দেরি নয় চল উটের কাছে যাই।' স্বর্ণাচারি এ-কথা বলে পাহাড় থেকে নীচে নামতে লাগল।

স্বর্ণাচারি ও সমরবাহুর অনুচররা পাহাড় থেকে নীচে নেমে উটের উপর বসতে না বসতেই দেখা গেল চল্লিশ-পঞ্চাশ জন বীরপুরের ঘোড়সওয়ার তরবারি ও বল্লম উঁচিয়ে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। মুহূর্তে স্বর্ণাচারি ঠিক করে নিল যে শত্রু যখন দেখে ফেলেছে তখন আর পিছনের দিকে না পালিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই ভালো। নতুন পরিস্থিতিতে নতুন কৌশল প্রয়োগ করাই যুদ্ধের নীতি। আঘাত না হানলে আঘাত খেতে হবে শত্রুর কাছ থেকে। তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে স্বর্ণাচারি সমরবাহুর অনুচরদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'হে উষ্ট্রবীরগণ, পাহাড়ি দুর্গের দেবীর কাছে শত্রুকে বলি দেবার জন্য তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে চল।'

পরক্ষণেই রণধ্বনি তুলে বীরপুরের ঘোড়সওয়ার সেনারাও স্বর্ণাচারির দিকে দ্রুত ধাবিত হল।

কুড়ি

স্বর্ণাচারি তরবারি উঁচিয়ে বীরপুরের ঘোড়সওয়ার সেনাদের উপর উট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এতে সমরবাহুর অনুচররাও খুব উৎসাহ পেয়ে বীরপুরের সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এগিয়ে গেল।

ফলে উভয় দলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। উটের উপর সওয়ার হয়ে বল্লম ও তরবারি দিয়ে ঘোড়ায় চড়া বীরপুরের সেনাদের পর্যুদস্ত করতে থাকল। তবে যুদ্ধে কেউ হেরে যায়নি অত সহজে। ছলে-বলে সমস্ত রকমে মোকাবিলা করেছে ওরা।

পাঁচ সাত মিনিটের প্রচণ্ড যুদ্ধে উভয়পক্ষের কয়েক জন সৈনিক আহত হয়ে বাহনের উপর থেকে নীচে পড়ে গেল। বীরপুরের ঘোড়াগুলো কোনোদিন এর আগে উট দেখেনি।

ফলে কিছুক্ষণের জন্য ঘোড়াগুলো থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল। পালাতে লাগল কয়েকটা ঘোড়া। ফলে যারা এসেছিল সমরবাহুর অনুচরদের ঘিরে ফেলে পরাজিত করতে তারা পারল না জয়ী হতে। পালানোর চেষ্টা করেও পালাতে পারল না স্বর্ণাচারি। শেষে অবস্থা ফিরে গেল। স্বর্ণাচারিকেও কৌশল বদলাতে হল। কারণ তার পক্ষের লোকও অনেকে আহত হয়েছে।

মাত্র পনেরো-ষোলো জনকে নিয়ে আর কতক্ষণ যুদ্ধ করা যায়। ওদের নিয়ে স্বর্ণাচারি পালাল।

এই পালানোর পিছনে একটি কারণ আছে। স্বর্ণাচারির মনের গভীরে একটি উদ্দেশ্য আছে। ওই উদ্দেশ্যকে কার্যকরী তাকে করতেই হবে। এবং তা করতে হলে তাকে আর বিপদের ঝুঁকি এই ক্ষেত্রে নেওয়া উচিত নয়।

ততক্ষণে বীরপুরের সেনাপতি ওখানে এসে বলল, 'একি তোমাদের ভিতর থেকে শত্রুরা পালাতে পারল কী করে? তোমরা কী করছিলে?'

বীরপুরের ঘোড়সওয়ার নেতা এসে বলল, 'আমরা বহু শত্রুসেনাকে বধ করতে পেরেছি। অন্যেরা বনে পালিয়েছে।'

'যারা পালাচ্ছে তাদের বন্দি না করে তুমি এখানে কী করছ?' সেনাপতি রেগে গিয়ে বলল।

'আজ্ঞে আমি ভেবেছি আমার আহত সেনাদের বাঁচানোর ব্যবস্থা করে আরও ঘোড়সওয়ার সেনা নিয়ে জঙ্গলে ওদের আক্রমণ করে শেষ করে দেব।' ঘোড়সওয়ার সেনাদের নেতা বলল।

'তুমি ভাবছ, তুমি যতক্ষণ না তৈরি হয়ে ওদের আক্রমণ করতে যাচ্ছ ততক্ষণ ওরা তোমার অপেক্ষায় বসে থাকবে? তোমরা হেরে গেছ, অথবা তোমাদের ভেতর থেকে ওরা পালিয়েছে, এ দুটোর মধ্যে একটাও সত্য হলে তোমরা কি বুঝতে পারছ না যে রাজা তোমাদের কি শাস্তি দেবেন? ভেবে দেখেছ? তোমার আর আমার ফাঁসি হবে?'

সেনাপতি চটে গিয়ে বলল।

'আজ্ঞে ওদের আপনি ছোটো শত্রু ভাববেন না। আমি নিজের কানে শুনেছি অনুচররা ওদের একজনকে মহামন্ত্রী বলে ডাকছে। ওরা যেভাবে চলে ও কথা বলে তাতে মনে হয় ওরা এক মহাভারত...।'

ঘোড়সওয়ারদের নেতার কথা শেষ হতে-না-হতেই সেনাপতি গর্জে উঠে বলল, 'তুমি তোমার ভাষণ বন্ধ করবে? আর কালমাত্র বিলম্ব না করে যে ক-জন ঘোড়সওয়ারকে পাও, ওদের নিয়ে অনুসরণ কর। আমি আগে এই পাহাড়ের উপর উঠে পতাকা তুলে তোমাকে সাহায্য করতে যাচ্ছি। তখন আমি আরও কিছু সেনা নিয়ে যাব।'

ঘোড়সওয়ারদের নেতা সেনাপতিকে নমস্কার করে তার নির্দেশমতো স্বর্ণাচারিকে অনুসরণ করতে গেল।

সেনাপতির কথা শুনে ঘোড়সওয়ার নেতা বুঝতে পরল যে স্বর্ণাচারিকে ধরতে না পারলে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

কিন্তু ততক্ষণে স্বর্ণাচারি সদলবলে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য কোনোরকমে খড়গবর্মা, জীবদত্ত ও সমরবাহুকে পাহাড়ি দুর্গের হাতছাড়া হওয়ার খবর দেওয়া।

সে জানত কোন পথে গেলে সে ভালুক জাতের লোকের আস্তানা খুঁজে বের করতে পারবে। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর সদলবলে স্বর্ণাচারি একটি পুকুরের কাছে পৌঁছাল।

ওরা উট থেকে নামল। ওদের জল খাইয়ে চরতে ছেড়ে দিল। তারপর স্বর্ণাচারি তার দু-জন অনুচরকে বলল, 'শোনো, বীরপুর থেকে পদাতিক অথবা ঘোড়সওয়ার সেনা আমাদের খোঁজে আসতে পারে। ওরা যদি কম সংখ্যক সেনা থাকে তাহলে আমরা ওদের মেরে ফেলে মাটিতে পুঁতে ফেলব। আর যদি বেশি সংখ্যায় আসে তাহলে এই জায়গা ছেড়ে আমাদের তৎক্ষণাৎ পালাতে হবে। তাই এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে চারদিকে নজর রাখা।'

আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। গাছের উপর বসে সমরবাহুর একজন অনুচর দেখতে পেল দশ-বারো জন ভালুক দলের লোক দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ওই পুকুরের দিকে ছুটে আসছে। এই দৃশ্য দেখে লোকটা স্বর্ণাচারির কাছে গিয়ে সব কথা বলল।

স্বর্ণাচারি অনুচরদের নিয়ে অদূরে গাছের আড়ালে লুকিয়ে বলল, 'যাদের খোঁজে আমরা যাচ্ছিলাম তারাই এদিকে আসছে। এই ভালুক দলের লোকেরাই আমাদের রাজা সমরবাহুকে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল।'

ইতিমধ্যে ভালুক দলের লোক পুকুরের কাছে পৌঁছে গেল। ওদের একজন দেখতে পেল কয়েকটা উট চরে বেড়াচ্ছে। দেখেই তার গোটা শরীর ভয়ে কাঁপতে লাগল।

সে বলল, 'হে, মা বৃকেশ্বরী, আমাদের বাঁচাও।' সে তাড়াতাড়ি অন্যদের দেখাল ওই উটগুলোকে।

ভালুক দলের লোক মুহূর্তের জন্য কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওদের সেই অবস্থা দেখে স্বর্ণাচারি মুহূর্তে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু-জনের গায়ে বল্লম চালিয়ে দিল। ওরা 'হে মা, বৃকেশ্বরী' বলে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পরক্ষণেই পাঁচ-সাত জন ভালুক দলের লোক তাদের কাছে অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল। আর বাকি যারা ছিল তারা বাঘকে দেখে হরিণের মতো পালাল।

নতুন পরিস্থিতিতে নতুন কৌশল অবলম্বন করাই শত্রুকে পরাস্ত করার শ্রেষ্ঠ পন্থা। স্বর্ণাচারি মহামন্ত্রী হতে চায়। তাই সে নিজের বুদ্ধি সবসময় এ ব্যাপারে সজাগ রাখে।

ভালুক দলের যারা পালাল তারাই পুকুরের কাছে যা ঘটেছে তা পুকুরের দিকে যারা আসছিল সেই খড়গবর্মা, জীবদত্ত, সমরবাহু ও গুরু ভালুককে বলল।

'সে কি! যে স্বর্ণাচারির দুর্গের কাজে জড়িত থাকার কথা সে এখানে এসেছে কেন? এ তো বড়ো তাজ্জব ব্যাপার! পাহাড়ে কোনো বিপদ ঘটেনি তো! পালিয়ে আসেনি তো!' জীবদত্ত উদবিগ্ন হয়ে বলল।

'স্বর্ণাচারির রাজভক্তি সন্দেহাতীত। হয়তো ভালুক জাতের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করতে এখানে এসেছে।' সমরবাহু খুশি মেজাজে বলল।

জীবদত্ত কেন যে এ-কথা বলল তা সে বুঝতেই পারল না।

এইসব কথা গুরু ভালুক ঠিক বুঝতে না পেরে সে ভাবল নতুন কোনো দলের আক্রমণ সমাগত।

সে জোড় হাত করে খড়গবর্মা ও জীবদত্তকে বলল, 'মশাই, আপনারা আমাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন, সে-কথা ভুলে যাবেন না।'

গুরু ভালুকের কথা শুনে জীবদত্ত হেসে উঠে বলল, 'গুরু ভালুক, আমাদের আর এই পুকুরের ঘাটে যারা আছে তাদের পক্ষ থেকে তোমার কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। আমরা যা বলি তাই করি। আমাদের অবিশ্বাস করো না। আমরা যা করি বলে করি। রীতিমতো ঘোষণা করে করি। ভয় পেয়ো না।'

'সাক্ষাৎ বৃকেশ্বরী দেবীর কৃপা তো তোমার উপর আছে, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?' খড়গবর্মা উপহাস করে বলল।

ওরা সব এই ধরনের কথা বলতে বলতে পুকুরঘাটে পৌঁছাল। ততক্ষণে সমরবাহু কোথায় আছে কেমন আছে ইত্যাদি প্রশ্ন করছিল স্বর্ণাচারি বন্দি ভালুক জাতের লোককে। সে খড়গবর্মা, জীবদত্ত ও সমরবাহুকে দূর থেকে আসতে দেখতে পেল। তাড়াতাড়ি তাদের

কাছে ছুটে এসে নমস্কার করে বলল স্বর্ণাচারি, 'মহারাজা সমরবাহু, ক্ষত্রিয় যুবকগণ, আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।'

জীবদত্ত স্বর্ণাচারির কাঁধে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, 'স্বর্ণাচারি, মনে হচ্ছে তুমি তোমার মহারাজার দুর্গ থেকে বনে বিহার করতে বেরিয়েছ?'

'ক্ষত্রিয় বীরগণ, সেই দুর্গ এখন শত্রুর কবলে পড়ে গেছে। দুর্গকে রক্ষা করতে আমি ও সমরবাহুর অনুচররা আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারিনি। এই চেষ্টা করতে গিয়ে আমাদের কয়েক জন অনুচর স্বর্গে গেছেন।' স্বর্ণাচারি গুরুগম্ভীর বিষাদপূর্ণ গলায় বলল।

'কিছু লোক বেঁচে থাকলেও চলবে। তোমার রাজার নাম রক্ষার জন্য কয়েক জন হলেই চলবে, কি চলবে না?' হাসতে হাসতে খড়গবর্মা বলল।

স্বর্ণাচারি নিজের সঙ্গে যাদের এনেছিল তাদের দেখিয়ে সমরবাহুকে বলল, 'আমাকে নিয়ে এখন মোট ষোলো জন আমরা আছি।'

'আমাদের পাহাড়ি দুর্গ শত্রু দখল করে নিয়েছে? কীভাবে দখল করতে পারল ওরা? কারা ওরা?' সমরবাহু দাঁতে দাঁত ঘষে বড়ো বড়ো চোখে গর্জে উঠে জিজ্ঞেস করল।

স্বর্ণাচারি কীভাবে চিড়িয়াখানার অধিকারী বনে এসেছিল, কীভাবে তারা সজ্জিত হয়ে এল এবং কীভাবে তারা তাদের ব্যূহ ভেদ করে বনে পালিয়ে এল ইত্যাদি সবিস্তারে জানাল।

সমস্ত কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে সমরবাহু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'তার মানে, বহুদিন ধরে আমরা যে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে ছিলাম তা শত্রুর হাতে পড়ে গেল? বীরপুরের রাজাকে কোনোক্রমেই ক্ষমা করা চলে না। ওই রাজাকে শেষ করে ফেলতে হবে। হে ক্ষত্রিয় বীরগণ, এই মুহূর্তে আপনাদের সাহায্য আমি প্রার্থনা করি।'

জীবদত্ত সমরবাহুর দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে কী যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় খড়গবর্মা গর্জে উঠে বলল, 'সমরবাহু এখন তুমি কী ধরনের বিপদের মোকাবিলা করতে চাও? কী ধরনের কাজ তুমি আমাদের কাছ থেকে আশা কর? আমরা ভালুক দলের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধারের কথা দিয়েছিলাম, উদ্ধর করেছি। এখন আমরা নিজেদের পথে যেতে চাই। আমরা বিন্ধ্য পর্বতে যাচ্ছি। বিপদের হাত থেকে অন্যদের রক্ষা ও উদ্ধার করতে গিয়ে আমাদের অনেক সময় ব্যয় হয়ে গেছে। আর অপেক্ষা করা যায় না।'

জীবদত্ত খড়গবর্মার পিঠে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে তাড়াহুড়ো না করার ইশারা করে বলল, 'সমরবাহু তুমি রাজ্য উদ্ধারের জন্য এত আগ্রহ পোষণ করছ কেন? তুমি তো দেখলে একটি রাজ্য গড়া এবং তার দখল রাখা অত সহজ নয়। তার চেয়ে এই বিরাট

অরণ্যের যেকোনো অঞ্চলে চাষ-আবাদ করে তুমি তো সদলবলে এখন আরামেই থাকতে পার।'

এই কথার পিঠে সমরবাহু কোনো জবাব দিতে পারল না।

মাথা নীচু করে কী যেন ভাবতে লাগল। তখন স্বর্ণাচারি নাক গলিয়ে বলল, 'হে ক্ষত্রিয় যুবকগণ, আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। সমরবাহুর নাম শুনে আমার মনে হচ্ছে ইনি কোনো চন্দ্রবংশের লোক। আমার ভীষণ ইচ্ছা এঁর করায়ত্বে সুন্দর একটি ছোটোখাটো রাজ্য থাক আর আমি সেই রাজ্যের মন্ত্রী হই। আপনাদের সাহায্য পেলে আমার ধারণা আমরা সহজেই বীরপুরের রাজার কবল থেকে ওই দুর্গ উদ্ধার করতে পারব। তখন ওই দুর্গের আশেপাশের কিছু অঞ্চল জুড়ে একটি ছোট্ট রাজ্য গড়ে তুলে আমরা থাকতে পারব।'

তখন জীবদত্ত খড়গবর্মার দিকে তাকিয়ে বলল, 'খড়গবর্মা, ভাবছি সাহায্য করাই ভালো।' তারপর সমরবাহুও স্বর্ণাচারির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের প্রথম কর্তব্য হবে, এখানে যে বীরপুরের সেনারা আসবে তাদের মোকাবিলা করা। আমরা সংখ্যায় বেশি নেই। তাই মুখোমুখি আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়তে যাব না। আমরা অন্য কৌশল নেব। ওই সেনাদের আমরা গুরু ভালুকের দুর্গে ঢোকাব।'

'সেটা কী করে সম্ভব? ওরা বোকার মতো ঢুকতে চাইবে কেন ওই দুর্গে?' স্বর্ণাচারি প্রশ্ন করল।

তখন জীবদত্ত বুঝিয়ে বলল, 'বলছি শোনো। এই গুরু ভালুকের দু-একজন লোক আগে বীরপুরের সেনাদের নেতাকে বলবে যে আমরা ওই দুর্গে ঢুকে আত্মরক্ষা করেছি। তখন ওরা আমাদের বধ করার উদ্দেশ্যে ওই দুর্গে ঢুকবে। তারপরে আমরা তাদের অল্প লোক নিয়ে সহজ কৌশলে খতম করতে পারব।'

তারপর জীবদত্ত গুরু ভালুককে বলল, 'আচ্ছা ভালুক, তোমার শিষ্যরা কি তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে? না কি বিশ্বাসঘাতকতা করে?'

এই প্রশ্ন শুনে গুরু ভালুক বলল, 'হুজুর, আমার শিষ্যদের গুরু ভক্তি আমি এক্ষুনি প্রমাণ করে দিচ্ছি। আমার নির্দেশে ওরা পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিতে পারে। দেখুন আপনাদের সামনেই দেখিয়ে দিচ্ছি।' বলে পাশের এক অনুচরকে সে বলল, 'ওরে এই, গাছের উঁচু ডালে উঠে মাথা নীচের দিকে রেখে ঝাঁপ দাও তো।'

জীবদত্ত বাধা দেবার আগেই লোকটা একটা উঁচু গাছে উঠে 'গুরু ভালুক!' বলে চিৎকার করে মাথা নীচের দিকে রেখে পড়ে গেল।

একুশ

গুরু ভালুকের শিষ্য গাছ থেকে লাফ দিতেই জীবদত্ত গাছের নীচে দাঁড়িয়ে সেই শিষ্যকে ধরে ফেলল দণ্ড উঁচিয়ে। ভালুক জাতের ওই শিষ্য মাটিতে পড়ার আগে ওই দণ্ডের উপর পড়ল। পরক্ষণেই জীবদত্ত তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল।

এর ফলে ওই ভালুক যুবক কোনো আঘাত পায়নি। নিজের গুরু ভক্তির প্রমাণ দিতে না পারায় দুঃখ পেয়ে সে জীবদত্তকে বলল, 'মশাই, আপনি আমাকে ধরে ফেলে প্রাণে বাঁচিয়েছেন বটে তবে আমার স্বর্গে যাওয়ার পথও আপনি রুদ্ধ করে দিলেন। এতে আমার ক্ষতি হল।'

তার কথা শুনে জীবদত্ত হেসে বলল, 'আরে ভাই কে বলতে পারে তুমি এই গাছ থেকে নীচে পড়ে স্বর্গে যেতে না নরকে? যাই হোক, তুমি গাছ থেকে লাফ দিয়ে প্রমাণ করে দিলে যে তুমি গুরুর নির্দেশকে দেবতার নির্দেশের মতো মেনে চল। তোমাকে যে বাঁচালাম তার একটা উদ্দেশ্য আছে। ভবিষ্যতে তোমার গুরুকে এবং সমরবাহুকে তোমাকে সাহায্য করতে হবে।'

ততক্ষণে সেখানে গুরু ভালুক, সমরবাহু ও খড়গবর্মা পৌঁছে গেল। গুরু ভালুক খুশি হয়ে খড়গবর্মা ও জীবদত্তকে বলল, 'আপনারা আমার শিষ্যদের গুরু ভক্তির পরিচয়

পেলেন তো! এখন আপনারা আমার শিষ্যদের যে কাজে ব্যবহার করতে চান করতে পারেন। সমরবাহু যদি এই বনাঞ্চলের রাজা হন তো আমার সুড়ঙ্গে যে বৃকেশ্বরী দেবী আছেন তার পূজা নিয়মিত চলবে বলেই আমার ধারণা। আমি চাই প্রতিদিন পূজা হোক। এ ছাড়া আর কিছুই আমি চাই না।'

'ভালুক! এই দেবীর পূজার নামে যাতে কোনোরকম প্রাণী হত্যা না হয় তা দেখার ভার সমরবাহুর উপর থাকবে।' এ-কথা বলে জীবদত্ত গুরু ভালুকের শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই গাছ থেকে ঝাঁপ দেওয়া লোকের সঙ্গে আর একজন এসো আমার কাছে। আমি এই দু-জনের উপর একটা কাজের ভার দেব। ওই কাজ সেরে ফিরতে হবে।'

গুরু ভালুক নিজের শিষ্যদের একজনকে কাছে ডেকে গাছ থেকে লাফ দেওয়া লোকটার কাছে দাঁড় করিয়ে দিল। তখন জীবদত্ত ওই দু-জনকে ধরে উচ্চস্বরে বলল, 'শোনো, তোমাদের দু-জনকে একটা কাজ করে ফিরে আসতে হবে। এই কাজ করতে গিয়ে তোমাদের যদি জীবন যায় যাবে তবে কাজটা খুব গোপনে করতে হবে। কাক-পক্ষীও যেন টের না পায়। দেখ, সামনের ওই বনে বীরপুরের সেনারা কোথাও আছে। তোমরা হঠাৎ তাদের কাছে গিয়ে এমন হাবভাব দেখাবে যেন অজান্তে তাদের কাছে পৌঁছে গেছ। তাদের হাতে পড়ে যাওয়ার মতো ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলবে যে সমরবাহুর সমস্ত সৈনিক গুরু ভালুকের সুড়ঙ্গে ঢুকে আছে। বুঝতে পারলে?'

'আজ্ঞে এ আর এমনকী শক্ত কাজ! এ তো শুধু আমাদের গুরুর কাজই নয়, আমাদের রাজারও কাজ। আমরা বীরপুরের ঘোড়সওয়ারদের সঙ্গে দেখা করব। মেলামেশা করব। তারপর আপনি যেভাবে বললেন সেইভাবে সব করব। আপনি আমাদের উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। আমরা আপনার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।' গুরু ভালুকের শিষ্যদ্বয় বলল।

'তাহলে আর দেরি কেন, ঝটপট রওনা হয়ে যাও।' জীবদত্ত বলল।

ওই দু-জন শিষ্য তারপর নিজেদের গুরুর সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। গুরু ভালুক তাদের কানে কানে বলল, 'ওরা গুপ্তচর ভেবে তোমাদের মেরে ফেলার হুমকি দেবে, মৃত্যুভয়ও দেখাবে তবু তোমরা কিন্তু আসল রহস্য ভেদ করো না। বুঝতে পেরেছ আমার কথা?'

গুরু ভালুকের ওই শিষ্য দু-জন মাথা নীচু করে বলল, 'গুরু ভালুক, আপনার নির্দেশকে বৃকেশ্বরী দেবীর নির্দেশ মনে করি।' বলে ওরা দু-জন বেরিয়ে পড়ল।

ওই দু-জনে অনেকক্ষণ বনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। শেষে ওরা এক গাছের নীচে বীরপুরের ঘোড়সওয়ারদের দেখতে পেল। চার জন ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থেকে নেমে

গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। ওরা স্বর্ণাচারির অনুচরদের খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

ওদের দেখে গুরু ভালুকের অনুচর দু-জন নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলে হঠাৎ চিৎকার করতে লাগল, 'গুরু ভালুক! তুমি কোথায়? আমরা এখানে।'

ওদের চিৎকার কানে যেতেই গাছের নীচের ঘোড়সওয়ার সেনারা চমকে উঠল। ঝট করে খাপ থেকে তরবারি বের করে ওদের নেতা বলল, 'এ কাদের চিৎকার? আমরা কয়েক দিন আগে শুনেছিলাম না ভালুক জাতের লোকের কথা? মনে হচ্ছে এ ওদেরই কণ্ঠস্বর। আমাদের সামনে আর এক বিপদ দেখা দিয়েছে। চলো, এগিয়ে দেখা যাক। কে জানে ওরা কত জন আছে। খুব সাবধানে এগোতে হবে। কে জানে ওদের হাতে কোন অস্ত্র আছে। কোন মতলবে চিৎকার করছে তাও তো আমরা জানি না। চল।'

ঘোড়সওয়ার সেনারা কাছে আসতেই ভালুক জাতের ওই দু-জন শিষ্য হাতের তরবারি নীচে রেখে দিয়ে বলল, 'মশাই, আমাদের মেরে ফেলবেন না। আমরা আপনাদের অধীনে থাকতে চাই। মনে হচ্ছে আমাদের গুরু শত্রুর কবলে পড়ে গেছে। গুরুই যখন নেই তখন আর আমাদের থাকার কী বা সার্থকতা! বাঁচার আর কোনো মানে হয় না।'

অশ্বারোহীদের নেতা কী করবে, কী বলবে ঠিক করতে পারল না কিছুক্ষণ। পরে বলল, 'আচ্ছা, তোমাদের গুরুকে শত্রু নিয়ে গেছে? কে সেই শত্রু?'

ভালুক শিষ্যদের একজন বলল, 'হুজুর, কী বলব সেই বিপদের কথা। আজ ভোরে উটে চড়ে কিছু লোক হঠাৎ আমাদের সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়েছিল। আমরা তখন দেবীর পূজায় মগ্ন ছিলাম। এর ফলে আমরা এই অতর্কিত আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারিনি। ফলে ওদের হাতে আমাদের বহুলোক মারা গেছে। ওদের হাত থেকে কোনোরকমে রক্ষা পেয়ে আমাদের কয়েক জন গুরুর সঙ্গে সেই সুড়ঙ্গ থেকে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু আমরা এখন গুরুর খোঁজ পাচ্ছি না। আমরা আমাদের গুরুকে খুঁজছি। গুরু ছাড়া আমাদের জীবনের কোনো মূল্য নেই। জীবন বৃথা।'

ভালুক জাতের লোকের মুখে এই কথা শুনে বীরপুরের দলের নায়কের মনে হল, এ নিশ্চয় স্বর্ণাচারির কাণ্ড। পাহাড়ি দুর্গের উপর আমরা যে আক্রমণ চালিয়েছিলাম তা সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে ছিল। স্বর্ণাচারির নেতৃত্বে শেষে ওরা ওই সুড়ঙ্গ দখল করেছে। এসব কথা ভেবে সে কয়েক জন অনুচরকে ওই পাহাড়ের কাছে যে সেনাপতি রয়েছে তার কাছে তাদের যেতে বলল। ওরা রওনা হতে যাবে এমন সময় বীরপুরের ওই নেতা বলল, 'শোনো, তোমরা দু-জন তাড়াতাড়ি আমাদের সেনাপতিকে গিয়ে বল যে স্বর্ণাচারি এক

সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে আছে। আমাদের কর্তব্য এখন কী হবে জেনে এসো। যাও।' ওরা চলে গেল।

তারপর অশ্বারোহী নেতা ভালুক শিষ্যদের বলল, 'তোমরা দু-জনে আমাদের বড়ো উপকার করলে। আমরা খুঁজছিলাম আমাদের ওই শত্রুকে। আমাদের সেনাপতি এসে গেলেই আমরা তোমাদের উপহার দেব।'

উপহারের কথা শুনে ওই শিষ্য দু-জন অনিচ্ছা প্রকাশ করে বলল, 'আজ্ঞে আমরা দেবীর উপাসক। আমাদের উপহারের কোনো দরকার হয় না। আমরা আমাদের গুরুর সন্ধান পেলেই খুশি। এ ছাড়া আমরা আর কিছুই চাই না। আচ্ছা, এবার আমরা যাই। গুরুর খোঁজ করি।' বলে ওরা দু-জনে এগিয়ে গেল।

দলের নেতা হঠাৎ ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে এসে ওদের মধ্যে একজনকে ধরে রেগে গিয়ে গর্জে উঠে বলল, 'দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছ? সুড়ঙ্গ দুর্গ কোথায় আছে আমরা জানব কী করে? ওটা দেখানোর ভার তোমাদের বুঝলে?'

'হুজুর, সুড়ঙ্গ দুর্গ এখান থেকে বেশি দূরে নেই। একটা সোজা পথ আছে, সেই পথ একেবারে দুর্গের ভিতরে চলে গেছে। আমরা সেই পথ আপনাদের দেখিয়ে দেব। তবে দয়া করে সুড়ঙ্গের ভিতরে যদি ওরা আমাদের গুরুকে আটকে রেখে থাকে আপনারা দয়া করে ছাড়িয়ে দেবেন।' একজন ভালুক শিষ্য বলল।

'ওই দুর্গ অধিকার করার পর কে যে রাজদ্রোহী আর কে যে রাজহিতৈষী তা বিচার করার ভার আমাদের সেনাপতির। আমরা সবাই মিলেই ওই সুড়ঙ্গের ভিতর যাব। তোমরা দু-জনে ততক্ষণ এই গাছের নীচে বিশ্রাম কর।' দলের নেতা বলল।

দু-জন অশ্বারোহী সেনাপতিকে জানাল যে স্বর্ণাচারিরা পাহাড়ি অঞ্চল থেকে পালিয়ে সুড়ঙ্গে লুকিয়ে রয়েছে। শুনে সেনাপতি বলল, 'তার মানে সমস্ত রাজদ্রোহী এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। ভালোই হল, ওদের সবাইকে বন্দি করে প্রকাশ্য রাজপথে ঘোরাব। তারপর ওদের সবাইকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেব। এসব যারা দেখবে তারা জীবনে আর কোনোদিন দেশদ্রোহী হওয়ার সাহস পাবে না।'

তারপর সেনাপতি, অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনাদের নিয়ে ওই নেতার কাছে গেল। ওদিকে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত অনুমান করেছিল যে ভালুক শিষ্যদের কথা বিশ্বাস করে বীরপুরের সেনারা সুড়ঙ্গ দুর্গ দখল করতে আসবে। তাই তারা সমরবাহু, গুরু ভালুক ও অন্যদের নিয়ে সুড়ঙ্গের কাছে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরপুরের সেনাপতি ও দলনায়কের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হল। দলনায়ক সেনাপতিকে গুরু ভালুকের শিষ্যদের দেখিয়ে সমস্ত ঘটনা জানাল। সে বলল,

'ওই সব রাজদ্রোহী আমাদের জালে পড়ে যাবে।'

সেনাপতি ভালুক শিষ্যদের দিকে তরবারি উঁচিয়ে বলল, 'ওরে এই দুষ্টেরা, তোমরা সত্যি কথা বলছ তো? নাকি তোমাদের গুরুর কৌশল খাটাতে এসেছ?'

ভালুক শিষ্যরা তরবারি দেখে একটুও বিচলিত হল না। তারা বুক টান করে বলল, 'হুজুর, আমরা যা বলেছি তা বৃকেশ্বরী দেবীর বাণী। আপনারা ওই উট জাতের অত্যাচারীদের হাত থেকে অবিলম্বে অনুগ্রহ করে আমাদের উদ্ধার করুন। আমাদের কথা বিশ্বাস করুন। আপনারা ওদের মেরে ফেলে আমাদের হাতে ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে দিন। আমাদের গুরুকে ওই সুড়ঙ্গ পাইয়ে দিন।'

'আরে, আগে ওই সুড়ঙ্গ উদ্ধার তো করি, তারপর ভেবে দেখব কার হাতে ওটা তুলে দেওয়া উচিত।' সেনাপতি বলল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিজের সেনাদের বলল, 'শোনো, আমরা নীরবে ভালুক জাতের দুর্গের কাছে যাব। আরে এই উল্লুক ভালুকরা, তোমরা সামনে থাকবে। পথ দেখাবে। আর শোনো, তোমরা যদি কোনোভাবে আমাদের ধোঁকা দিতে চেষ্টা কর তাহলে তোমাদের আস্ত রাখব না। টুকরো টুকরো করে ফেলব।'

ভালুক শিষ্যরা পথ দেখাতে দেখাতে হাঁটছিল। ওদের পিছনে সেনাপতি ও সেনারা হেঁটে আধ ঘণ্টা পরে ওই দুর্গের কাছে পৌঁছাল। সেইসময় সুড়ঙ্গ দুর্গের কাছে কোনো লোক ছিল না। দুর্গের মুখে গাছপালা, কাঁটা গাছের ঝাড় ছড়ানো ছিল। সেনাপতি প্রথমে ঘোড়া থেকে নামল। চারদিকে কঠিন নীরবতা। একটি পাখিও ডাকছে না।

সেনাপতি প্রথমে ঘোড়া থেকে নেমে দুর্গের মুখের কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে ডাকল, 'ওহে সুড়ঙ্গে লুকোনো কাপুরুষের দল! শোনো, আমি বীরপুরের সেনাপতি এসেছি। বহু সেনা নিয়ে এসেছি। দু-তিন মিনিটের মধ্যে তোমরা হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে খালি হাতে সুড়ঙ্গের বাইরে এসো। তা যদি না আসো তাহলে সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকে তোমাদের সবাইকে শেষ করে ফেলব।'

কিন্তু সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ এল না। দু-চার মিনিট অপেক্ষা করে সেনাপতি দাঁতে দাঁত পিষে ঘোড়সওয়ারদের ঘোড়াগুলোকে বেঁধে তার কাছে আসার নির্দেশ দিল। ঘোড়াগুলোকে পাহারা দেবার জন্য লোক বসানো হল। তারপর সেনাপতি ওই দু-জন ভালুক শিষ্যকে বলল, 'ওহে, আমরা এখন সুড়ঙ্গে ঢুকব। তোমরা দু-জন সামনে থাক। পথ দেখাও।'

ভালুক শিষ্যরা রাজি হল। সুড়ঙ্গে ঢুকল। ওদের পেছনে সেনাপতি ও সৈনিকরা গেল। ওদের সকলের সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকে যাবার পর হঠাৎ সুড়ঙ্গের মুখের ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে চার জন ভালুক জাতের সেনা ঝটপট বেরিয়ে এল। ওরা মুহূর্তে বীরপুরের যে দু-

জন সেনা ঘোড়াগুলোকে পাহারা দিচ্ছিল তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বল্লম দিয়ে তাদের মেরে ফেলে ঝোপে ফেলে দিল।

ঠিক সেইসময় জীবদত্ত, সমরবাহু ও গুরু ভালুককে নিয়ে সেখানে এসে বলল, 'দেখ গুরু ভালুক বীরপুরের ওই দুই সেনাকে মেরে ফেলা তোমার শিষ্যদের উচিত হয়নি। ওদের হাত-পা বেঁধে ঝোপে ফেলে রাখলেই পারত।'

'গুরু ভালুক এই কথার কোনো জবাব না দিয়ে শুধু মাথা নাড়ল। সমরবাহু অতগুলো ঘোড়াকে দেখে আনন্দিত হয়ে চিৎকার করে বলল, 'জীবদত্ত, আমাদের এতগুলো ঘোড়া পেয়ে খুব ভালো হল।'

'ঘোড়া পেয়েছ ঠিক তাই বলে ভেব না যে আমরা শত্রুমুক্ত হয়েছি। বুঝলে সমরবাহু, আমাদের এখন সমস্যা হল কী করে বীরপুরের সেনাপতিকে জ্যান্ত ধরা যায়। অবশ্য ওদের ভয় পাইয়ে দেওয়ার একটি উপায় আছে। সুড়ঙ্গের মুখে যে গাছপালা ফেলা আছে তাতে আগুন ধরানো।'

ভালুক জাতের লোক ও সমরবাহুর অনুচররা আরও কাঠ জড়ো করে সুড়ঙ্গের মুখে আগুন ধরিয়ে দেবার আগে জীবদত্ত চিৎকার করে বলল, 'হে বীরপুরের সেনাপতি, তুমি এবং তোমার সেনা হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে দু-তিন মিনিটের মধ্যে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসো। তোমরা বেরিয়ে না এলে রাজা সমরবাহু ও বনবাসী যুবকেরা সুড়ঙ্গে ঢুকে তোমাদের হত্যা করবে।'

বাইশ

বীরপুরের সেনাপতি সেনাদের নিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে শত্রুদের খোঁজ করছিল। এমন সময় শুনতে পেল জীবদত্তের হুঁশিয়ারি। শোনা মাত্রই সে হকচকিয়ে গেল। পরক্ষণেই সে দেখতে পেল সুড়ঙ্গে সে যে পথ দিয়ে ঢুকেছিল সে পথ দিয়ে ধোঁয়া ঢুকছে। সেনাপতি ও তার

সেপাইরা সুড়ঙ্গের প্রত্যেকটি ঘরে ঢুকে ঢুকে দেখল। কিন্তু শত্রুপক্ষের কাউকে তারা দেখতে পেল না। সব মিলিয়ে তিনটি মরা নেকড়ে, কয়েকটা চামড়া ও তরবারি ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখল।

তাজ্জব ব্যাপার। অবাক কাণ্ড। রেগেমেগে সেনাপতি তার সেনাদের হুকুম দিল, বনের ভালুক জাতের যে দুটো যুবক আমাদের হাতে বন্দি হয়েছিল তাদের এক্ষুনি এখানে ধরে নিয়ে এসো। ওরা আমাদের নেকড়েদের সুড়ঙ্গে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

দু-জন সৈনিক গুরু ভালুকের শিষ্য দু-জনকে ধরে সেনাপতির সামনে হাজির করল। সেনাপতি ঝট করে তরবারি বের করে বলল, 'পাজি বদমাইশ কোথাকার, তোমরা আমাদের ধোঁকা দিয়েছ। এখানে আমাদের শত্রু কোথায়? এখনও শেষবারের মতো বলে দিচ্ছি সত্যি কথা বল। তা না হলে এই মুহূর্তে তোমাদের এই তরবারি দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব।'

ভালুকের শিষ্যরা সেনাপতির কথায় একটুও বিচলিত না হয়ে বলল, 'আমরা আমাদের গুরুর নির্দেশ পালন করেছি মাত্র। আর পালন করতে পেরেই আমরা খুশি। এখন মরে গেলেও আমাদের কোনো দুঃখ নেই।' তারপর ওরা সুড়ঙ্গে ঢোকার পথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি শুনতে পাননি? ক্ষত্রিয় যোদ্ধা খড়গবর্মা ও জীবদত্ত আপনাদের হাতের অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বলেছেন। ওদের কথা মতো কাজ না করলে আপনারা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবেন। এই যে, ও সেনাপতি, সম্মান দিয়ে কথা বলছি বলে কানে যাচ্ছে না, না? ধোঁয়া ঢুকছে টের পাচ্ছ না? মরার খুব সাধ, না? এখনও সময় আছে কোন পথে যাবে বেছে নাও। মরার পথে না বাঁচার পথে!'

সেনাপতি ভাবল, ক্ষত্রিয় যুবক আবার কারা? ওদের সম্পর্কে তো কিছু জানা হল না। আগে ওদের সম্পর্কে জেনে নি। ওদের সঙ্গে সমরবাহুর কী ধরনের সম্পর্ক তাও জানা দরকার। কিন্তু এত কথা কায়দা করে জানার সময় কোথায়। ইতিমধ্যে আগুনের হলকা দেখে বীরপুরের সেপাইরা পরস্পরকে ধাক্কা মেরে ছোটাছুটি করতে লাগল। ওদের ছোটাছুটি দেখে সেনাপতি ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে!

বীরপুরের সেনাপতির আর কোনো সন্দেহ রইল না যে সে এক বিরাট বিপদে পড়ে গেছে। সে পরিষ্কার বুঝতে পারল যে বাঁচার একটি মাত্র পথই আছে। আর তা হল হাতের অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করা। তারপর সে নিজের অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিয়ে তার নিজের সেপাইদের নির্দেশ দিল তারাও যেন হাতের অস্ত্র মাটিতে ফেলে দেয়। সেপাইরা তাই করল। সেনাপতি সুড়ঙ্গের মুখে এসে চিৎকার করে বলল, 'হে ক্ষত্রিয়

যোদ্ধাগণ, আমি বীরপুরের সেনাপতি বলছি, আমি এবং আমার সেনারা অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করছি। আপনারা আগুন নিবিয়ে ফেলুন।'

সেনাপতির কথা খড়গবর্মা ও জীবদত্ত শুনতে পেল। ওরা ভালুক জাতের লোককে জ্বলন্ত কাঠ সরিয়ে নেভাতে বলল। ওরা তাড়াতাড়ি জ্বলন্ত কাঠ সরিয়ে নিভিয়ে দূরে ফেলে দিল। তারপর খড়গবর্মা ও জীবদত্ত সুড়ঙ্গের মুখে উঁকি মেরে দেখল। ধোঁয়ায় গোটা সুড়ঙ্গটা ভরে থাকায় ওরা তেমন কিছুই দেখতে পেল না। আরও এগিয়ে ওরা দেখতে পেল বীরপুরের সেনাপতি ও সেনাদের।

'খড়গবর্মা, মনে হচ্ছে সেনাপতি মিথ্যা কথা বলেনি। ওকে ডেকে দেব?' জীবদত্ত বলল।

খড়গবর্মার কোনো জবাব দেবার আগেই গুরু ভালুক তাড়াতাড়ি সেখানে এসে জীবদত্তকে বলল, 'মশাইরা, রাজা আর তার সেবকদের কথায় বিশ্বাস করবেন না। আগে আমার শিষ্যদের ডেকে এনে, ওদের কাছে আসল ব্যাপার জেনে নিন। তারপর যা করার করবেন। সেটাই ভালো হবে।'

'কুটিলদের চাল কুটিলরাই ধরতে পারে।' বলে হাসতে হাসতে জীবদত্ত বলল, 'ঠিক আছে ভালুক, তুমি তোমার শিষ্যদের আগে ডেকে নাও। এখানে আসতে বল ওদের।'

গুরু ভালুক হাতের বল্লমটিকে উপরে তুলে বলল, 'বৃকেশ্বরী মায়ের জয়।' তার চিৎকার যেন সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হল। তারপর সে আবার চিৎকার করে বলল, ওহে শিষ্যগণ, তোমরা আগে উপরে উঠে এসো। বীরপুরের লোককে এখন ওখানেই থাকতে বল।' পরে সে সমরবাহুর দিকে ইশারা করে বলল, 'এ হল আমাদের এখানকার পাহাড়ি দুর্গের মহারাজা সমরবাহুর নির্দেশ।'

নিজেদের গুরুর নির্দেশ পাওয়ামাত্র ভালুক শিষ্য দু-জন সিঁড়ি বেয়ে সুড়ঙ্গের বাইরে চলে এল। এই অবস্থা দেখে বীরপুরের সেনাপতি পরিষ্কার বুঝতে পারল যে সে একজন রাজা, দু-জন ক্ষত্রিয় যুবক ও কয়েক জন ভালুক জাতের লোকের হাতে বন্দি হয়ে গেছে। সে ভীষণ ঘামতে লাগল। তার সমস্ত গা দিয়ে তর তর করে ঘাম ঝরতে লাগল। বার বার ভাবতে লাগল তাদের মধ্যে একজনও যদি চটে যায় তাহলে তার গর্দান যাবে। ভাবতে ভাবতে বীরপুরের সেনাপতির শরীরটা কেমন অবশ হয়ে আসছিল।

ভালুকের শিষ্যরা খড়গবর্মা ও জীবদত্তকে সুড়ঙ্গের ভেতরের অবস্থা সবিস্তারে জানাল। ওরা যে সত্যি সত্যি হাতের অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিয়েছে তা জানতে পারল। সব জেনে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত সেনাপতি প্রভৃতিদের বাইরে আসতে বলল। আর নিজেদের মধ্যে যারা ছিল তাদের অস্ত্র হাতে প্রস্তুত থাকতে বলল।

বীরপুরের সেনাপতি খড়্গবর্মা ও জীবদত্তকে সুড়ঙ্গ থেকে উঠে এসে প্রণাম করতে গেলে বাধা দিয়ে জীবদত্ত সমরবাহুকে দেখিয়ে তাকে বলল, 'ইনি হলেন এই অঞ্চলের রাজা। চন্দ্রবংশের লোক। নাম সমরবাহু। ইনি তোমাদের বুদ্ধি ও সৈন্যবলে পরাজিত করেছেন। এঁর অধীনেই তোমাদের থাকতে হবে। বুঝতে পেরেছ?'

বীরপুরের সেনাপতি মাথা নুইয়ে সমরবাহুকে প্রণাম করল। তাকে অনুসরণ করে অন্য সেপাইরাও সুড়ঙ্গ থেকে উঠে এল। সমরবাহু ওদের সবাইকে একটা ছোট্ট ময়দানে দাঁড়াতে বলে রাজার মতো সদম্ভে সে স্বর্ণাচারিকে জিজ্ঞেস করল, 'মহামন্ত্রী, আমরা এই শত্রুদের কী ধরনের শাস্তি দিতে পারি?'

স্বর্ণাচারি কিছুক্ষণ ভেবে খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের কাছে গিয়ে পরামর্শ করে সমরবাহুকে বলল, 'মহারাজ, এদের কী ধরনের শাস্তি দেব তা নির্ভর করছে বীরপুরের রাজা আমাদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করবেন তার উপর। এখন আমাদের কর্তব্য হবে এদের কোনো শাস্তি না দিয়ে হাতে রাখা। এদের আমরা এখন আমাদের পাহাড়ি দুর্গে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রাখতে পারি।'

'খুব ভালো কথা। তুমি আমাকে চমৎকার পরামর্শ দিয়েছ মহামন্ত্রী।' সমরবাহু খুশি হয়ে স্বর্ণাচারিকে বলল।

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত সমরবাহুর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হয়ে গেল। একজন লুণ্ঠনকারীর মধ্যে অদ্ভুত রকম রাজার ভাবমূর্তি এসে গেছে। রাজার মতোই চলন বলন হয়েছে। এসব বিষয় খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের কাছে মজার ছিল।

খড়্গবর্মা জীবদত্তের কানে কানে বলল, 'ছোটোখাটো একটা অঞ্চল দখল করতে পারলে একজন লুণ্ঠনকারীর মধ্যে যে এতটা পরিবর্তন এত অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা দেবে আমি তা ভাবতে পারিনি।'

'আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগছে। শেষে আমরা দু-জনে আপ্রাণ চেষ্টা করে এক লুণ্ঠনকারীকে রাজা বানাতে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে বীরপুরের রাজা নিশ্চয় আমাদের শক্তি ও বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে গেছে। নিশ্চয় সে ভয় পেয়েছে। কারণ একজন রাজার সেনাপতি যখন ধরা পড়ে তখন রাজার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। পাহাড়ি অঞ্চলের অধিবাসীরা নিশ্চয় এই অবস্থায় রাজাকে সাহায্য করতে আসবে না। এটা নিশ্চিত যে সমরবাহু এই পাহাড়ি দুর্গকে কেন্দ্র করে এখানকার রাজা হিসেবে থেকে যেতে পারবে। আর কোনো বাধা নেই সামনে।' জীবদত্ত বলল।

কিছুক্ষণ পরে সমরবাহু খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের কাছে এসে বলল, 'হে ক্ষত্রিয় যোদ্ধাগণ, আপনাদের পরামর্শ চাই। এখন কি পাহাড়ি দুর্গে যেতে পারি?'

'রাজার আদেশ কেউ অবহেলা করতে পারে? যাওয়া যাক।' জীবদত্ত বলল।

উট ও ঘোড়ায় চড়ে সমরবাহুর কয়েক জন অনুচর সামনে আর কয়েক জন পিছনে চলতে শুরু করল। বীরপুরের বন্দি সেপাইদের মাঝখানে রাখা হল। কয়েকটা উট ও ঘোড়ায় কয়েক জন চড়ল। ওগুলোকে হাঁটাতে হাঁটাতে গুরু ভালুকের লোক গুরুর পিছনে পিছনে যেতে লাগল। সমরবাহু, স্বর্ণাচারি, খড়গবর্মা ও জীবদত্ত সবার সামনে ছিল। সবাই কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ি দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছাল। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখতে পেল একটু উঁচু জায়গায় এক বৃদ্ধকে ঘিরে কয়েক জন এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন তারা তাদের আসার খবর আগে থেকে পেয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

'সমরবাহু, এ কী ব্যাপার? মনে হচ্ছে বীরপুরের রাজা নিজেই তোমার মাথায় মুকুট পরাতে এসেছেন।' জীবদত্ত বলল।

সমরবাহু জীবদত্তকে কী যেন বলতে যাবে এমন সময় বৃদ্ধ এগিয়ে এসে প্রসন্নমুখে তাদের দিকে তাকাল। বৃদ্ধের দু-পশে দু-জন অনুচর ছিল। বৃদ্ধ কাছে এলে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত ভদ্রতাবশত ঘোড়া থেমে নামল।

বৃদ্ধ তাদের দিকে তাকিয়ে শান্তির সংকেত দেখিয়ে বলল, 'আমি বীরপুরের রাজার মন্ত্রী। আমাদের গুপ্তচরদের মাধ্যমে যে বর্ণনা পেয়েছি তা যদি সত্য হয় তাহলে আপনারাই খড়গবর্মা ও জীবদত্ত।'

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত বৃদ্ধকে নমস্কার করল। তারপর জীবদত্ত মন্ত্রীকে বলল, 'মহামন্ত্রী, আমাদের বিষয়ে গুপ্তচরদের মাধ্যমে অনেক খবর পেয়েছেন। আর আমরাও অনেকদিন ধরে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তা এত কষ্ট করছেন কেন? কোন প্রয়োজনে?' বলে জীবদত্ত পিছনের দিকে ঘুরে সমরবাহুকে দেখিয়ে আবার বলল, 'ইনি হলেন এই পাহাড়ি দুর্গের রাজা সমরবাহু আর ইনি এঁর মহামন্ত্রী।'

ওদের নাম শুনে মহামন্ত্রী মুখ কুঁচকে পরমুহূর্তে মুচকি হেসে বলল, 'মাত্র কিছুক্ষণ আগে গুপ্তচরদের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে আপনি অপূর্ব কৌশলে আমাদের সেনাপতি ও সেপাইদের সুড়ঙ্গে আটকে ফেলেছেন। আপনার কাছেই আমি আমার রাজার একটি নির্দেশ নিয়ে এসেছি। আমাদের রাজা আপনাকে এই দুর্গে রাজত্ব করতে সানন্দে বার্তা পাঠিয়েছেন। আমি অবশ্য বিশেষ করে এসেছি এই যুবক দু-জনের কাছে একটি গোপন খবর দিতে। আপনারা অনুগ্রহ করে একটু আড়ালে আসবেন?'

তারপর জীবদত্ত সমরবাহু ও স্বর্ণাচারিকে বলল, 'তোমরা বীরপুরের রাজার মহামন্ত্রীর কথা শুনলে তো? এখন উঠে-পড়ে এই পাহাড়ি অঞ্চলের শাসনকাজে হাত দাও। আমার

ধারণা এখন বীরপুরের সেনাপতি ও সেনাদের ছাড়ার বিষয়ে তোমাদের কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।'

সমরবাহু স্বর্ণাচারির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। স্বর্ণাচারি বীরপুরের মহামন্ত্রীকে বলল, 'মহামন্ত্রী, আপনার রাজা প্রস্তুত হয়ে আর একবার যে আমাদের উপর আক্রমণ করবেন না তার কি কোনো প্রমাণ আছে।'

'আমাদের রাজা আপনার রাজাকে জানাতে বলেছেন যে কোনোদিনই আপনাদের উপর আমাদের পক্ষ থেকে আক্রমণ হবে না। আমাদের রাজা মুখে যা বলেন কাজেও তাই করেন।' বীরপুরের মন্ত্রী বলল।

এই জবাবে সমরবাহু খুব খুশি হল। তার আদেশে বীরপুরের সেনাপতি ও সেপাইরা মুক্ত হল। ওরা আনন্দে হইচই করতে করতে নিজেদের মহামন্ত্রীকে প্রণাম করল। কয়েক জন সমরবাহু ও স্বর্ণাচারির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল।

এত অল্প পরিশ্রমে যে রাজা হয়ে যেতে পারবে তা সমরবাহু কোনোদিন ভাবতেও পারেনি। তাই খুব খুশি হয়ে সে বীরপুরের সেনাদের বলল, 'আজ তোমরা সবাই আমার অতিথি। কাল সকালে তোমরা সবাই যাবে রাজধানীতে।'

তারপর সমরবাহুর অনুচর, ভালুক দলের লোক ও বীরপুরের সেনারা গল্পগুজব করে গাছের নীচে খোশমেজাজে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ওদিকে বীরপুরের মহামন্ত্রী খড়গবর্মা ও জীবদত্তকে সঙ্গে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে তাদের বলল, 'হে বীর যোদ্ধাগণ, আপনাদের বিষয়ে আমি যে শুধু আমার গুপ্তচরদের মাধ্যমেই জেনেছি তাই নয়; কাল রাত্রে এক যক্ষের কাছ থেকে আপনাদের সম্পর্কে আরও অনেক অজানা কথা জেনেছি।'

'যক্ষের কাছ থেকে! কে সেই যক্ষ?' জীবদত্ত অবাক হয়ে খড়গবর্মাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা খড়গবর্মা, এ কি সেই যক্ষ যে পদ্মপুরের রাজকুমারী পদ্মাবতীকে অপহরণ করে পালিয়েছে?'

প্রশ্ন শুনে খড়গবর্মাও বিস্মিত হল। বীরপুরের মহামন্ত্রী ওদের অবস্থা লক্ষ না করে এগিয়ে গেল। একটু এগিয়ে একটি টিলার উপর উঠে দূরে তর্জনী দেখিয়ে বলল, 'বীরগণ ওই যে নদীর বুকে একটি নৌকা দেখা যাচ্ছে, আপনারা সেদিকে তাকান।'

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত সেই নৌকার দিকে তাকাল। শিলারথের আকৃতি তার। এই রথের বিষয়ে শুনেছে ওরা পদ্মপুরে। অরণ্যপুরে দেখেছেও। জীবদত্ত উৎসাহিত হয়ে দণ্ড উঁচিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে এত দিন পরে প্রস্তুত হয়ে এই যক্ষ আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে। ভালোই হল। আমরাও আমাদের শক্তির পরিচয় দিতে পারব।' বলে জীবদত্ত নদীর দিকে এগিয়ে গেল।

তেইশ

খড়গবর্মা, জীবদত্ত ও বীরপুরের মন্ত্রী যখন নদীর তীরে পৌঁছাল তখন রথের আকারের একটি নৌকা তীরের দিকে এগিয়ে এল। তীরের দিকে আসার সময় নৌকাকে দেখে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত বুঝতে পারল যে রথের আকারের ওই নৌকা যক্ষের তৈরি।

জীবদত্ত বীরপুরের মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মহামন্ত্রী, আপনি বলেছিলেন যে এক যক্ষের কাছ থেকে আপনি আমাদের খবর পেয়েছেন। আপনি এই নৌকায় ওই যক্ষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন? ওই যক্ষের সঙ্গে আপনার আলাপ কোথায় হল?'

বীরপুরের মন্ত্রী কিছুক্ষণ দোনামনা করে কী যেন ভেবে বললেন, 'আমি আপনাদের কাছে কোনো কিছু গোপন না করে বিস্তারিতভাবে সব কিছু বলে দিচ্ছি। কাল রাত্রে এক যক্ষ আকাশপথে আমার কাছে এল। রাজমহলে বান্ধবীদের মাঝ থেকে রাজকুমারীকে অপহরণ করে নিয়ে গেল। রাজকুমারী রাজার একমাত্র কন্যা। নাম বসন্তকুমারী। যক্ষ রাজমহলে যে তালপত্র ফেলে গেল তা থেকে জানতে পারলাম যে এই অপহরণের আগে সে মহারাজ পদ্মসেনের একমাত্র কন্যা পদ্মাবতীকেও একইভাবে অপহরণ করেছে।'

মন্ত্রীর কথা শুনে রাগে ক্ষোভে কাঁপতে কাঁপতে জীবদত্ত বলল, 'ওই দুষ্ট যক্ষটা একটা বনে আমাদের কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। সে বলেছিল যে সে রাজা পদ্মসেনের অনুমতিক্রমে তার একমাত্র কন্যা পদ্মাবতীকে বিয়ে করে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা তার কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। এখন আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে এইভাবে অপহরণ করাই তার একটা পেশা অথবা নেশা। কাল পদ্মাবতীকে অপহরণ করল আজ বসন্তকুমারীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, এ তো তাজ্জব ব্যাপার!'

বীরপুরের মন্ত্রী তীরের দিকে এগোতে থাকা নৌকার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জীবদত্ত পদ্মাবতীর বাবা নিজের একমাত্র কন্যাকে হারিয়ে কতখানি কষ্ট পেয়েছেন তা আমি নিজের চোখে দেখিনি কিন্তু বসন্তকুমারীকে হারিয়ে আমার রাজার যে কী পরিমাণ দুঃখ হয়েছে তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। যক্ষের ফেলে যাওয়া তালপাতা থেকে জানতে পারলাম যে আপনারা দু-জনে বিন্ধ্যাচলের কোনো অজানা অঞ্চলেস্থিত শিলারথ সরাতে চলেছেন?'

খড়গবর্মা ঝট করে খাপ থেকে তরবারি বের করে ওই নৌকার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মহামন্ত্রী, আপনি যে শিলারথের উল্লেখ করেছেন আমরা যে সেই শিলারথ ভেঙে ফেলব তাই নয় ওই যক্ষকেও আমরা এই তরবারির আঘাতে শেষ করে ফেলব। আর তারপর অপহৃত রাজকুমারীদের, ওই পদ্মাবতী ও বসন্তকুমারীকে উদ্ধার করে আনব। আর যদি না আনতে পারি তাহলে আমরা ক্ষত্রিয় সন্তান নই।'

ঠিক তখনই হঠাৎ জীবদত্তের মনে একটা প্রশ্ন জাগল। এটা কোন নৌকা? বীরপুরের মন্ত্রী জানল কী করে যে এই নৌকাতে ওই অপহরণকারী যক্ষ আছে? নাকি বীরপুরের রাজা ওই যক্ষকে বন্দি করার জন্য কোনো কৌশল অবলম্বন করেছেন? বন্দি করতে কি রাজা নিজে যথেষ্ট নন? উনি কি এই মন্ত্রীকে পাঠিয়েছেন আমাদের সাহায্যের জন্য?

এইসব প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল জীবদত্তের সামনে। কিছুক্ষণ ভেবে সে বীরপুরের মন্ত্রীকে বলল, 'মহামন্ত্রী, আমি একটি প্রশ্ন করছি। আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনি কী করে জানলেন যে রাজকুমারীদের অপহরণকারী ওই যক্ষ এই নৌকাতেই আছে?'

এই প্রশ্ন শুনে বীরপুরের মন্ত্রী বুঝতে পারল যে তার কথায় খড়গবর্মা ও জীবদত্তের মনে বিশ্বাস জাগেনি। তখন সে নিজের পোশাকের ভিতর থেকে চওড়া তালপাতার পুঁথি বের করে জীবদত্তের হাতে দিয়ে বলল, 'জীবদত্ত, এই পুঁথিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এখানে নৌকায় থাকার কথাও আছে। বিশ্বাস না হয় পড়ে দেখতে পারেন। পড়লে আরও প্রমাণ পাবেন।'

জীবদত্ত তালপাতার পুঁথি নিয়ে পুরোটা পড়ল। পড়ার পর খড়গবর্মার হাতে দিয়ে বীরপুরের মন্ত্রীকে বলল, 'মহামন্ত্রী, আপনার কথা অবিশ্বাস করার আর কোনো কারণ নেই। এই যক্ষ পদ্মপুরে যে তালপাতার পুঁথি ফেলে এসেছিল তার সঙ্গে এই পুঁথির বক্তব্যে মিল আছে। এই নৌকা যে ওই যক্ষেরই তাতে সন্দেহ নেই।'

খড়গবর্মা ওই পুঁথিটাকে দু-বার মনোযোগ দিয়ে পড়ে বলল, 'মহামন্ত্রী, এই পুঁথিটাকে আমরা কি নিজেদের কাছে রাখতে পারি? বিন্ধ্যাচলের যক্ষ পর্বতে গিয়ে ওই যক্ষকে বন্দি

করার কাজে এই পুঁথি আমাদের বিশেষ উপকারে লাগবে বলে আমার ধারণা।'

বীরপুরের মন্ত্রী রাজি হওয়ার মতো মাথা নেড়ো বলল, 'এইতো নৌকাটা তীরে ভিড়ছে। এই পুঁথিতে যক্ষ লিখেছে যে নৌকাচালক তার বন্ধু। সে কোনো চালাকি করছে কি না ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আপনারা দু-জনে খুব সতর্ক থাকুন। আপনাদের দু-জনের মধ্যে যিনি আমাদের রাজকুমারীকে উদ্ধার করবেন তাঁর সঙ্গেই রাজকুমারীর বিয়ে হবে এবং যাঁর সঙ্গে বিয়ে হবে তিনি অর্ধেক রাজত্ব পাবেন।'

এ-কথা শুনে জীবদত্ত হেসে উঠে বলল, 'অনেক আগে আমরা পদ্মসেনের কন্যা পদ্মাবতীকে উদ্ধার করে বিন্ধ্যাচলের শিলারথ ভেঙে ফেলার প্রতিজ্ঞা করেছি। কোনো রাজ্য পাবার আশায় অথবা রাজকুমারীকে বিয়ে করার কথা কোনোদিন ভাবিনি। আগে আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা পালন করব তারপর অন্য চিন্তা করব।'

ইতিমধ্যে ওই নৌকা তীরে এল। বিচিত্র পোশাক পরা যক্ষের মতো একজন নৌকার সামনের দিকে এসে খড়গবর্মা ও জীবদত্তকে ইশারা করে কাছে ডাকল। ইশারা পেয়ে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত বীরপুরের মন্ত্রীকে নিয়ে নদীর তীরে এল।

যক্ষ সকলের দিকে সতর্কতার সঙ্গে তাকিয়ে বলল, 'আপনাদের মধ্যে এমন কোনো মহাবীর কি আছেন যিনি বিন্ধ্যাচলের শিলারথ সরাতে পারেন?'

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত নীরবে হাত তুলল। যক্ষ পরিহাস করার ভঙ্গিতে বলল, 'তাহলে আপনারা নির্ভয়ে আমার সঙ্গে এই নৌকায় উঠতে পারেন। আমার বন্ধু যক্ষ মণিরঞ্জিত যে যক্ষপর্বতে থাকেন সেখানে আমি আপনাদের নিয়ে যাব। উনি যে পদ্মাবতী ও বসন্তকুমারীকে বিয়ে করতে চান সেই রাজকুমারী দু-জনও সেখানেই আছে। চলে আসুন।'

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত তীরে গিয়ে এক লাফে নৌকায় উঠল। নৌকায় উঠে প্রথমেই বিদ্রূপ করে জীবদত্ত বলল, 'মধ্যরাত্রে অসহায় অবস্থায় পেয়ে যে রাজকুমারীদের অপহরণ করেছে, সেই যক্ষ মণিরঞ্জিতের বন্ধু তুমি? কী তোমার নাম?'

'আমার নাম মণিভূষণ। মনে হচ্ছে আমার বন্ধু যক্ষ মণিরঞ্জিতের বিষয়ে আপনারা কিছুই জানেন না। শৌর্যে, বীর্যে ও পরাক্রমে তার মতো শক্তিশালী লোক আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। তিনি মস্তবড়ো তান্ত্রিক। আপনাদের এই ধরনের উপেক্ষার আচরণ যক্ষ মণি কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না। মনে হচ্ছে আপনারা এক বিরাট বিপদে পড়ার ঝুঁকি নিচ্ছেন। এসব না করে যান, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান।'

মণিভূষণের কথা শেষ হতে-না-হতেই জীবদত্ত নিজের হাতের দণ্ড ওই যক্ষের কাঁধে ঠেকাল। মুহূর্তে সে বিদ্যুতের ছোঁয়া পাওয়ার মতো হয়ে গেল। চমকে উঠল কিছুটা ভয়ে,

কিছুটা বিস্ময়ে। তারপর বলল, 'এ তো এক অদ্ভুত জিনিস! মন্ত্র দণ্ড নয় তো? আপনি কি তান্ত্রিক?'

ওর প্রশ্ন শুনে জীবদত্ত হেসে উঠল। নিজের দণ্ড খড়গবর্মার হাতে দিয়ে জীবদত্ত কিছুক্ষণ জপতপ করে যক্ষের ডান দিকের কাঁধে একটি আঙুল ছোঁয়াল। যক্ষ তৎক্ষণাৎ আর্তনাদ করে নীচে পড়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ ওইভাবে পড়ে থেকে আস্তে আস্তে উঠে ধীরে ধীরে বলল, 'আপনারই নাম জীবদত্ত না? আপনার মন্ত্রশক্তি অপূর্ব। আপনাকে পেয়ে আমার বন্ধু খুব খুশি হবে। আপনাদের মধ্যে শত্রুতার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি ইচ্ছা করলে শিলারথ সহজেই নাড়াতে পারেন। আপনাকে শিখিয়ে দেব কীভাবে সরানো বা নড়ানো যায়। তারপরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবেন। শিলারথ সরানোই তো আপনাদের প্রতিজ্ঞা? ঠিক আছে সরিয়ে ফিরে যান। কেমন?'

খড়গবর্মা দাঁতে দাঁত পিষে তরবারি তুলে বলল, 'ওরে এই যক্ষ, বেশি চালাকি করো না। চল, সোজা যক্ষপর্বতে চল। তোমার বন্ধু ওই দুই রাজকুমারীকে যদি ছেড়ে দিয়ে ক্ষমা না চায় তাহলে আমরা তাকে সহজে ছাড়ব না। টুকরো টুকরো করে কেটে তোমার বন্ধুর মাংস বিন্ধ্য অঞ্চলের কাক আর শকুনিদের খাওয়াব। কোনোক্রমেই সে পালাতে পারবে না। আমরা অপহরণের অপরাধ কোনোক্রমেই সহ্য করব না।'

দুটো সাধারণ মানুষের মেজাজ এবং স্পর্ধা দেখে মণিভূষণের ভীষণ রাগ হল। সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'ওহে ওই ক্ষত্রিয় বীরগণ, আমার বন্ধু যক্ষ মণিরঞ্জিত আপনাদের দু-জনকে নিয়ে যেতে বলেছে। আমার কাজ সেরে চলে যাব। রাজকুমারীদের অপহরণ অথবা শিলারথের ব্যাপারে আমি কিচ্ছু জানি না।'

'এতক্ষণে মনে হচ্ছে তোমার দর্প এবং অহংকার দূর হয়েছে। এখন তুমি কিছুটা ভদ্র হয়েছ মনে হচ্ছে। এখন আর দেরি না করে তুমি নৌকাটাকে মাঝদরিয়ায় নিয়ে চল।' জীবদত্ত বলল।

তীরে দাঁড়িয়ে এইসব ঘটনা বীরপুরের মন্ত্রী এতক্ষণ দেখছিল। তাকে জীবদত্ত বলল, 'মহামন্ত্রী, বিদায়। আপনার রাজাকে বলবেন, আমরা বসন্তকুমারীকে উদ্ধার করবই করব। এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা। যক্ষ মণিরঞ্জিতের মাথা কেটে আনব। সেই মাথা আপনাদের রাজা দুর্গের দরজার উপর রাখতে পারবেন। বিদায়।'

নিজের চোখে যা সব দেখল তাতে বীরপুরের মন্ত্রীর পরিষ্কার ধারণা হয়ে গেল যে এই ক্ষত্রিয় যুবকরা যা বলে তা করার মতো ক্ষমতা রাখে। নৌকা মাঝদরিয়ার দিকে এগোতেই মন্ত্রী হাত নেড়ে চিৎকার করে বলল, 'আপনারা যেন অল্পদিনের মধ্যেই কাজে সফল হয়ে ফিরে আসেন। আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হোক। আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকাটা অনেক দূর চলে গেল। খড়গবর্মা ও জীবদত্ত নৌকার চারদিকে ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখছিল আর ভাবছিল।

কিছুক্ষণ নৌকার চারদিক ঘুরে দেখে ওদের ধারণা হল এই নৌকাটা বাতাসেও চলতে পারে। এদিকে মণিভূষণ ভেবেছিল সাধারণ দুটো ক্ষত্রিয় বীরকে নৌকায় চাপিয়ে আনা এমন কিছু কঠিন কাজ হবে না। খুব জোর ওরা খড়গ যুদ্ধ ভালোভাবে করতে পারে। কিন্তু খড়গবর্মা ও জীবদত্তকে দেখে মণিভূষণের সেই ধারণা বদলে গেল। রীতিমতো তাদের হাবভাব দেখে তার ভয় করছিল। এমন সময় জীবদত্ত জানতে চাইল নৌকাটা বাতাসে উড়তে পারে কি না। একই প্রশ্ন খড়গবর্মাও করল। মণিভূষণ ভাবল ওরা তো মন্ত্রতন্ত্র জানে হয়তো সব জেনে গেছে।

খড়গবর্মা ও জীবদত্তের প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ কী যেন আরও ভেবে আমতা আমতা করে মণিভূষণ বলল, 'খড়গবর্মা ও জীবদত্ত, আকাশপথে ঘোরাঘুরি করার জন্য মণিরঞ্জিত যে শিলারথ তৈরি করেছে এটা সেটা নয়। রথাকৃতির কোনো কিছুর প্রতি মণিরঞ্জিতের আকর্ষণ প্রবল। সব কিছুই সে রথের আকৃতিতে বানাতে চায়। এমনকী তার বাড়িটাও রথাকৃতির।'

জীবদত্ত রেগে গিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'তাই নাকি, বিরাট গুণী লোক তাহলে! আমাদের হাতে পড়লে আমরা তাকে রথের আকারের কোনো গাছের সঙ্গেই প্রথমে বেঁধে ফেলব। রথাকৃতি বৃক্ষ কি তোমাদের যক্ষপর্বত অঞ্চলে আছে? না থাকলে মুশকিল!'

যক্ষ মণিভূষণ এই প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। না শোনার ভান করে অন্যদিকে তাকাতে লাগল। তারপর খড়গবর্মা ও জীবদত্ত নদীর দুই তীরের পাহাড় ও গাছপালার দিকে তাকিয়ে আনন্দ পেতে লাগল। অনুমানে বুঝতে পারল যে এই নদীপথে ওরা বিন্ধ্যাচল অঞ্চলে পৌঁছাতে পারবে। মণিভূষণকে প্রশ্ন করে জানতে পারল যে সামনে যে পর্বত দেখা যাচ্ছে সেটাই বিন্ধ্যাচল।

'এই পর্বতাঞ্চলের কোন অংশে যক্ষপর্বত আছে? আমাদের আরও কতদূর যেতে হবে?' জীবদত্ত বলল।

'আরও দশ-বারো ক্রোশ বাকি আছে। তীরে নৌকা ভেড়াতে চাই। খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার নৌকা চালানো যাবে।' মণিভূষণ বলল।

নৌকাতে শুধু ফলমূল ছিল। তীরে ভিড়লে কিছু পাখি অথবা পশু শিকার করা যেত। মণিভূষণের প্রস্তাব জীবদত্তের কাছে ভালোই লাগল।

জীবদত্ত এ বিষয়ে খড়গবর্মার পরামর্শ চাইল। খড়গবর্মা অস্তমান সূর্য ও পাহাড় পর্বতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভালোই হবে। আজকের রাতের খাবার ভালোই জমবে। রাত্রে আমরা এখানেই বিশ্রাম করব। সকালে বিন্ধ্যাচলে যাওয়া যাব।'

তারপর জীবদত্ত মণিভূষণকে বলল, 'তুমি কি খড়গবর্মার কথা শুনতে পেয়েছ? নৌকাটাকে তীরে ভেড়াও। খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়া যাক।'

মণিভূষণ কী যেন ভেবে থেমে থেমে বলল, 'আমার বন্ধু মণিরঞ্জিত আপনাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ে যেতে বলল। আজকের রাতটা এখানে কাটালে অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে।'

মণিভূষণের কথা শুনে কঠোর স্বরে জীবদত্ত বলল, 'এখানে কী করতে হবে না হবে তার নির্দেশ আমরা দেব। আমাদের নির্দেশমতো তোমাকে কাজ করতে হবে। রাজকুমারীদের অপহরণকারী তোমার বন্ধু যক্ষ মণিরঞ্জিত নয়! বুঝেছ? চল, তীরে নৌকাটাকে নিয়ে চল।'

মণিভূষণ নীরবে নৌকাটাকে তীরের দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

চব্বিশ

নৌকা তীরে ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত লাফ দিয়ে তীরে উঠল। মাটিতে নেমে জীবদত্ত মণিভূষণকে বলল, 'নৌকোটাকে তীরের কোনো বটগাছের সঙ্গে বেঁধে দাও। তাতে যেসব ফলমূল আছে প্রয়োজন হলে তুমি খেয়ে নাও। এই ঘন অরণ্যে আমার মনে হচ্ছে হরিণ অথবা বুনো শুয়োর শিকার করে আনা যাবে।'

এই কথা শুনে ভয় পেয়ে যক্ষ মণিভূষণ বলল, 'জীবদত্ত, পাহাড়ের এসব অঞ্চলে বেশি ঘোরাঘুরি করা উচিত নয়। এখানে ভয়ংকর রাক্ষসদের নিবাস।'

'রাক্ষসের চেয়ে মন্ত্রে সিদ্ধ তোমার যক্ষ বেশি ভয়ংকর। আমরা তাকে মোকাবিলা করতে যাচ্ছি। সেক্ষেত্রে এই রাক্ষসগুলোকে ভয় পাব কেন?' বলে জীবদত্ত খড়গবর্মার দিকে ঘুরে বলল, 'খড়গ, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুরে আসছি। তুমি মাটি দিয়ে একটা উনুন বানিয়ে আগুন ধরিয়ে রাখ।'

যেকথা সেই কাজ। এত তাড়াতাড়ি যে জীবদত্ত হরিণ শিকার করে আনবে, তা খড়গও ভাবতে পারেনি। শিকার করা হরিণকে কাঁধে ফেলে সে নৌকোর কাছে এল।

ততক্ষণে কাঠ জোগাড় করে খড়গ আগুন ধরিয়ে রাখল। অল্পক্ষণের মধ্যেই খড়গ ও জীবদত্ত হরিণকে কেটে আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে জমা করতে লাগল। পোড়া মাংসের সুগন্ধে চারদিক ভুর ভুর করছিল। এমন গন্ধ সেই অঞ্চলে এই প্রথম ছড়াচ্ছিল।

ঠিক সেইসময় ভয়ংকর শক্তিশালী রাক্ষসী হুংকার তুলতে তুলতে এগিয়ে আসতে আসতে বলতে লাগল, 'মানুষের গন্ধ, মানুষের গন্ধ!' থপ থপ করে পা ফেলতে ফেলতে রাক্ষসী কাছাকাছি এলে খড়গবর্মা থাপ থেকে তরবারি বের করে তাকে আঘাত করতে যেতেই জীবদত্ত বাধা দিয়ে ওই রাক্ষসীকে বলল, 'তুমি কি সত্যিকারের রাক্ষসী, না রাক্ষসীর রূপধারী যক্ষ? এখানে কি শুধু মানুষের গন্ধ আছে? হরিণের মাংসের গন্ধ নেই? তুমি সেই গন্ধ পাচ্ছ না?'

জীবদত্তের কথা শুনে অবাক হয়ে রাক্ষসী বলল, 'কে তুমি? তুমি যদি মানুষ হতে তাহলে আমাকে দেখে ভয়ে কেঁপে উঠতে, তোমার বুক ধড়াস ধড়াস করত। মনে হচ্ছে তুমি ভয় পাওনি। তাই ঘুরিয়ে অমাকেই প্রশ্ন করছ। তুমি জানো আমি কত বড়ো শক্তিশালী? এত বড়ো সাহস তোমার।'

রাক্ষসী এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে খড়গবর্মা মুহূর্তে তার চুল ধরে ফেলল। তাকে তরবারি দিয়ে মারতে যেতেই জীবদত্ত তার তরবারি ধরে, মন্ত্র দণ্ডকে রাক্ষসীর মাথায় ঠেকিয়ে চাপ দিয়ে বলল, 'এখন বল, আমরা সাধারণ মানুষ না অন্য কিছু?'

রাক্ষসী কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'আজ্ঞে আপনারা মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। আপনারা যক্ষ। আমাকে ছেড়ে দিন। আমার দুই ছেলেকে ইতিমধ্যেই আপনারা ধরে নিয়ে গেছেন যক্ষপর্বতে। আমি বুড়ো হয়ে গেছি। ওই পাহাড়ের পাথর ভেঙে, পাথর সরিয়ে আপনাদের জন্য তাল তাল সোনা আর আমরা তুলতে পারব না।'

ওর কথা শুনে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত হল বিস্মিত। একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল।

জীবদত্ত খড়গবর্মাকে তরবারি খাপে পোরার ইশারা করে রাক্ষসীকে বলল, 'দেখ রাক্ষসী, তোমাকে মেরে ফেলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তুমি যে বলছ, তোমার দুই ছেলেকে যক্ষ ধরে নিয়ে গেছে, সে-কথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমরা তোমার দুই ছেলেকে উদ্ধার করে আনব। ওই যে দেখছ বসে আছে ওই হল যক্ষ। তাই আমাদের গোপন কথা ওর সামনে হওয়া উচিত নয়। তুমি কোথায় থাক? চল তোমার নিবাসে যাই। ওখানেই আমাদের কথা হবে।'

তারপর রাক্ষসী যক্ষ মণিভূষণের দিকে তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো সুরে বলল, 'হে নরগণ, আপনারা আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন। আমাকে আমার পথে যেতে দিন।'

জীবদত্ত রাক্ষসীকে অভয় দিয়ে বলল, 'আমি আর আমার বন্ধু ওই দুরাত্মা যক্ষ যেখানে থাকে সেই যক্ষপর্বতে যাচ্ছি। আমরা তাকে কঠোর শাস্তি দেব। আমার ধারণা যক্ষ ঠিক কোথায় থাকে, কী করে সব তুমি জানো। তাই আমরা চাইছি তোমার আস্তানায় গিয়ে গোপনে সব খবর জানতে।'

যক্ষ মণিভূষণকে দেখার পর থেকে রাক্ষসীর অন্তরাত্মা পালাই পালাই করছিল। জীবদত্তের কথায় তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে বলল, 'হে নরগণ, আপনারা আসুন আমার গুহায়। আমার কর্তাও সেখানে আছেন। যক্ষপর্বতের অনেক খবর উনি আপনাদের দেবেন। অত খবর আমি কোনোদিন জানাতে পারব না। অনেক ভয়ংকর খবর উনি জানেন।'

জীবদত্ত তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে যাওয়ার জন্য রাজি হয়ে খড়গবর্মাকে বলল, 'খড়গ, আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তোমার তরবারি ও আমার এই মন্ত্র দণ্ডের অসীম ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। যক্ষ মণিভূষণ অথবা যক্ষ মণিরঞ্জিত এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করলে তুমি বিনা দ্বিধায় তাদের উপর অস্ত্র প্রয়োগ করবে।'

ওই কথা শুনতে পেয়ে যক্ষ মণিভূষণ আমতা আমতা করে বলল, 'জীবদত্ত, তুমি ওর কথা শুনে যেও না। রাক্ষসদের বিশ্বাস নেই। ওদের চেয়ে নিষ্ঠুর আর কেউ হয় না। ওই রাক্ষসী তোমায় ভালো ভালো কথা বলে গুহায় নিয়ে যাচ্ছে। ওরা ভয়ংকর! ওরা নিষ্ঠুর! ওরা অদ্ভুত! ওরা কিম্ভুত! ওখানে আপনাকে টেনে ছিঁড়ে মহানন্দে খেয়ে ফেলতে পারে।'

জীবদত্ত হাসতে হাসতে বলল, 'তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। আমার বন্ধু খড়গবর্মা রয়েছে। সে একাই যক্ষ মণিভূষণ ও মণিরঞ্জিতকে বধ করে রথ গুঁড়িয়ে দুই রাজকুমারীকে নিয়ে নিরাপদে ফিরতে পারবে।'

জীবদত্তের কথা শুনে মণিভূষণের ভীষণ রাগ হল। কিন্তু রাগপ্রকাশের সাহস তার ছিল না। মাথা নীচু করে ফুলতে লাগল। তার চোখের সামনে রাক্ষসীর পেছনে পেছনে জীবদত্ত দৃপ্ত পদক্ষেপে চলে গেল।

রাক্ষসী জীবদত্তকে নিয়ে চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটি গুহায় পৌঁছাল। গুহার কাছে চিতার মতো আগুন জ্বালিয়ে ওই রাক্ষসীর স্বামী রাক্ষস একটি পাথরের উপর বসেছিল। জীবদত্তকে নিয়ে রাক্ষসীকে আসতে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রাক্ষসীকে বলল, 'কে এই নর? তোমার সঙ্গে নির্ভয়ে একা আসছে?'

রাক্ষসী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে রাক্ষসকে বলল, 'তোমার চোখ-মুখের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তোমার খুব খিদে পেয়েছে। কিন্তু সাবধান, একে কিছু করো না। এর হাতে যে

মন্ত্র দণ্ড আছে তা ভয়ংকর। এ আর এর বন্ধু, দু-জনে মিলে যক্ষদের বন্দি করেছে।'

বউয়ের কথা শুনে রাক্ষস হতবাক হয়ে গেল। মানুষ যে কোনো যক্ষকে বন্দি করতে পারে এ ছিল তার কল্পনার অতীত। সে জীবদত্তের কাছে এসে সবিনয়ে বলল, 'প্রভু, আমার বউ যা বলছে তা যদি সত্য হয়, আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনি বলুন। আমার বউ ভুল বকছে না তো প্রভু? কারণ ওর মাথার একটু গোলমাল আছে। এসব কি সত্য?'
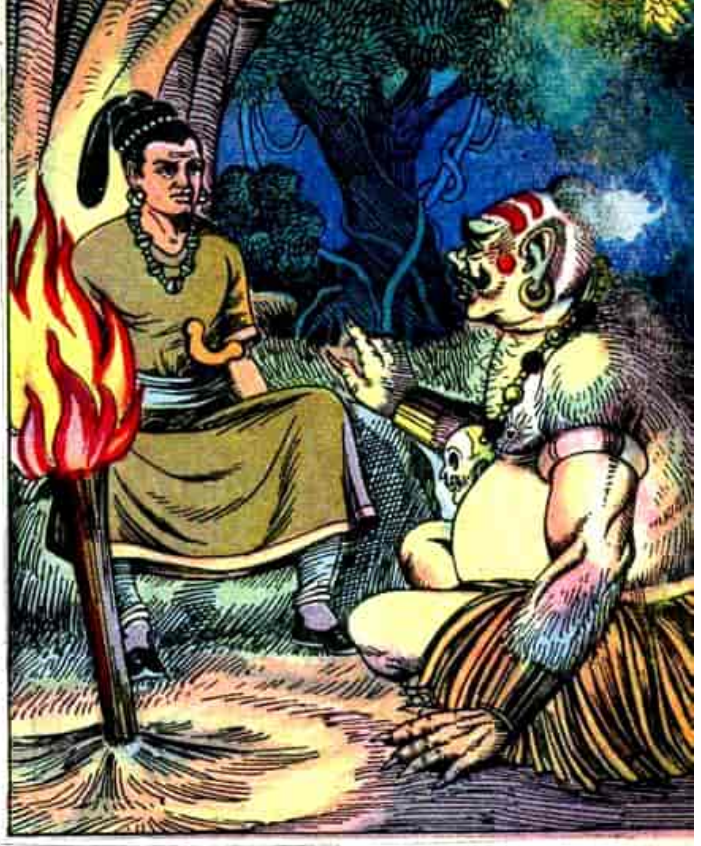
জীবদত্ত একটু হেসে বলল, 'তোমার বউ যা বলছে তা মিথ্যা নয়। ওর কাছেই শুনেছি তোমার ছেলেদের নাকি যক্ষ ধরে নিয়ে যক্ষপর্বতের কোথায় যেন লুকিয়ে রেখেছে। তুমি যক্ষপর্বতের ব্যাপারে কিছু বলতে পার?'

রাক্ষস আপন মনে কিছুক্ষণ মাথা নেড়ে জীবদত্তের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখুন, আপনার মন্ত্র দণ্ডের ক্ষমতা যে অনেক বেশি তা বুঝতে পারছি। তা না হলে আপনি আমার সামনে এসে এভাবে কথা বলতে পারতেন না। যক্ষপর্বতের ব্যাপারে আমি কী বলব? বিশাল বিন্ধ্য পর্বতমালার এই অঞ্চলে যক্ষপর্বত হল একটি ছোট্ট পর্বত। এই পর্বতের অধিপতি হল যক্ষ মণিরঞ্জিত। যক্ষরাজ বহুকাল আগে তাকে এই যক্ষপর্বতের অধিপতি করে দিয়েছিল। তারপর থেকে ও মণিরঞ্জিত করেনি এহেন খারাপ কাজ নেই।'

জীবদত্ত রাক্ষসের কথায় সহানুভূতির সঙ্গে সায় দিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'ও মণিরঞ্জিত যে অত্যন্ত খারাপ প্রকৃতির লোক তা আমরা জানি। আমাদের দেশের দু-জন রাজাকে খুব দুঃখ দিয়েছে। তাদের একমাত্র কন্যাদের অপহরণ করে নিয়ে গেছে। আমরা সে ব্যাপারে যা করার যথাসময়ে করব। এখন আমরা জানতে চাই ওই যক্ষ মণিরঞ্জিত তোমাদের মতো রাক্ষসদের নিয়ে গিয়ে সেখানে কী করে?'

'শোনা কথা বলছি, আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। ওই যক্ষপর্বতে নাকি মণিমাণিক্য আর তাল তাল সোনা আছ। বড়ো বড়ো পাথর কেটে ওইসব মাণিক্য সোনা তোলা খুব

শক্ত কাজ। আমাদের ধরে নিয়ে গিয়ে যক্ষ সেই কাজগুলো করায়। একবার যে তার কবলে পড়েছে তাকে সারাজীবন ওই পাহাড়ের অন্ধকারে রাতদিন পরিশ্রম করতে হচ্ছে। শুধু যে ও রাক্ষসদেরই ধরে নিয়ে গেছে তা নয়, নানা বনের বহু মানুষ তার কবলে পড়ে দিনরাত খেটে মরছে।' বলল ওই বিশালদেহী রাক্ষস।

'তার মানে, একবার যাকে সে ধরেছে, সে যাতে পালাতে না পারে তার সব ব্যবস্থা সতর্কতার সঙ্গে সে করেছে। ভালো কথা, শুনলাম ওখানে নাকি একটা পাথরের রথ আছে?' জীবদত্ত সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

'আমিও শুনেছি। কোনোদিন দেখিনি। আর দেখতে চাইও না।' বলল রাক্ষস।

জীবদত্তের মনে হল তার সমস্ত প্রশ্নের জবাব সে পেয়েছে। পরের মুখে শুনে রাক্ষসের যে ধারণা হয়েছে তাই সে জানিয়েছে। বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলেনি। জীবদত্ত ঠিক করল এবার ফিরে যাবে খড়গবর্মা ও মণিভূষণের কাছে। রাক্ষসীকে সে বলল, 'তুমি যে মানুষের গন্ধ মানুষের গন্ধ বলে ছুটতে ছুটতে এলে তাতে আমার ভালোই হল। আমার সঙ্গে এসো। ওখানে অনেক হরিণের পোড়া মাংস আছে। তোমার যত দরকার নিয়ে এসো।'

ওর কথা শুনে রাক্ষসীর খুব ভালো লাগল। সে রাক্ষসকে ফিসফিস করে কী যেন বলল। রাক্ষস জীবদত্তকে বলল, 'প্রভু, আপনার সাহস দেখে মনে হচ্ছে আপনারা মণিরঞ্জিতকে বধ করতে পারবেন। বধ করে দয়া করে আপনারা আমার দুই ছেলেকে উদ্ধার করে আমাদের কাছে পৌঁছে দিন।'

জীবদত্ত এগোতে এগোতে রাক্ষসকে বলল, 'দেখ রাক্ষস, তোমার নাম আমি জানি না। তবে এটুকু জেনে রেখো, আমরা যদি মণিরঞ্জিতকে জব্দ করতে পারি, তাহলে শুধু তোমার ছেলেরাই নয় সবাই সেখান থেকে মুক্তি পাবে।'

'আজ্ঞে আমার নাম চণ্ডমুখ। ভুলে যাবেন না।' বলল রাক্ষস।

দূর থেকে জীবদত্তের সঙ্গে রাক্ষসীকে আসতে দেখে ভীষণভাবে ঘাবড়ে গিয়ে মণিভূষণ খড়গবর্মাকে বলল, 'একি আপনার বন্ধু ওই রাক্ষসীকে নিয়ে আসছে কেন?'

'বলা যায় না হয়তো রাক্ষস রাক্ষসীদের খেয়ে ফেলার জন্য জীবদত্ত তোমাকে তাদের হাতে তুলে দেবে।' খড়গবর্মা মজা করার জন্য বলল।

'এটা কিন্তু খুব অন্যায় হবে। আমি কত বার বলেছি মণিরঞ্জিত আমার বন্ধু নয়, আমার প্রভু। ওর আজ্ঞা পালন করা ছাড়া আমি কারও কোনো ক্ষতি করিনি।' মণিভূষণ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কাকুতিমিনতি করে বলল।

ওই কথা কানে যেতেই জীবদত্ত রেগে গিয়ে বলল, 'ওহে মণিভূষণ, এখনি অত ঘাবড়ে যেও না। এই রাক্ষসীর স্বামীর কাছে তোমাদের যক্ষপর্বতের অনেক রহস্য জানতে

পেরেছি। তোমাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে। আজ আমি ও খড়গবর্মা তোমার প্রভু মণিরঞ্জিতকে যদি পরাজিত করতে না পারি তাহলেও বেশিদিন আর তোমাদের বাঁচতে হবে না। জেনে রেখো, যোগ্য নেতৃত্বে বিরাট এক রাক্ষসের সেনাবাহিনী যেকোনো মুহূর্তে যক্ষপর্বত আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। যেকোনো সময় ওরা তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

'রাক্ষসবাহিনী!' মণিভূষণ ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, রাক্ষসবাহিনী। ভুলে যেও না। ওরা সব প্রস্তুত।' বলে জীবদত্ত রাক্ষসীকে বলল, 'এখান থেকে হরিণের মাংস তোমার যত ইচ্ছে নিয়ে যাও। তোমাদের রাক্ষস সেনানায়ককে বল বাহিনীকে প্রস্তুত রাখতে। খবর পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে যেন সে ওইসব পথ দিয়ে চলে আসে।'

রাক্ষসী কিছু বুঝুক না বুঝুক মাথা নেড়ে হরিণের মাংস নিয়ে চলে গেল। তারপর খড়গ, জীবদত্ত, মণিভূষণ খাওয়া-দাওয়া সেরে একটি গাছের নীচে পাথরের উপর শুয়ে পড়ল। শোয়ার সময় মণিভূষণ ওই নৌকার দিকে মুখ রেখে বার বার তার দিকে তাকাতে লাগল। তখন জীবদত্ত আস্তে আস্তে খড়গবর্মাকে বলতে লাগল, 'মনে হচ্ছে এই যক্ষটা আমাদের ভীষণ ভয় পেয়েছে। মাঝরাত্রে সুযোগ বুঝে নৌকোয় করে ব্যাটা পালানোর চেষ্টা করবে। একটু সতর্ক থাকতে হবে আমাদের।'

ঠিক একই ধরনের সন্দেহ খড়গবর্মার মনেও জেগেছিল। খড়গবর্মা ও জীবদত্ত পালা করে ঘুমোতে লাগল। হরিণের মাংসের গন্ধে গভীর রাত্রে কয়েকটা জীবজন্তু সেখানে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। ওরা মণিভূষণের দিকে এগোতে থাকলে খড়গ ঢিল ছুড়ে ওদের তাড়িয়ে দিল। সেই শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে, মণিভূষণ ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, খড়গবর্মা, জীবদত্ত আপনারা উঠুন, রাক্ষসের বাহিনী এদিকে ছুটে আসছে।'

পঁচিশ

মণিভূষণের আর্তনাদ শুনে জীবদত্ত উঠে পড়ল। খড়গবর্মার ঘুম ভেঙে গেল। সে মণিভূষণকে অভয় দিয়ে বলল, 'মণিভূষণ তোমার আর কোনো ভয়ের কারণ নেই। ওদের বাহিনীর দু-জন রাক্ষস এসেছিল বটে, তবে আমি ওদের জানিয়ে দিয়েছি যে তুমি যক্ষ মণিরঞ্জিত নও, তুমি তার সামান্য চাকর। আমার কথা শুনে ওরা চলে গেছে।'

কিন্তু তার পরেও মণিভূষণের সে রাত্রে আর ঘুম হল না। সকাল পর্যন্ত ভয়ে তার চোখ খোলা ছিল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত উঠে পড়ল। সবাই সকালের কাজকর্ম সেরে ফিরে এল সেই রথাকৃতি নৌকার কাছে।

নৌকা চালাতে লাগল মণিভূষণ। আধ ঘণ্টা পরে নৌকা নদীর এক তীরে ভিড়ল। সেইখান থেকে একটি খাল বেরিয়েছিল। সেই খালে নৌকাটা ঢুকল। কিছুক্ষণ পরে মণিভূষণ খালের ধারে নৌকা ভিড়িয়ে সামনের দিকে দেখিয়ে বলল, 'এই হল যক্ষপর্বত। এখন আপনারা নামতে পারেন। আরে! এই তো আমার প্রভু মণিরঞ্জিত। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে স্বয়ং মণিরঞ্জিত এসে গেছেন। ওইতো ওখানে দাঁড়িয়ে।' খড়গবর্মা ও জীবদত্ত নৌকা থেকে নীচে নামল। পাহাড়ের দিকে মাথা তুলে তাকাল। পাহাড়ের উঁচু-নীচু অংশের একটিতে এক যক্ষ হাতে এক গদা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওই যক্ষ একদৃষ্টিতে খড়গবর্মা ও জীবদত্তের দিকে তাকাচ্ছিল। মণিভূষণ পথ দেখাতে দেখাতে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাকে অনুসরণ করছিল খড়গবর্মা ও জীবদত্ত।

পাহাড়ে উঠতে উঠতে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত উপরের দিকে তাকাচ্ছিল। যাদের দূর থেকে দেখেছিল, তারা কাছে এলে তাদের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওই যক্ষ মণিরঞ্জিত বলল, 'খড়গবর্মা ও জীবদত্ত আপনাদের সাহসের বলিহারি। সাহস ভালো কিন্তু দুঃসাহস ভালো নয়। আপনাদের পাখনা গজিয়েছে মনে হচ্ছে। যাক যারা দুঃসাহসী তাদের কাছে এসব কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।'

জীবদত্ত মণিরঞ্জিতের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত তাকিয়ে হাসতে হাসতে তাকে বলল, 'মণিরঞ্জিত, তুমি খুব ভালো ফাঁদ পেতেছ। রাজকুমারী পদ্মাবতীর মনে একটা বিশ্বাস এনেছিলে। সেটা হল এখানকার পাথরের রথ যে নাড়াতে পারে সে একজন মহাবীর। সেই রথ নাড়াতে যারা আসে তাকে মেরে ফেল। তোমার এই ফাঁদ আজ তোমার গলার ফাঁস হয়েছে। কই দেখি সেই অপহরণ করে আনা রাজকুমারীদের? কাথায় রেখেছ? পদ্মাবতী ও বসন্তকুমারী কোথায়? আর ওই পাথরের রথটাই বা কোথায়?'

ওর কথা শুনে রেগে গিয়ে মণিরঞ্জিত গদা তুলে মারতে যেতেই খড়গবর্মা তরবারি ধরে বলল, 'মণিরঞ্জিত, এখনই আমাদের মেরে ফেলতে যাচ্ছ কেন? আমরা যদি ওই রথ নড়াতে না পারি তখন আমাদের মেরে ফেলো। বসন্তকুমারীর যে তোমার সম্পর্কে কি মত জানি না তবে পদ্মাবতী যে তোমাকে মহাবীর মনে করে, সে যে তোমাকেই বিয়ে করবে সে ব্যাপারে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই। তাই বলছিলাম আগে চল, দেখাও পাথরের ওই রথ কোথায় আছে। তারপর যা হয় হবে।'

মণিরঞ্জিতের রাগের আগুনে যেন ঘি পড়ল। কিন্তু তার কিছু বলার আগেই মণিভূষণ তাকে বলল, 'তাহাহুড়ো করো না মণিরঞ্জিত। এই যুবকদের আগে পাথরের রথের কাছে নিয়ে যাও।'

মণিরঞ্জিত একটু দমে গেল। এগিয়ে যেতে লাগল। তাকে অনুসরণ করল সবাই। কিছুক্ষণ পরে ওরা এক সমতল জায়গায় পৌঁছাল। সেই অংশের নীচের দিকে বহু ফুল আর ফলের গাছ।

সেই ফুল বাগানের মাঝে কাছাকাছি পাশাপাশি রথাকৃতি দুটো অট্টালিকা আছে। ওই দুটোর একটির ছাদে দাঁড়িয়ে পদ্মাবতী ও বসন্তকুমারী খড়গবর্মা ও জীবদত্তের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। জীবদত্ত ওদের দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মণিরঞ্জিত, ওরাই কি তোমার অপহরণ করে আনা পদ্মাবতী ও বসন্তকুমারী?'

'হ্যাঁ, ওরা আপনাদের শৌর্য ও বীরত্ব দেখার জন্য ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।' বলে অন্যদিকে দেখিয়ে মণিরঞ্জিত বলল, 'এই তো, ওটাই পাথরের রথ।' দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে সে বলল।

কাছেই একটা কুড়ি ফুট উঁচু পাথরের রথ ছিল। সেই রথের নীচ থেকে পাহাড় উঁচু-নীচু ঢেউ খেলিয়ে নীচে নেমে গেছে। খড়গবর্মা ও জীবদত্ত ওই রথের দিকে এগিয়ে যেতেই মণিরঞ্জিত পিছনের দিকে না তাকিয়েই 'মণিভূষণ' বলে ডাকল। কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে পিছনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখে সেখানে মণিভূষণ নেই। চারদিক তাকাল কিন্তু তাকে কোথাও দেখতে পেল না।

এভাবে কোনোদিন না বলে তার বন্ধু মণিভূষণ কোথাও যায়নি। তাই মণিভূষণকে দেখতে না পেয়ে সে মনে মনে খুব বিরক্ত হল। এই প্রথম এই ধরনের ঘটনা ঘটায় সে অবাক হল। কিছুক্ষণ ভেবেও তার এভাবে চলে যাওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পেল না মণিরঞ্জিত।

ইতিমধ্যে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত রথের চারদিকে ঘুরে ঘুরে ভালো করে দেখে নিল। জীবদত্ত নুয়ে রথের নীচের দিকটা দেখিয়ে খড়গবর্মাকে বলল, 'দেখ খড়গ, নীচের দিকটা ভালো করে তাকিয়ে দেখ। এই রথ, পাহাড় কেটে তৈরি হয়নি। পাহাড়ের উপরকার আলাদা একটা পাথর

কেটে এই রথটাকে তৈরি করা হয়েছে। রথের নীচে একটু লক্ষ করে দেখ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। কান খাড়া করে শোনো মনে হচ্ছে যেন এর নীচে মানুষ আছে। তাদের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। শুনতে পাচ্ছ?'

জীবদত্তের কথা কানে যেতেই তেলেবেগুনে চটে গিয়ে মণিরঞ্জিত বলল, 'তাই নাকি? বাঃ তাহলে তো খুব দেখতে পাচ্ছেন! রথের নীচে আলো আসবে কোত্থেকে? মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে কেন? এখানে মানুষ আসবে কোত্থেকে? যা অসম্ভব তাই বলছেন।'

'অসম্ভব হতে যাবে কেন? পাহাড়ের নীচে থেকে যেসব মানুষগুলো খুঁড়ে খুঁড়ে সোনা মণিমুক্তোগুলো তুলছে তাদের তুমি ক্রীতদাস বানিয়ে রাখলেও তারা তো মানুষ। ওরা তো নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। ওরা তো মূক নয়?' ততোধিক রাগান্বিত স্বরে জীবদত্ত বলল।

মণিরঞ্জিত কিছুক্ষণ ভেবে পেল না কী করবে, কী বলবে। পরে সে বলল, 'এসব কথা কে বলেছে? মণিভূষণ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাহলে আমার সঙ্গে? মণিভূষণ বলেছে?' রাগে ফেটে পড়ে মণিরঞ্জিত জিজ্ঞেস করল।

'না না, ও বেচারি কিছু বলেনি। ও তোমার চাকর তো বটেই বন্ধুও। সে আমাদের কাছে এমন কোনো কথা বলেনি যাতে আমরা এই রথ সম্পর্কে কিছু জানতে পারি। আমি আমার দিব্যদৃষ্টিতে এই যক্ষপর্বত ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি।' জীবদত্ত হাসতে হাসতে বলল।

মণিরঞ্জিত ভেতরে ভেতরে রেগে গেলেও বাইরে তা প্রকাশ না করে বলল, 'জীবদত্ত কথা বাড়িয়ে তো লাভ নেই? পাথরের রথ সরানোর কথা, সরানোর চেষ্টা করে দেখতে পার। তোমাদের ক্ষমতা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে পদ্মাবতী ও বসন্তকুমারী দাঁড়িয়ে আছে।'

জীবদত্ত খড়গবর্মাকে চোখের ইশারা করে বলল, 'ওই যে রাজকুমারীরা দাঁড়িয়ে আছে ওই অট্টালিকার পাশের অট্টালিকায় তুমি থাক না মণিরঞ্জিত?'

'হ্যাঁ, ওখানেই আমি থাকি। কিন্তু এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কারণটা কী? প্রয়োজনটাই বা কী?' মণিরঞ্জিত জিজ্ঞেস করল।

'কারণ আছে বই কী। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওই ভবনটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আর তুমি তা নিজের চোখেই দেখতে পাবে।' বলে জীবদত্ত কিছুক্ষণ মন্ত্র পাঠ করে ওই মন্ত্র দণ্ড পাথরের রথের উপর রেখে চাপ দিয়ে রথের গায়ে কষে এক লাথি মারল। মুহূর্তে পাহাড় ফেটে যাওয়ার ভয়ংকর এক প্রচণ্ড শব্দ হল।

চোখের পলকে ওই রথ উড়ে গিয়ে মণিরঞ্জিতের অট্টালিকায় আছড়ে পড়ল। পরক্ষণে দেখা গেল ওই বিরাট অট্টালিকা এবং পাথরের রথ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ধুলো হয়ে গেল। চোখের পলকে যা ঘটে গেল তা দেখে মণিরঞ্জিত পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখে কথা নেই, চোখে ভাষা নেই। তারপর হঠাৎ সে তার গদা তুলে জীবদত্তকে আক্রমণ করতে গেল।

কিন্তু সে তা পারল না। তার নাকের ডগায় খড়গবর্মা তরবারি মেলে ধরল।

এই দৃশ্য দেখে আনন্দ আর চাপতে না পেরে জীবদত্ত হো-হো করে হেসে গন্ধর্ব বসুমতীর দেওয়া কাঁসার পাত্রটি জোরে বাজাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই যেখানে পাথরের রথ ছিল, তার নীচ থেকে বহু রাক্ষস এবং গন্ধর্বেরা দলে দলে বেরিয়ে এসে আর্তনাদ করতে লাগল। ওরা প্রত্যেকে আরও ভয়ংকর কিছু ঘটে যাবে ভেবে আশঙ্কা প্রকাশ করতে লাগল।

জীবদত্ত ওদের শান্ত হতে বলে ঘোষণা করল, 'এখন থেকে আপনারা প্রত্যেকে মুক্ত। যে যেখানে খুশি যেতে পারেন।' তারপর ওই কাঁসার পাত্রটি উপরের দিকে তুলে বলল, 'এই পাত্র আমার দেশের এক গন্ধর্ব, তাঁর নাম বসুমতী, আমাকে দিয়েছেন। আপনাদের মধ্যে যদি কেউ গন্ধর্ব থাকেন তিনি এই পাত্র সানন্দে নিতে পারেন।'

ওদের মধ্য থেকে একজন গন্ধর্ব এগিয়ে এসে ওই পাত্রটি নিল। তারপর রাক্ষস ও গন্ধর্বদের জীবদত্ত কী যেন গোপনে বলতে যাবে এমন সময় সে 'মাগো' বলে চিৎকার শুনতে পেল। সেটা ছিল মণিরঞ্জিতের আর্তনাদ। জীবদত্ত মুখ ঘুরিয়ে দেখল খড়গবর্মার আঘাতে নীচে পড়ে গিয়ে মণিরঞ্জিত ছটফট করছে। খড়গবর্মা তার বুকে পা রেখে গলায় তরবারি ছুঁইয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল।

সেই দৃশ্য দেখে জীবদত্তের ভীষণ আনন্দ হল। খড়গবর্মা জীবদত্তকে বলল, 'জীবদত্ত, এই দুরাত্মাকে কী করব? মেরে ফেলব না ছেড়ে দেব? এই পাপীটা পদ্মাবতী ও বসন্তকুমারীকে হরণ করেছে। ওদের আত্মীয়স্বজনদের দুঃখ দিয়েছে। অসংখ্য মানুষ ও রাক্ষসদের ধরে এনে ক্রীতদাস বানিয়েছে। তাড়াতাড়ি বল কী করব?'

ইতিমধ্যে সেখানে পদ্মাবতী ও বসন্তকুমারী এসে গেল। রক্তচক্ষু করে বসন্তকুমারী মণিরঞ্জিতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এই নীচ পাপী যক্ষকে যে হত্যা করবে তাকেই আমি বিয়ে করব। একে বধ করা নিজের চোখে দেখে চোখ জুড়াতে চাই। একে হত্যা না করলে আমাকে সারাজীবন কুমারী জীবনযাপন করতে হবে।'

খড়গবর্মা অপরূপ সুন্দরী বসন্তকুমারীর রূপে মুগ্ধ হল। মনে মনে সে ভাবল তাকে স্ত্রী হিসাবে পেতে হলে মণিরঞ্জিতকে হত্যা করতেই হবে। ও তাকে হত্যা করতে যাবে এমন

সময় আকাশ থেকে ধ্বনি শোনা গেল, 'থামুন'! পরক্ষণেই আকাশ থেকে নেমে এল হংসাকৃতির অপূর্ব সুন্দর একটি বিমান। সেই বিমান থেকে যক্ষরাজ ও মণিভূষণ নেমে এল। যক্ষরাজ সকলের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'খড়গবর্মা, জীবদত্ত, আপনারা যে মহান বীর, সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। যেসব ঘটনা এবং দুর্ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে আমি বিস্তারিতভাবে মণিভূষণের কাছে শুনেছি।

'মণিরঞ্জিতকে এখন আর মেরে ফেলার প্রয়োজন নেই, কারণ সে এখন জীবন্মৃত। যক্ষকুলের এই কুলাঙ্গারের আর কোনো ক্ষমতা নেই। একে ছেড়ে দিন।' যক্ষরাজ বলল।

'বীরপুরের রাজকুমারীর প্রতিজ্ঞার কথা কি আপনি জানেন না? তার জীবনের কী হবে? খড়গবর্মা বসন্তকুমারীর দিকে একবার তাকিয়ে বলল।

বসন্তকুমারী সলজ্জভাবে পদ্মাবতীর পেছনে দাঁড়াল। যক্ষরাজ হাসিমুখে বলল, 'মৃত্যুর চেয়ে জীবন্মৃত থাকা আরও বড়ো শাস্তি। তাই বসন্তকুমারীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কোনো আশঙ্কা নেই। পাথরের রথ সরিয়ে যিনি বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তারজন্য জীবদত্তের সঙ্গে পদ্মাবতীর ও মণিরঞ্জিতকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়ার জন্য খড়গবর্মার সঙ্গে বসন্তকুমারীর বিয়ে হবে।'

তৎক্ষণাৎ মণিভূষণ চারটি মালা বিমান থেকে এনে খড়গবর্মা, জীবদত্ত, পদ্মাবতী ও বসন্তকুমারীর হাতে একটি করে দিল। যক্ষরাজের নেতৃত্বে ওদের মালাবদলের মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠান হল। যারা কিছুক্ষণ আগেও ক্রীতদাস ছিল তারা সবাই আনন্দে হর্ষধ্বনি করতে লাগল।

যক্ষরাজ, খড়গবর্মা, জীবদত্ত ও তাদের স্ত্রীদের বিমানে উঠে বসতে বলে সানন্দে বলল, 'খড়গবর্মা ও জীবদত্ত, এই বিমানে বসে আপনারা যেখানে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করবেন সেখানেই এই বিমান আপনাদের নিয়ে যাবে। আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।'

'আপনার এই উপকারের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, যক্ষরাজ।' খড়গবর্মা ও জীবদত্ত সানন্দে বলল।

'আর একটি কথা, এই বিমান আপনাদের কাছে এক মাস থাকবে। তারপর আপনা থেকেই বিমানটি আমার কাছে চলে আসবে। বিদায়।' যক্ষরাজ বলল।

সবাই যক্ষরাজকে নমস্কার করল। পরক্ষণেই বিমান বায়ুবেগে পদ্মপুর ও বীরপুরের দিকে ধাবিত হল।

মায়া সরোবর

অনেককাল আগে অমরাবতী নগরের রাজসভায় কুলশেখর নামে এক রাজ কর্মচারী ছিল। তার একটি মাত্র ছেলে ছিল। নাম জয়শীল। বাচ্চা বয়স থেকেই জয়শীলকে আদরযত্নে লালনপালন করত। এইভাবে জয়শীল বাড়তে লাগল। জয়শীলের বয়স যখন কুড়ি তখন সে ছিল যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ। ক্ষত্রিয়দের যত রকমের যুদ্ধবিদ্যা জানা উচিত ওই বয়সেই তার সেসব জানা হয়ে গিয়েছিল। কুলশেখর বৃদ্ধ হল।

বৃদ্ধ বয়সে ছেলের কথা সে বেশি করে ভাবছিল। ছেলেকে একদিন রাজসভায় নিয়ে গিয়ে রাজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভেবেছিল কুলশেখর। রাজা যাতে ছেলের জন্য একটি চাকরি দেয় তার অনুরোধও। করবে ভেবেছিল। কিন্তু কুলশেখরের মনের কথা মনেই রয়ে গেল। হঠাৎ অসুখে পড়ে যাওয়ায় তার আর ছেলেকে নিয়ে রাজসভায় যাওয়া হল না। তার অসুখ আর সারল না। কিছুদিনের মধ্যেই মারা গেল।

জয়শীল এখন একা। মাকে হারিয়েছে বাচ্চা বয়সে। বাপকে হারাল সেদিন। জগতে আপনজন বলতে তার আর কেউ রইল না। বন্ধু যারা ছিল তারাও অত ভালো ছিল না। ওদের ঠিক বন্ধু বলা চলে না। জীবনের ঠিক এমন সময় জয়শীলের কিছু উটকো বন্ধু জুটে গেল। ওদের পাল্লায় পড়ে বাপের রেখে যাওয়া সম্পত্তি কিছুদিনের মধ্যেই জয়শীল খরচ করে ফেলল।

বাপ মারা যাওয়ার চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই সমস্ত সম্পত্তি খরচ হয়ে গেল। এমন দিন এল যে টানা তিন দিন জয়শীল দু-মুঠো খেতে পেল না। এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাওয়ায় সে ভেবে পেল না কী করবে। কারও কাছে হাত পাততে তার লজ্জা করল। দয়া করে গোপনে যারা কিছু এনে ওকে দিত সে তাই খেত। জয়শীলের এক বন্ধু ছিল। একটু অন্য ধরনের। তার এই বিপদের দিনে এগিয়ে এসে দুটি ভালো কথা বলল। এই বন্ধুটির নাম দেবশর্মা।

পেটে যখন আগুন জ্বলে কোনো বন্ধুর কথাই কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করে না। সে বিরক্ত হয়ে বলল, 'দেবশর্মা, তুমি যেসব উপদেশ দিচ্ছ, সেসব আমি জানি না তা নয়, তবে আমার এখন কিছুই ভালো লাগছে না। আমাকে একা মরতে দাও।'

জবাবে দেবশর্মা হেসে বলল, 'জয়শীল, তুমি যদি সত্যি জানতে তাহলে হাতেনাতেও কিছু করতে। কিছুই জানো না তাই দুঃখ ভোগ করছ। তোমার মধ্যে যে গুণাবলি রয়েছে

সেগুলো যদি একটু প্রয়োগ কর তাহলে তোমার পক্ষে বাঁচা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।'

জয়শীল কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল। মনে হল, কী যেন ভাবছে। পরে মাথা নেড়ে বলল, 'দেবশর্মা, বিপদের দিনে দেখছি তুমিই প্রকৃত বন্ধু। তবে নতুনভাবে বাঁচতে হলে নতুন পরিবেশ চাই। এখানে এই দেশে পড়ে থাকলে কোনোদিন আমি বড়ো হতে পারব না। তুমি কি বল ?'

দেবশর্মা ও জয়শীলের মধ্যে এই কথা হচ্ছিল জুয়োখেলার ঘরে।

জয়শীলের কথার জবাবে দেবশর্মা কী যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় জুয়োর ঘরের সামনে কোলাহল শোনা গেল। ওরা বেরোতে গিয়ে বাধা পেল। রাজার অশ্ববাহিনীর নায়ক চাবুক দিয়ে জুয়োর ঘর থেকে যারা বেরুচ্ছিল তাদের মারছিল। অশ্ববাহিনীর নায়কের নাম কৃপাণজিৎ।

জয়শীল কৃপাণজিতের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেখুন যাকে-তাকে মারবেন না। অন্যায়, অনুচিত।'

'কোনটা উচিত আর কোনটা অনুচিত আমাকে শিখতে হবে এক জুয়াড়ির কাছে?' বলেই কৃপাণজিৎ জয়শীলের পিঠে চাবুক মারতে লাগল।

জয়শীল তৎক্ষণাৎ হাতের কাছে যে লাঠি পেল সেই লাঠি দিয়ে কৃপাণজিতের মাথায় সজোরে আঘাত করল। আর্তনাদ করে উঠে কৃপাণজিৎ তরবারি বের করল। আঘাত করার আগেই জয়শীল কপাণজিতের কোমরে আঘাত করল।

সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে ঝট করে ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যেতে গেল। এসব দেখে জুয়োর ঘরের অন্য লোকেরা অবাক হল এবং সাহস পেল। কৃপাণজিতের সঙ্গে যারা এসেছিল ওরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কৃপাণজিতের ঘোড়ায় চড়ার সঙ্গে সঙ্গে জয়শীল একলাফে তার পেছনে উঠল। কৃপাণজিতকেই পর্যদস্ত করতে লাগল জয়শীল। ঘোড়ার উপর দুজনের টানাহ্যাঁচড়া, ঘুষোঘুষি মারামারি চলতে লাগল।
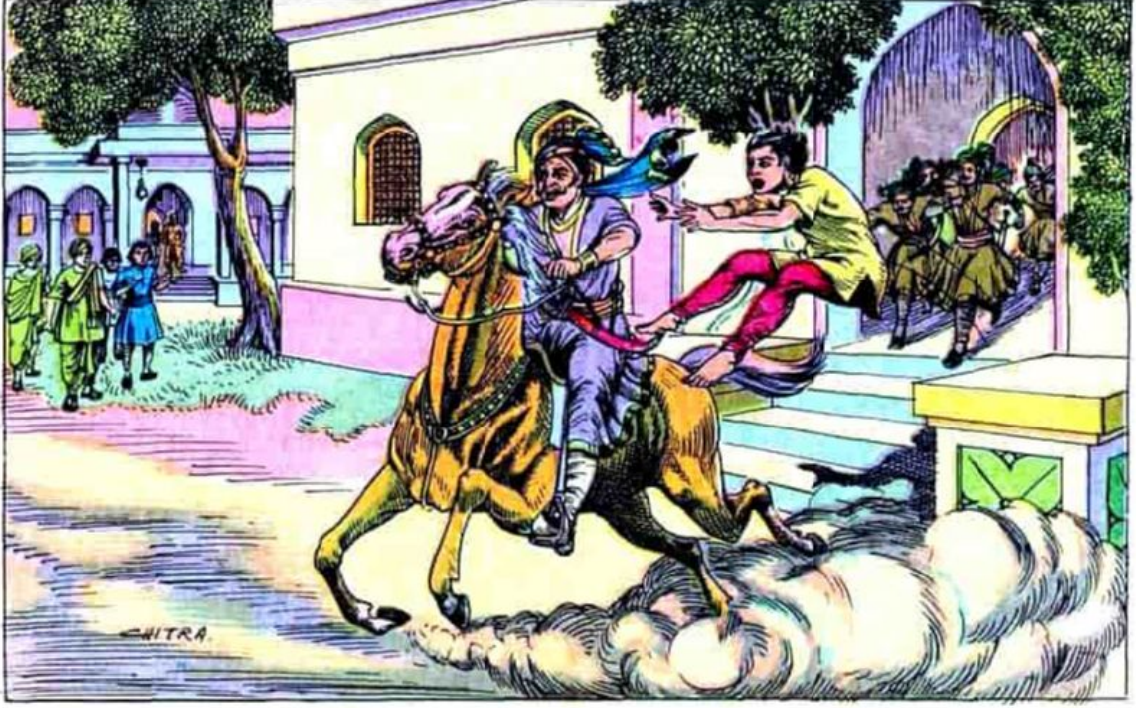
পিঠে যাই ঘটুক-না-কেন কৃপাণজিতের ঘোড়া ছুটে চলল রাজপ্রাসাদের দিকে। পথের দু-পাশের লোক অবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখছিল। যারা দেখল তারা বুঝল কৃপাণজিতকে সায়েস্তা করার লোক আছে। সেইসময় রাজা তার ভবনের ছাদে মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটি ঘোড়ায় দুই সওয়ারি। রাস্তার আশেপাশের লোকের চিৎকার তার কানে এল। রাজা, কাছে যারা ছিল তাদের বললেন, 'দেখ তো, ঘোড়ার পিঠে কারা যেন মাতলামি করছে। একটি ঘোড়ায় দু-জন চড়েছে কেন? ওই দু-জনকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা কৃপাণজিৎ ও জয়শীলকে ধরে আনল রাজার সামনে। রাজা দেখে অবাক হলেন। অবাক হলেন অশ্ববাহিনীর নায়কের রক্তাক্ত অবস্থা দেখে। জয়শীলকে রাজা চিনতেন না। মন্ত্রী জয়শীলকে তার বাবার সঙ্গে কয়েক বার দেখেছিলেন।

রাজা ভীষণ রেগে গিয়ে অশ্ববাহিনীর নায়ককে বললেন, ‘জিৎ, তুমি না অশ্ববাহিনীর নায়ক। ঘোড়ার পিড়ে চড়ে রাস্তার লোককে খেলা দেখাচ্ছিলে?’

‘মহারাজ, এই লোকটা একটা জুয়াড়ি। পেছন দিক দিয়ে আমার ঘোড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সারা রাস্তা আমায় মারতে মারতে এসেছে। পথের দু-পাশের লোক সাক্ষী। একে কঠোর শাস্তি দিন মহারাজ।' কৃপাণজিৎ দাঁত কটমট করে বলল।

তার কথায় রাজা হেসে বললেন, 'তোমার কোমরে তরবারি আছে, তুমি আমার অশ্ববাহিনীর নায়ক। আর তোমার ঘোড়ায় চড়ে তোমাকে এক জুয়াড়ি মেরেছে। তুমি বলছ

সারা পথে মেরেছে, পথের দুধারের লোক সাক্ষী। এসব বলতে তোমার একটুও লজ্জা করেনি। তোমার পেছনে হঠাৎ জুয়াড়িরা লাগল কেন?'

'মহারাজ এই জুয়াড়িরা ভদ্রতা জানে না। আমাদের যাতায়াতের সময়ে এরা সম্মান দেখাতে দাঁড়ায় না। বসেই থাকে। আমাদের সম্মান দেখানো যে ওদের কর্তব্য সেটা ওরা ভুলে গেছে। কীভাবে সম্মান দেখাতে হয় তা শেখাত জুয়া ঘরে ঢুকেছিলাম। সেখানেই এরা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।' কৃপাণজিৎ বলল। রাজা একবার মন্ত্রীর দিকে তাকালেন। মন্ত্রী অস্বস্তি বোধ করে বললেন, 'মহারাজ, ঘটনা যাই ঘটুক না কেন আমাদের অশ্ববাহিনীর নেতা যা করলেন, যেভাবে মার খেতে খেতে এলেন তাতে আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার কথা।'

'এই ধরনের লোক অশ্ববাহিনীর নায়কের পদে থাকলে সারা দেশের পক্ষেই ক্ষতিকর। এই খবর শত্রুর কানে গেলে ওরা আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে সহজেই অনুমান করতে পারবে।' রাজা বললেন।

কিছুক্ষণ ভেবে রাজা বললেন, 'জিৎ, তুমি যে কাপুরুষতা দেখিয়েছ তাতে আমাদের বাহিনীর মাথা হেঁট হয়ে গেছে। তোমাকে আমি শুধু যে তোমার পদ থেকে সরাচ্ছি না নয়, আমার দেশ থেকেই বহিষ্কার করছি। চলে যাও।'

কৃপাণজিৎ কী যেন বলতে গেল। কিন্তু রাজার তর্জনী দেখে বুঝল রাজা আর কোনো কথা শুনতে চান না। এই মুহূর্তে দেশত্যাগ না করলে তাকে প্রাণে মারা পড়তে হবে। তাই সে তরবারি নীচে রেখে চলে গেল।

তারপর রাজা জয়শীলের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি জুয়াড়ি?'

তোমাকে শিরচ্ছেদের শাস্তি দেওয়া হবে। মৃত্যুর আগে শেষ কথা বল।'

জয়শীল নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে দুঃখে ভেঙে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে মাথা তুলে বলল, 'মহারাজ, আমার শিরচ্ছেদের নির্দেশ যখন দিয়ে দিচ্ছেন তখন আমি আর কী বলব।'

'তোমার মৃত্যুভয় নেই? মরার কথা ভেবে তোমার ভয় করছে না?' রাজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'দারিদ্রের চেয়ে ভয়ের আর কিছু নেই মহারাজ। দারিদ্র্যের ভয়ের কাছে প্রাণের ভয় তুচ্ছ।' জয়শীল বলল।

'তুমি কি চিরকাল দারিদ্রই পেয়ে এসেছ? সুখের মুখ দেখনি?' রাজা বললেন।

'দেখেছি মহারাজ। আমার সব ছিল।' জয়শীল বলল।

‘ও ঠিক কথা বলছে মহারাজ। ওর বাবার যা সম্পত্তি ছিল তাতে ও সারাজীবন বসে খেতে পারত। কিন্তু খারাপ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বাবার মৃত্যুর চার-পাঁচ মাসের মধ্যে সব কিছু খোয়াল।' মন্ত্রী বললেন।

‘আপনি চেনেন?’ রাজা বললেন।

‘চিনি মহারাজ। এর বাবা আমাদের প্রাসাদের রাজকর্মচারী ছিল। এর নাম জয়শীল। বাপের একমাত্র ছেলে। বাপ মারা যাওয়ার পরে একে সঠিক পথে চালনা করার লোক ছিল না। অল্প বয়স, রক্ত গরম। ভুলবশত একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছে। এর প্রতি একটু দয়া করা উচিত মহারাজ।' বললেন মন্ত্রী।

রাজা একবার জয়শীলের দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। আমি এর শিরচ্ছেদের শাস্তি দিচ্ছি না। কিন্তু দেশ থেকে বহিষ্কার করব। ভবিষ্যতে কোনোদিন নিজেকে শুধরে ফিরে এলে রাজপ্রাসাদে এর বাবা যে কাজ করত সেই কাজ একে দেওয়া হবে।'

জয়শীল মাথা নীচু করে নমস্কার করে বিদায় নিল। মন্ত্রী বললেন, ‘এখনকার মতো যাও। তবে মহারাজ যা বলেছেন তা মনে রেখ।'

ওর যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে রাজা বললেন, 'কৃপাণজিতের ফেলে যাওয়া তরবারিটা নিয়ে যাও। সাত দিনের মধ্যে দেশের সীমানার বাহিরে চলে যাবে।'

'তাই যাব মহারাজ,’ বলে জয়শীল তরবারি নিয়ে চলে গেল।

দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে জয়শীলের ইচ্ছে করল দেবশর্মার সঙ্গে একবার দেখা করার। সোজা গেল দেবশর্মাকে যেখানে সে ছেড়ে এসেছিল সেখানে। সেই জুয়োর ঘরে। কিন্তু গিয়ে দেখল জুয়োর ঘর ভেতর থেকে বন্ধ।

জয়শীল অবাক হয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে ডাকল, 'ভেতরে কে আছ? দরজা খোল?’

ভেতর থেকে কে যেন বলল, 'এটা জুয়োর ঘর নয়। কে ডাকছেন ?’

এই জবাব শুনে জয়শীল আরও অবাক হয়ে বলল, 'আমি জুয়োর ব্যাপারে আসিনি। আগে দরজা খোল, সব বলছি।'

ভেতরের লোকটা ভেবেছে, নিশ্চয় রাজার লোক এসেছে। কিছুক্ষণ আগে যা ঘটে গেছে তার ফল খুব খারাপ হবে। ভাবতে ভাবতে জুয়োর ঘরের মালিক কাঁপতে কাঁপতে দরজা খুলল। 'তোমার টাকাপয়সা গেছে, গেছে। বলি তোমার বুদ্ধিও কি লোপাট হয়ে গেছে? তুমি ভালোভাবেই জানো কেন আমি দরজা বন্ধ করে রেখেছি।' সে বলল।

জয়শীল হঠাৎ তরবারি বের করে ওর দিকে এগিয়ে ধরে বলে, 'জুয়া ঘরের মালিক হয়েছ এমনি এমনি? মনে রেখ আমার টাকাপয়সা গেছে কিন্তু হাতে তরবারি আছে। এই শরীরে এখনও তরবারি চালানোর ক্ষমতা আছে। আমি আমার বন্ধুকে খুঁজতে এসেছি। বল দেবশর্মা কোথায় আছে?'

জুয়ো ঘরের মালিক ভয়ে কাঁপতে লাগল। তার মুখ দিয়ে প্রথমে কথা সরল না। অনেক কষ্টে বলল, 'বাবা রাগ করো না। আমি জুয়ো খেলা বন্ধ করে দিয়েছি। আর এখানে ওসব হতে দেব না।'

জয়শীল ভীষণ রেগে গিয়ে ওর বুকের উপর তরবারি ধরে বলল, 'পাপী, নীচ, তুই অনেকক্ষণ আজেবাজে কথা বলছিস। আমি যে প্রশ্ন করছি তার জবাব দে। আমার বন্ধু দেবশর্মা আছে কি নেই? আমার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছিস?'

'আগে তরবারিটা সরাও। তুমি একজন বীর। বীরপুরুষ সবসময় বীরের বুকে তরবারি ধরে। আমার মতো ভীরুর বুকে নয়।' জুয়ো ঘরের মালিক বলল।

জয়শীল তরবারিটাকে খাপে পুরে দু-হাতে ওর গলা টিপে ধরে বলল, 'আবার আজেবাজে কথা বলছ? তাড়াতাড়ি জবাব দাও। না হলে গলা টিপে শেষ করে দেব।'

'আহা লাগছে, লাগছে। বলছি তো জুয়ো খেলা বন্ধ করে দিয়েছি। এখানে কেউ নেই।' জুয়ো ঘরের মালিক বলল।

কিছুক্ষণ ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জয়শীল বলল, 'মিথ্যা কথা যদি বলে থাক রেহাই পাবে না। চললাম।' বলে জয়শীল চলে গেল।

কুলশেখরের ছেলে জয়শীল জননীকে হারিয়েছে বাচ্চা বয়সে। আজ জন্মভূমিকে হারাতে হচ্ছে। কত কথা মনে পড়ে জয়শীলের। তার টাকাপয়সা যখন ছিল কত বন্ধুবান্ধব ছিল। কত লোক আত্মীয় বলে তার কাছে আসত। কত ভালো ভালো কথা বলত। কিন্তু আজ তার পাশে কেউ নেই।

দেশ ছেড়ে যাওয়া ছাড়া জয়শীলের অন্য কোনো পথ ছিল না। মনে মনে ভাবল কপালে থাকলে ভবিষ্যতে দেশে ফিরতে পারবে।

সেদিন বন্ধু দেবশর্মার সঙ্গে দেখাও হবে। তারপর সে এগিয়ে গেল যেদিকে দু-চোখ যায়। নগর থেকে গ্রাম। গ্রাম থেকে বনপথ। বনপথ থেকে অরণ্যপথে সে একা এগিয়ে গেল।

ক্রমাগত পথ চলার ক্লান্তি আছে। দেশ ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ আছে। সব মিলিয়ে জয়শীল যেন নিজের মধ্যে থেকেও নেই। কোনো এক অভিমানে অপমানে সে চলেছে তো

চলেছেই। যেখানে-সেখানে যা পায় তাই খায়। যেখানে রাত হয় সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে আবার চলার পালা। চলার যেন আর বিরাম নেই জয়শীলের।

এইভাবে সাত দিন পথ চলার পর সে অন্য দেশের রাজধানীতে গোধূলি বেলায় পৌছাল।

দুই

সেই রাত্রে জয়শীল এক বিরাট গাছের নীচে আশ্রয় নিল। অন্ধকারে কোনো নগরে প্রবেশ করা নিরাপদ নয়। বনে যেমন বিপদ নগরেও তেমনি বিপদ আছে। এক দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে এসেছে। এখান থেকে রাত্রের অন্ধকারে অন্য দেশে ঢুকলে সে দেশের রাজার হাতে পড়তে পারে। ওরা তাকে গুপ্তচর ভাবতে পারে। তারপর তার যে কী শাস্তি হবে কে জানে। এসব ভাবতে ভাবতে সে বটগাছের নীচে মাটির ঢিপিকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়ল।

সারাদিন পথ চলার ক্লান্তির ফলে সে শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝরাত্রে অনেকগুলো শেয়ালের ডাক শুনে হঠাৎ জয়শীলের ঘুম ভেঙে গেল। অদূরে গাছের আড়াল থেকে কিছু ধোঁয়া এবং আলো দেখা যাচ্ছিল।

'যাক বাবা, তাহলে আমি শ্মশানের ধারে-কাছেই আছি। শ্মশানের পাশে বটগাছে তো ভূতপ্রেত থাকার কথা। যাহোক আমার ভাগ্য ভালো, ভূতপ্রেত দেখতে পাব।' বলে সে গাছের উপরের দিকে তাকাল। ডালে ডালে চোখ ফেরাল। কিন্তু হতাশ হল, কিছুই তার নজরে পড়ল না। মনে মনে হাসল। তরবারিটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে আবার চোখ বুজল।

চোখ বুজল বটে কিন্তু সহজে ঘুম এল না। অনেকক্ষণ পরে তন্দ্রা এল। আর ঠিক সেইসময় তার কানে গেল, 'বাঁচান! বাঁচান!' আমাকে মহাকাল গিলে ফেলতে আসছে। 'বাঁচান! বাঁচান! সে এক গগনভেদী আর্তনাদ।

জয়শীল ঝট করে উঠে হাতে তরবারি নিয়ে যেদিক থেকে আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল সেদিকে ছুটল। দেখল শ্মশানে দু-তিনটে মড়া জ্বলছে। কালো পোশাক পরা একটি লোককে ছুটে যেতে সে দেখল। রঙিন পোশাক পরা আর একটি লোক যেন তাকে তাড়া করছে অথবা তার পেছনে ছুটছে।

যে আর্তনাদ করছিল তার দিকে জয়শীল ছুটতে ছুটতে, এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'ভয় পেও না। তোমাকে যে গিলতে চায় তাকে আমি আমার এই তরবারি দিয়ে কেটে ফেলব।' জয়শীলের অভয়বাণী গোটা অঞ্চলে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল।
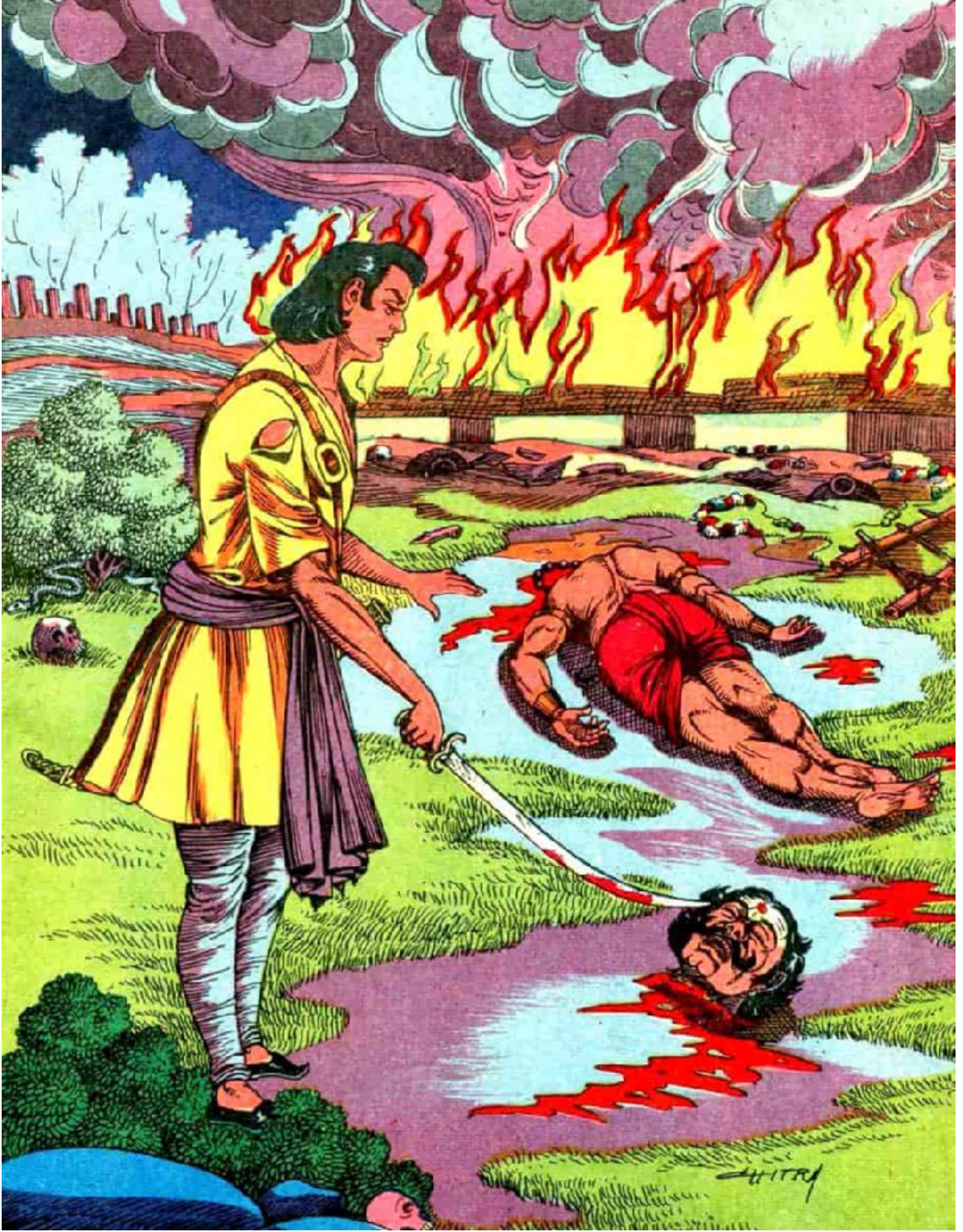
জয়শীলের কথা শুনতে পেয়ে সে তার দিকেই ছুটে চলে এল। তাকে তাড়া করতে করতে এল ওই রঙিন পোশাক পরা মূর্তি। ওই মূর্তি বলছিল, 'থামো, দাঁড়াও। আমি মহাকাল নই। আমি মহাকালের দুত কালো কাল।

আমাকে দেখে যখন এত ভয় তখন মহাকালকে তুমি তো...।'

কথা শেষ হতে-না-হতেই, 'তুমি যেই হও তোমাকে আমার কোনো ভয় নেই। আর যাই হোক, একটা অসহায় লোককে তুমি তাড়া করে মেরে ফেলবে তা আমি চোখের সামনে কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। আমি তোমার মোকাবিলা করব। তুমি কালো কালই হও, অথবা মহাকালই হও আমি তোমার ক্ষমতা একটু দেখতে চাই।' জয়শীল জোরে জোরে বলল।

জয়শীলের কথা শুনতে শুনতে কালো কাল বিকৃত হাসি হাসতে হাসতে বলল, 'সাবাস ব্যাটা! মনে হচ্ছে তোমার মধ্যেও একটু-আধটু সাহস আছে। এবার তুমি আমার নিজের রূপ দেখ।' বলে যে রঙিন কাপড় দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছিল সেই কাপড়টি ছুঁড়ে ফেলে দিল।

তখন দেখা গেল সেই কালো কালের ভয়ংকর রূপ। গভীর কালো তার গায়ে রং। চোখগুলো যেন জ্বলছে। কথা বলার সময় তার মুখ দিয়ে যেন ধক ধক করে আগুন বেরুচ্ছিল। চোখের সামনে এরকম এক জ্বলন্ত মূর্তি দেখে জয়শীল মুহূর্তকাল থ বনে গেল।

পরমুহূর্তেই জয়শীলের সাহস ফিরে এল। সে কালো কালের বুকে তরবারি ধরে গর্জে উঠল, 'তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার এই বিকৃত রূপ দেখে ভয় পাব। আমি সে পাত্র নই। যে ভয়ে পালাচ্ছে তাকে যখন তুমি তাড়া করছ তখন তুমি নিশ্চয় খারাপ লোক। তুমি নিশ্চয় আসল লোক নও। তোমার মধ্যে খাদ আছে।'

ওই কথা শুনে কালো কাল এক-পা এক-পা করে পেছিয়ে বলল, 'যুবক আমি তোমার সাহস দেখে খুশি হয়েছি। অমানুষ শক্তিকে মহাশক্তিরাই অধীন করে রাখতে পারে। তবে তোমার মতো শক্তিমানকেও ছেড়ে দেওয়া যায় না। তোমরা যেকোনো সময়ে আমাদের ক্ষতি করবে। তাই তোমাকে—'বলে সে এগিয়ে এল।

জয়শীল আবার তার বুকে তরবারি ধরল। কালো পোশাক পরা লোকটা পেছনে আছে কিনা দেখে নিল। সে তখনও শ্মশানের আশেপাশে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে ঘুরপাক খাচ্ছিল। কালো কাল চিৎকার করে বলল, 'আমাকে ওই সিদ্ধ সাধককে, ওই আর্তনাদকারীকে শাস্তি দিতে দাও। তা না হলে আমি তোমাকে কঠোর শাস্তি দেব।'

কিন্তু জয়শীল তার বুকের ওপর থেকে তরবারি সরাল না। তখন কালো কাল হাত দিয়ে তরবারি সরিয়ে দিল।

ঝট করে জয়শীল তরবারি দিয়ে কালো কালের গর্দানে আঘাত করল। চোখের পলকে মুণ্ডুটা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই ওই মুণ্ডুটা মাটির উপর লাফাতে লাফাতে হো-হো করে হাসতে হাসতে বলল, 'জয়শীল, আমি সত্যি তোমার সাহস দেখে

খুশি হয়েছি। আমার গলার রক্ত তোমার তরবারিতে লাগার ফলে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে তোমার তরবারি। তুমি যার সঙ্গে যুদ্ধ করবে জয়ী হবে। যা চাইবে, তাই পাবে।'

এই কথা শুনে জয়শীল কিছুক্ষণের জন্য কেমন হয়ে গেল। কী যে করবে, কী বলবে ভেবে পেল না। তারপর বলল, 'কালো কাল, আমি কোনো মহাশক্তি অর্জন করার জন্য পথে বেরোইনি। শুধু চাই একটি চাকরি। রাজার অধীনে রাজকর্মচারী হিসেবে কাজ করে জীবন কাটাতে চাই। আমার চাহিদাও তেমন বড়ো কিছু নেই।'

কিন্তু জবাবে ওই কাটা মুণ্ডু কিছুই বলল না। কাটা মুণ্ডুর কাছে দাঁড়িয়ে তরবারি দিয়ে সেটিকে নেড়েচেড়ে দেখল জয়শীল। নড়ে না চড়ে না। মনে হল তাতে প্রাণ নেই। তার কানে নাকে অলংকার ছিল। গলায় মোটা হার ছিল। এ সব কিছুই জয়শীলের নজরে পড়ল।

জয়শীল আর কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই ভেবে তরবারিটাকে খাপে পুরে নিল। তারপর চারদিক চোখ ফিরিয়ে খুঁজতে লাগল ওই ছুটন্ত লোকটাকে। কিন্তু আশ্চর্য, কোথাও সেই মূর্তিকে আর দেখতে পেল না। ওই ভয়ংকর মূর্তির সঙ্গে যে ওই লোকটার কী সম্পর্ক বুঝতে পারল না। তার মনে প্রশ্ন জাগল, 'তাহলে সে কে? কীসের জন্য ছুটছিল? হয়তো ভয় পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে কোথাও পড়ে আছে।' এসব কথা ভাবতে ভাবতে চারদিকে জয়শীল তাকে খুঁজতে লাগল। কোথাও কিছু পেল না।

শেষে ওই বটগাছের নীচে এসে দাঁড়াল। পেঁচার ডাক শোনা গেল। আগের মতোই অনেকগুলো শেয়ালের ডাকও একসঙ্গে শোনা গেল। সে বুঝতে পারল তার ঘুম আর আসবে না। তার ভীষণ জল তেষ্টা পেল। সে এদিক-ওদিক তাকাল। কিন্তু কোথাও জল আছে বলে মনে হল না।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর কিছুক্ষণ বাদেই ভোর হয়ে যাবে। শ্মশানের ধারে-কাছে তো জল থাকার কথা। চারদিকে ঘুরে দেখি। নিশ্চয় জল থাকবে। শুধু পান করাই নয় স্নান করতে হবে। তারপর ভোর বেলায় নগরে যাওয়া যাবে। জামাকাপড়ের অবস্থাও ভালো নেই। অত ছেড়া পোশাক দেখেও নগরের লোক ভাববে আমি কোনো ধনীর দুলাল। কী আর করা যাবে। কেউ প্রশ্ন করলে বলব, অরণ্যের সিংহের সঙ্গে লড়াই করে এসেছি। তাই জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে জয়শীল যাত্রা করল।

কিছুদূর হাঁটার পর একটা ছোট্ট ঘর দেখতে পেল। জানলা দিয়ে ওই ঘরের আলো দেখা যাচ্ছিল। ভাবল, ওই বাড়ির লোককে তুলে জল চেয়ে আপাতত তেষ্টা মেটানো যাক। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে জয়শীল ডাকল, 'বাড়িতে কে আছেন? আমি যাত্রী। আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল খাব।'

তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে গেল। এক বুড়ি হাতে আলো নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এত রাত্রে তুমি কোত্থেকে এসেছ? কোথায় যাবে? ঘুমিয়ে সকালে উঠে রওনা দিতে পারলে না? অতই যদি তেষ্টা পেয়ে থাকে ভেতরে এসে জল খেয়ে যাও।'

জয়শীল ওই ঘরের ভেতর ঢুকল। বুড়ি তার মুখের সামনে আলো ধরে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর বলল, ‘ভেবেছিলাম তুমি তীর্থযাত্রী। দলছাড়া হয়ে পথ হারিয়েছ? তোমার ব্যাপারটা কী? এত কাঁচা বয়সে কোমরে তরবারি বেঁধে চললে কোথায় ?’

জয়শীল কী যেন জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই বুড়ি বলল, ‘ওই তক্তার উপর বস। আগে তোমার তেষ্টার জল দিই।' বলে বুড়ি পাশের ঘরে গিয়ে এক পাত্রে জল এনে জয়শীলকে দিল।

জয়শীল চোঁ করে জল খেয়ে বলল, 'মা, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ! আচ্ছা, ঘরে কি তুমি একা থাক? আর কেউ নেই?’

'আমার বলতে এ জগতে আর কেউ নেই বাবা। আমার বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি। এক বছর আগে আমার স্বামী মারা গেছে। উনি রাজার অধীনে কাজ করতেন ওঁর মারা যাওয়ার পর থেকে ও যে মাইনে পেত তার তিন ভাগের এক ভাগ আমি পাই। এই দিয়ে পেট চালাই। কোনোভাবে বেঁচে আছি।' বুড়ি বলল।

‘মা, এই অঞ্চলে আমি প্রথম এসেছি। কাছাকাছি কোনো নগর আছে? এখানকার রাজার নাম কি?’ জয়শীল জিজ্ঞেস করল।

বুড়ি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'বাবা, রাজার নাম কনকাক্ষ। আমাদের রাজা ধর্মাত্মা পুরুষ। প্রজাদের মঙ্গল কামনা করেন। একমাস আগে রাজার বিবাহযোগ্যা মেয়েকে এবং যুবরাজকে কে বা কার যেন অপহরণ করে নিয়ে গেছে। রাজার অবস্থা তারপর থেকে এত খারাপ হয়ে গেছে যে বলার নয়। সবসময় রাজা বিছানায় শুয়ে থাকেন। একসঙ্গে ছেলেকে এবং মেয়েকে যে হারাতে হবে তা রাজা কোনোদিন কল্পনাও করেননি। যে রাজা এত দুঃখে আছেন তার কাছে কী এখন যেতে পারবে বাবা?'

জয়শীল ভাবল, 'সত্যিই তো। রাজার মনের অবস্থা যখন এতটা ভারাক্রান্ত তখন তার কাছে চাকরির জন্য যাওয়া উচিত নয়।' কিন্তু পরক্ষণেই জয়শীলের মনে হল, ‘চাকরি নাই-বা চাইলাম। যুবরাজ ও রাজকুমারী কবে থেকে হারিয়ে গেল, কারা ওদের নিয়ে গেল। এসব ব্যাপারে রাজার কাছে খোঁজখবর করলে কেমন হয়!’ এসব কথা ভেবে জয়শীল বুড়িকে বলল, 'আচ্ছা মা, রাজা যতই ভালো হোক তার নিশ্চয় শত্রু আছে। প্রত্যেক রাজারই শত্রু আছে। কনকাক্ষ রাজার ছেলে-মেয়েকে নিশ্চয় শত্রুরা নিয়ে গেছে। এবং সে শত্রুকে রাজা নিশ্চয় চেনেন।'

'তাহলে তো আর কথাই ছিল না। শত্রুকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে আমাদের রাজা নিজের ছেলে-মেয়েকে উদ্ধার করতেন। কোনো মানুষ আমাদের রাজার ছেলে-মেয়েকে নিয়ে যেতে পারে না। এ নিশ্চয় কোনো যক্ষ বা রাক্ষসের কাজ।' বুড়ি বলল।

এমন সময় বাইরে কোলাহল শোনা গেল। কে যেন বলছে, 'শ্মশানে আমার বাবার মুণ্ডু যে কেটেছে সে এই ঘরেই ঢুকেছে। এই ব্রাহ্মণ বুড়ি ওই লোকটাকে আশ্রয় দিয়েছে।'

'তোমরা চুপ কর। অত হইচই করলে অপরাধী টের পেয়ে পালিয়ে যাবে। আমি সিদ্ধ সাধক। আমাকে ব্যাপারটা বুঝতে দাও আগে।' আর একজন চটে গিয়ে বলল।

গলাবাজি করে দুজনকেই থামিয়ে অন্য জন বলল, 'তোমরা সব চুপ কর। আমি নগররক্ষক। নগরে কে এসেছে না এসেছে তার খোঁজখবর নেওয়ার দায়িত্ব আমার। আমাকে মন্ত্রী পাঠিয়েছেন। আমিই খোঁজ নেব। তোমরা চুপ কর।'

এসব কথা শুনে জয়শীল বলল, 'মা, আমাকে তোমার ঘরে দেখলে তোমার ক্ষতি হবে না তো? হলে বল। আমি খিড়কির দরজা দিয়ে পালাতে পারি?'

জয়শীলের কথা শেষ হতে-না-হতেই নগররক্ষক বুড়ির ঘরের দরজায় জোরে জোরে আঘাত করতে করতে বলল, 'দরজা খোল। তাড়াতাড়ি দরজা খোল।'

তিন

নগররক্ষক সেই গভীর রাত্রে দরজা খুলতে বলায় বুড়ি চমকে গেল। ভয় পেল। সে ভেবে পেল না দরজা কেন খুলতে হবে।

বুড়ি দরজা খুলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। জয়শীলকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, তুমি বাইরে কোনো অপরাধ করে আমার ঘরে ঢোকনি তো? তুমি যদি রাজার লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য আমার ঘরে ঢুকে থাক তাহলে বল। সত্যি কথা বললে যা করার আমি করব। আমার কাছে সত্যি কথা বলতে হবে।'

'মা, আমি কোনো দোষ করিনি। আমার কপাল মন্দ, তাই দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। আমি যা বলছি সম্পূর্ণ সত্য। শপথ করে বলছি।' জয়শীল বলল।

'তোমার কথা শুনলে, চেহারা দেখলে মনে হবে তুমি খুব বড়ো পরিবারের ছেলে। তুমি যদি দোষী না হও রাজার লোককে আর আমার ভয় কীসের।' বলে বুড়ি দরজা খুলে ফেলল।

নগররক্ষক ঘরে না ঢুকেই বাইরে দাঁড়িয়েই বুড়িকে বলল, 'আপনার স্বামীকে আমি ভালোভাবেই চিনতাম। এত রাত্রে দরজা খুলতে বলেছি বলে আপনি কিছু মনে করবেন না। শ্মশান পাহারাদারের বড়ো ছেলে আর এক সিদ্ধ সাধকের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া

বেধেছিল। আর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আমাকে এখানে আসতে হল। আপনার ঘরে কি কোনো যুবক আশ্রয় নিয়েছে? ওই যুবকের কোমরে একটা তরবারি ঝুলছে।'

বুড়ি ভেবে পেল না কি বলবে। তার কোনো জবাব দেবার আগেই পাশের ঘর থেকে যুবক জয়শীল এগিয়ে এসে বলল, 'আপনারা যে যুবককে খুঁজছেন হয়তো আমি সেই যুবক। আমার দিকে ভালো করে তাকালে হয়তো আপনারা চিনতে পারবেন।'

শ্মশানের পাহারাদারের বড়ো ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই সেই লোকটা। আমার বাবার মুণ্ডু কেটেছে। এই লোকটাই মরে আবার বেঁচে ওঠা আমার বাবার মুণ্ডু কেটে লুকিয়ে পড়েছে।'

সিদ্ধ সাধক ধমক দিয়ে বলল, 'বোকার মতো কথা বল না। যে একবার মরে যায় সে আবার বাঁচতে পারে নাকি? এই যুবক তোমার বাবাকে মারেনি। মেরেছে তোমার বাবার রূপধারী ভূতকে। আমি নিজের কানে ওই ভূতের কথা শুনেছি। আমি যা বললাম তা বিশ্বাস কর। আর একটি কথাও বল না।'

'আমি শেষবারের মতো বলে দিচ্ছি তোমরা দুজনেই চুপ কর। আর একটি কথা যদি তোমাদের মুখে শুনি তো তোমাদের দুজনকেই শ্মশানের চিতায় তুলব।' গর্জে উঠে নগররক্ষক সিদ্ধ সাধক ও শ্মশান পাহারাদারের ছেলেকে বলল। কিছুক্ষণ পরে জয়শীলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, 'তোমার নাম কী? এত রাত্রে তুমি এখানে কোত্থেকে এলে?'

'আজ্ঞে আমার নাম জয়শীল। আমার দেশের নাম অমরাবতী। আমাদের রাজার নাম রুদ্রসেন। হয়তো তার নাম শুনেছেন। কয়েকটি কারণে আমি দেশ ছেড়ে চাকরির সন্ধানে ঘুরছি।' বলল জয়শীল।

নগররক্ষক সিদ্ধ সাধক ও ওই ছেলেকে দেখিয়ে বলল, 'তুমি এদের চেন? তুমি নাকি শ্মশানে এই ছেলেটির বাবাকে মেরে ফেলেছ? সত্য কথা বল।'

জয়শীল ওদের দুজনের দিকে একবার তাকিয়ে নগররক্ষককে বলল, 'এই সাধককে শ্মশানে দেখেছি। এক ভয়ংকর চেহারার লোক এই সাধককে তাড়া করেছিল। আমি বাধা দিয়েছিলাম। তখন সেই ভয়ংকর লোকটা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল। নিতান্তই আত্মরক্ষার জন্য আমি ওই ভয়ংকর চেহারার লোকটা মুণ্ডু কেটেছি।'

'তুমি মনে রেখ যে তুমি আমার বাবার মুণ্ডু কেটেছ। আমি তাঁকে শ্মশানে রেখে কাঠ আনতে গিয়েছিলাম। আমার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন দেবতার আশীর্বাদের ফলে আমার বাবা বেঁচে উঠেছিলেন। ফেরার সময় দেখতে পেলাম তুমি আমার বাবার মুণ্ডু কাটছ।' রেগে গিয়ে বলল শ্মশান পাহারাদারের ছেলে।

‘ওটা যে কার দেহ তা লক্ষ না করেই আমি আমার মন্ত্রশক্তি দিয়ে ওই দেহের মধ্যে কালকে আহ্বান করেছিলাম। তারপর ওই দেহে প্রাণ এল। প্রাণ আসতেই সে আমাকে মারার জন্য তাড়া করতে লাগল। আমি তখন নিজের প্রাণ বাঁচাতে ছুটছিলাম। এই যুবক বাধা দিয়ে তার মুণ্ডু না কাটলে আমি বাঁচতে পারতাম না।' বেঁচে ওঠার আনন্দে বলল সাধক।

নগররক্ষক একটু হেসে বলল, 'তোমার নাম কী যেন বললে, জয়শীল? ওই দু-জন তুমি যা করেছ তা নিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে তর্ক করছে। এদের কথা শুনে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি আর পারছি না। আমি চাই সবাইকে মন্ত্রীর কাছে নিয়ে যেতে। বিচার যা করার মন্ত্রীই করবেন।' বলে সবাইকে অনুসরণ করার ইশারা করে নগররক্ষক এগিয়ে গেল। অদূরে একটি বিরাট গাছের নীচে তার ঘোড়া বাঁধা ছিল।'

জয়শীল যাবার আগে বুড়িকে বলল, 'মা, শুনলেন তো সব কথা। আমি জানি আমি কোনো দোষ করিনি। রাজা হোক, মন্ত্রী হোক, ঠিক বুঝতে পারবেন আমি দোষী নই। কোনো একটি চাকরি জোগাড় করে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসব।'

‘তোমার মঙ্গল হোক বাবা।' জয়শীল প্রণাম করলে বুড়ি বলল।

ঘোড়ায় চড়ে নগররক্ষক আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে লাগল। পেছনে হেঁটে গেল জয়শীল, সাধক এবং ওই ছেলেটি। ভোর হয়ে এল। লোকের ঘুম ভাঙতেই দেখল নগররক্ষক ওই তিন জনকে নিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পথের ধারের লোক কাছাকাছি এলে শ্মশানরক্ষকের ছেলে বলতে লাগল, 'এই যে লোকটা তরবারি নিয়ে চলেছে এই আমার বাবার মুণ্ডু কেটেছে। আমার বাবা মরে বেঁচে উঠেছিল। আর এই যে কালো পোশাক পরা লোকটা নিজেকে সাধক বলে, আসলে এর জন্যই আমার বাবা মারা গেল। আমি যাচ্ছি রাজার হুকুমে একেবারে আজকেই এই দু-জনের মুণ্ডু কাটতে।'

নগররক্ষক রাজপ্রাসাদে যাওয়ার আগেই মন্ত্রী সেখানে এসেছিল। নগররক্ষক মন্ত্রীকে সব কিছু বলল। কিছুক্ষণ ভেবে মন্ত্রী বলল, 'বৈদ্য যখন মারা গেছে বলেছে। তখন শ্মশানরক্ষক বেঁচে উঠবে কী করে? এ অসম্ভব! মরা মানুষ বেঁচে উঠতে পারে না। সাধকের কথা যদি সত্য হয় তাহলে অবশ্য যুবক যে মুণ্ডু কেটেছে তা বিশ্বাস করতে হয়। কিন্তু এরকম একটা অসম্ভব ব্যাপার... মন্ত্রী এরপর কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। এমন সময় জয়শীল বলল, বিচার আপনার হাতে। তবে আমি যা করেছি নিতান্তই আত্মরক্ষার জন্য করেছি। যতদূর জানি, শাস্ত্র মতে আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করলে সেটা ঠিক অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না।'
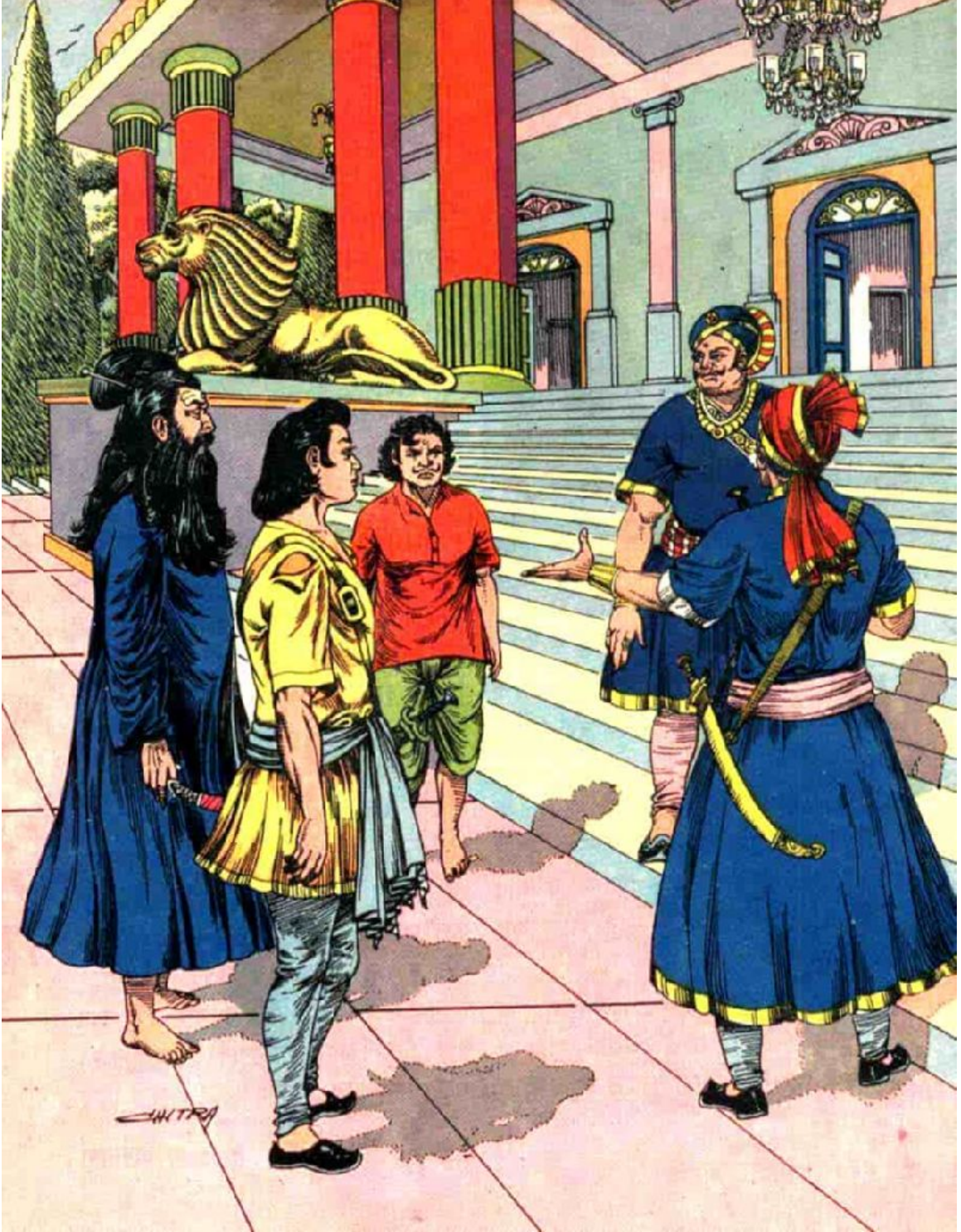
'হ্যাঁ, হ্যাঁ তা অবশ্য ঠিক।' মন্ত্রী এমনভাবে বলল যেন তার মাথা থেকে বিরাট এক বোঝা নেমে গেছে; যেন তাকে আর কিছু ভাবতে হবে না। তার আর কিছু করার নেই।

সাধক আর থাকতে না পেরে বলল, 'এ ব্যাপারে আমার ছোট্ট একটি পরামর্শ আছে। অনুমতি দিলে বলতে পারি।'

মন্ত্রী মাথা নেড়ে অনুমতি দিল। সাধক গলা ঝেড়ে বলল, 'এই যুবকের শক্তি অসীম। এর তরবারির কাছে কোনো কিছু এগোতে পারে বলে আমার মনে হয় না। আমি মন্ত্রশক্তি বলে যা শুনেছি এই যুবকের মাধ্যমে কনকাক্ষ মহারাজের অনেক লাভ হবে। অবশ্য কীভাবে হবে, কবে হবে আমি তা ঠিক বলতে পারি না।'

মন্ত্রী যেন আবার বিপদে পড়ল। বিরক্ত হয়ে সাধককে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি বলতে চাইছ? ছেলে এবং মেয়েকে হারিয়ে রাজার মন এমনিতেই খারাপ। তিনি ইদানীং কোনো কাজে উৎসাহ পাচ্ছেন না। রাজার উপকার মানে তো রাজার রাজ্যবিস্তার। তুমি কি বলতে চাইছ যে এই যুবকের মাধ্যমে আমাদের রাজার রাজ্যবিস্তার হবে? রাজা এই মানসিক অবস্থা নিয়ে যুদ্ধ করবেন ?'

'ছেলে-মেয়েকে হারিয়েছেন বলেই তো রাজার মন খারাপ। এমনও তো হতে পারে যে জয়শীলের জন্যই রাজা নিজের ছেলে-মেয়ে ফিরে পাবেন? আমি। নিশ্চিত জয়শীলের তরবারির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না।' সাধক বলল।

কথাগুলো শুনে মন্ত্রীর মনে হল তার ঘাড় থেকে বিরাট এক বোঝা নেমে গেছে। অনেকদিন ধরে অনেকভাবে অনেক কিছু তাকে করতে হচ্ছে। এবং সব কিছুই করতে হচ্ছে রাজার ছেলে-মেয়েকে খোঁজ করার জন্য। মন্ত্রী ভাবল, সাধকের কথা যদি সত্য হয় তাহলে এই মুহূর্তে রাজার ছেলে-মেয়েকে খোঁজ করার জন্য জয়শীলকে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার আগে এ-ব্যাপারে রাজার অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।

জয়শীলকে অনুসরণ করার ইশারা করে মন্ত্রী এগিয়ে গেলেন প্রাসাদের ভিতরে।

মন্ত্রী গেলেন রাজার কাছে। রাজা সেইসময় সেনানায়কের ছেলে মঙ্গলবর্মার সঙ্গে কথা বলছিলেন। মন্ত্রীকে দেখতে পেয়ে রাজা হাত নেড়ে তাকে কাছে ডেকে বললেন, 'মহামন্ত্রী, মঙ্গলবর্‍্মা আমার পুত্রকে খুঁজতে চায়। এ-ব্যাপারে কোনো পরামর্শ আছে?'

মন্ত্রী কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'মহারাজ এসব কাজের জন্য বিশেষ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যুবকের প্রয়োজন। আমরা এই ধরনের যুবককে পেয়েছি। নাম জয়শীল। তার তরবারির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না।'

জয়শীল মাথা নীচু করে শুনল। কোনো কথা বলল না।

কনকাক্ষ রাজা কী বলবেন ভেবে পেলেন না। মঙ্গলবর্মা মনে মনে মন্ত্রীর উপর ভীষণ রেগে গেল। তবে মনের রাগ মনে চেপে রেখে বলল, 'মহারাজ যেহেতু ঘোষণা করেছেন, পুত্র-কন্যাকে খুঁজে দিলে অর্ধেক রাজত্ব দেবেন সেইহেতু বহু যুবক মহারাজের পুত্র-কন্যাকে খুঁজতে আসতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। তা না হলে যার তরবারির সামনে কেউ এগোতে পারে না তার নাম এর আগে কেউ কি শুনেছেন?'

মন্ত্রী এই প্রশ্ন শুনে মনে মনে বিরক্ত হলেও প্রকাশ না করে বলল, ‘নামে কিছু যায় আসে না। রাজার পুত্রকন্যাকে মানুষ অপহরণ করেছে না দানব নিয়ে গেছে আমরা জানি না। তাই বিপদ থেকে উদ্ধার করে যে ওদের আনতে পারবে সেই তো পাবে অর্ধেক রাজত্ব। না আনলে তো আর পাবে না।'

তবু মঙ্গলবর্‌মা অত সহজে বিষয়টিকে হাতছাড়া করতে চায়নি। তাই সে বলল, 'জয়শীলের তরবারিতে যে এত ক্ষমতা আছে তা মহামন্ত্রী জানলেন কী করে? আপনি কি তার পরীক্ষা নিয়েছেন?’

মন্ত্রী বলল, 'ঠিক আমি পরীক্ষা নিইনি। তবে রাজার ইচ্ছা জাগলে পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে।'

মঙ্গলবর্মার প্রশ্নের মধ্যে যেন অবিশ্বাসের সুর বেজে উঠল।

রাজ এতক্ষণ ওদের কথাবার্তা শুনে বললেন, 'মহামন্ত্রী, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার করে কী লাভ? জয়শীলের তরবারির ক্ষমতা কতখানি তা পরীক্ষা করে দেখার ভার মঙ্গলবর্মাকে দেওয়া হোক-না-কেন? যদি সত্যি জয়শীলের তরবারিতে অসীম ক্ষমতা থাকে তাহলে তাকে আমরা উপযুক্ত কাজে ব্যবহার করতে পারি। চিরকালের জন্য আমাদের দেশে তাকে একটা চাকরি দিয়ে রেখে দিতে পারি।'

মন্ত্রী জিজ্ঞেস করল, 'কী ধরনের পরীক্ষা হবে মহারাজ?’

'আমাদের পশুশালার দুটো বাঘকে মোকাবিলা করবে একা মঙ্গলবর্মা। তার হাতে থাকবে শুধু জয়শীলের তরবারি।' রাজা বললেন।

এ-কথা শুনে জয়শীল খুব খুশি হয়ে নিজের তরবারি মঙ্গলবর্‌মার দিকে এগিয়ে দিল। পশুশালার রক্ষককে ডেকে পাঠানো হল।

কিছুক্ষণ পরে একটি বিরাট খাঁচায় দুটি বাঘ ঢুকিয়ে দেওয়া হল। তারপর জয়শীলের তরবারি নিয়ে মঙ্গলবর্মাকে ওই খাঁচার ভেতরে ঢুকতে হল। মঙ্গলবর্মাকে দেখেই বাঘ দুটো তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

চার

মঙ্গলবর্মা ভালোভাবেই তরবারি চালাতে পারত। তির-ধনুক চালানোর ক্ষমতাও তার ছিল। কিন্তু দুটো বাঘ যখন হাঁ করে তার দিকে এগিয়ে গেল তখন সে ভীষণ ভয় পেল। ওদের গর্জন শুনে তার প্রাণবায়ু যেন বেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাঘ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে। কীভাবে ওই খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসা যায় তা সে ভাবছিল। মাথা তুলে উপরের দিকে তাকাল। ঠিক সেইসময় একটি বাঘ থাবা মারার জন্য পা তুলল।

জয়শীল বুঝতে পারল মঙ্গলবার অবস্থা কাহিল। সে জানে তরবারিটা একবার ঠিকমতো তুলে ধরলে বাঘ কিছুই করতে পারবে না। তাই খাঁচার বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'মঙ্গলবর্মা তোমার হাতে যে তরবারি আছে তার ক্ষমতা অসীম। তরবারির এক একটা আঘাতে এক একটা বাঘ মারা যাবে। ভয় পেও না, আঘাত কর। আঘাত করলেই বাঘ মরে যাবে।'

জয়শীলের কথা শুনে মঙ্গলবর্মার সাহস পেল। সে যেন নতুন করে বুঝল। পক্ষণেই তার মনে হল কথাগুলো বলছে তো জয়শীল? জয়শীল কি তার মঙ্গল চায়? সে কেন এত চিৎকার করে বলছে? ও যা বলছে তা যদি মিথ্যা হয়? আঘাত করলে যদি কিছু না হয়, তখন তো বাঘ আমাকে ফেঁড়ে ফেলবে। তা ছাড়া তরবারিতে যদি অসীম ক্ষমতা সত্যি থেকে থাকে তাহলে তার কী লাভ...'

এই ধরনের কথা যত ভাবছে মঙ্গলবর্মার হাত তত কাঁপছে। পরক্ষণেই একটি বাঘ এসে তার কাধে থাবা মারল। তখন মৃত্য নিশ্চিত জেনে মঙ্গলবর্মা তরবারি দিয়ে বাঘকে আঘাত করতে গেল। কিন্তু তার হাত থেকে তরবারি খসে পড়ল।

বাঘ দুটো তৎক্ষণাৎ পেছিয়ে গেল। একসঙ্গে মঙ্গলবৰ্মার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য লেজ নাড়তে নাড়তে তারা যেন প্রস্তুত হচ্ছিল। ওদের ওই অবস্থা দেখে মঙ্গলবৰ্মা এককোণে দাঁড়িয়ে খুব জোরে চোখ বুজে ফেলল।

'হে বীর যুবক জয়শীল, দেখাও তোমার বীরত্ব' চিৎকার করে বলে উঠল সিদ্ধ সাধক।

তৎক্ষণাৎ জয়শীল দশ-বারো হাত উপর থেকে বাঘ এবং মঙ্গলবর্মা যেখানে ছিল সেখানে লাফিয়ে পড়ল। হঠাৎ আওয়াজ শুনে মঙ্গলবর্মা এবং বাঘ কেমন যেন হয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে নীচে পড়ে থাকা তরবারি জয়শীল হাতে তুলে নিল।

এই দৃশ্য দেখে কনকাক্ষ রাজা অবাক হয়ে মন্ত্রীকে বললেন, 'মহামন্ত্রী কত সাহস দেখছেন? এ ধরনের যুবকের সাহায্য পেলে আমার ছেলে এবং মেয়ে নিশ্চয় উদ্ধার পাবে।'

'মহারাজ, দেখুন কী হয়? বাঘের খপ্পর থেকে আগে জয়শীল বেরিয়ে আসুক। তারপর অন্য কথা। মনে হচ্ছে বাঘ দুটো মঙ্গলবর্মাকে ছেড়ে একসঙ্গে জয়শীলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।' বলল মন্ত্রী ধর্মমিত্র।

এদিকে জয়শীল বুঝতে পারল যে দুটো বাঘ একসঙ্গে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার তাল করছে। সে তখন এমন ভাব দেখাল যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে। এমন ভঙ্গি করল যেন সে দেয়াল টপকে পালাবে। তা লক্ষ করে একটা বাঘ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এগিয়ে এল। সঙ্গেসঙ্গে জয়শীল তরবারি তুলে তার মাথায় আঘাত করল। বাঘের রাগ আরও বেড়ে গেল। প্রচণ্ড আক্রোশে বাঘ জয়শীলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে, সামনের পা তুলতেই জয়শীল বাঘের বুকে তরবারি ঢুকিয়ে দিল। বাঘের গর্জন পরমুহূর্তে যেন আর্তনাদে রূপান্তরিত হল। সে গোঁ-গোঁ করতে করতে একটু পেছিয়ে মাটিতে ধপাস করে পড়ে । গেল। এসব দেখে অন্য বাঘ যেন ভয় পেল। তখন জয়শীল তরবারি নিয়ে। ওই বাঘের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে গেল। বাইরে থেকে কনকাক্ষ রাজা আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন। ততক্ষণ মঙ্গলবর্মার চোখ বোজা ছিল। বাইরের লোকের আনন্দধ্বনি শুনে এবং রাগে গোঁ-গোঁ করতে করতে ফিরে যাওয়া বাঘের

আওয়াজ শুনে মঙ্গলবর্মা চোখ খুলল। খুলে দেখে একটি বাঘ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। অন্য বাঘের পাত্তা নেই। সে তখন মাথা তুলে চিৎকার করে কণকাক্ষ রাজাকে বলল, 'মহারাজ, এই তরবারিতে যে অসীম ক্ষমতা আছে সে বিষয়ে আমার আর কোনো সন্দেহ নেই। দুর্ভাগ্য আমার, আমার হাত থেকে তরবারিটা হঠাৎ খসে পড়েছিল। তা না হলে হয়তো আমার হাতের তরবারির আঘাতে বাঘ মরে যেত। আমি যা করতে পারিনি, জয়শীল তা করতে পেরেছে?'

'মঙ্গলবর্মা তুমি খুব ভাগ্যবান। তা না হলে বাঘ তোমার কাঁধে থাবা না মেরে অন্য জায়গায় হয়তো মেরে দিত।' মন্ত্রী ধর্মমিত্র যেন পরিহাস করে বলল।

'আমি তো আগেই বলেছিলাম ওই তরবারি আশীর্বাদপুষ্ট। ওই তরবারি দিয়ে জয়শীল সমস্ত জগৎ জয় করতে পারে।' খুব খুশি হয়ে সিদ্ধ সাধক বলল।

এই ধরনের কথা শুনে বিরক্ত হয়ে কনকাক্ষ রাজা বললেন, 'তরবারির শক্তিটাই বড়ো কথা নয় সেই তরবারি ধরার মতো ক্ষমতাও থাকা চাই। মঙ্গলবর্মার তো সে ক্ষমতা ছিল না।'

রাজার কথায় মন্ত্রী খুব খুশি হয়ে জয়শীলকে হাত নেড়ে ডাকল, 'জয়শীল চলে এসো। তোমার সাহসের ফলে আমাদের মঙ্গলবর্মা প্রাণে বেঁচেছে। সে যে বাঁচতে পেরেছে তারজন্য আমরা তোমায় অভিনন্দন জানাই। মঙ্গলবর্মা আমাদের সেনানায়কের ছেলে। সেনানায়ক দেশের সীমানার সেনারা ঠিকমতো পাহারা দিচ্ছে কি না দেখতে গেছেন। ফিরে এসে উনি যদি শুনতেন তার ছেলেকে বাঘে খেয়েছে তাহলে তাঁর দুঃখের সীমা থাকত না।'

জয়শীল তখনও উঁচু দেয়ালে ঘেরা ওই খাঁচার মধ্যে। তার দিকে হাত দেখিয়ে রাজা কনকাক্ষ বললেন, জয়শীল, 'যে পথে নেমে গেছ, সেই পথে কি উঠে আসবে?'

'আমার উঠে যাওয়াটা খুব একটা বড়ো সমস্যা নয়। যে বাঘটা রেগে গিয়ে ফিরে গেছে আমার উঠে যাওয়ার পর সেই বাঘ ফিরে আসতে পারে। তখন মঙ্গলবর্মার পক্ষে সেই বাঘকে ঠেকানো সম্ভব হবে না।' জয়শীল বলল।

'মঙ্গলবর্মার হাতে ইন্দ্রের বজ্র থাকলেও সে কিছুই করতে পারবে না। হাতে অস্ত্র থাকলেই হয় না। সে অস্ত্র প্রয়োগ করার মতো সাহস থাকা চাই।' সিদ্ধ সাধক বলল।

কনকাক্ষ রাজা এবং মন্ত্রী ধর্মমিত্র জয়শীলকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন। তার আগে ফিরে যাওয়া বাঘ আর যেন না আসতে পারে তার ব্যবস্থা হল। মন্ত্রী এবং রাজা জয়শীলের পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে অনেক প্রশংসার কথা বললেন। সিদ্ধ সাধক জয়শীলকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'জয়শীল, তুমি যে আমাকে সাহায্য করেছ তাই নয়, তুমি মহারাজের আশার

মশাল, রাজার ছেলে এবং মেয়ে অনেক দিন ধরে নিখোঁজ; ওদের উদ্ধার করে আনার দায়িত্ব নেওয়া তোমার পক্ষেই সম্ভব।'

'সাধক এসব কথা রাজভবনে বসে আলোচনা করা যাবে। এখন তুমি চুপ কর।' তারপর মন্ত্রী অনুচরদের নিদের্শ দিলেন মঙ্গলবর্মাকে সেখান থেকে তুলে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে।

রাজার সঙ্গে সবাই রাজভবনে গেল। পশুশালার রক্ষক মঙ্গলবর্মার কাছে গিয়ে দেখে সে ফ্যালফ্যাল করে পাগলের মতো তাকাচ্ছে। তার কাঁধের ঘা দেখে সে বলল, 'অত বেশি ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এই ঘা সারতে এক সপ্তাহের বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু আমি দুঃখ পাচ্ছি অন্য কারণে। আমাদের পশুশালায় সবচেয়ে ভালো যে বাঘ ছিল সেটাকেই জয়শীল মেরে ফেলল।

ওই বাঘটাকে ধরতে আমাদের দলের দু-জনকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। দু-জন শিকারিকে হারিয়ে একটি বাঘ পেয়েছিলাম। আর সেই বাঘ আজ মারা গেল।' বলে পশুশালার রক্ষক চোখের জল ফেলতে লাগল।

'মরা বাঘের জন্য অত দুঃখ করো না তো। এই ধরনের দুঃখ অসহ্য। এখন ভাবতে হবে জয়শীলের তরবারিতে সত্যি অতখানি ক্ষমতা আছে?' মঙ্গলবর্মা জিজ্ঞেস করল।

পশুশালার রক্ষক তার কথায় দুঃখ পেল, রাগও হল। কিন্তু সেনানায়কের ছেলে শুধু তাকে মুখ ফুটে কিছু বলল না। আবার না বলেও থাকতে পারল না । কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে বলল, 'দেখুন ওই তরবারিতে কতখানি ক্ষমতা আছে তা আমি জানি না তবে লোকটা তরবারি চালাতে যে পারে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি।'

'তাহলে তো সর্বনাশ। জয়শীলের হাতে অর্ধেক রাজত্ব চলে যাবে। শুধু কী তাই, রাজকুমারীকেও সে পেয়ে যাবে।' মঙ্গলবর্‍্মা আপন মনে বলল।

মন্ত্রী যাদের পাঠিয়েছিল। তারা এসে মঙ্গলবর্মাকে নিয়ে গেল। সে ওদের জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, রাজা ওই লোকটাকে কিছু উপহার দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে তো? নাকি যুবরাজ ও রাজকুমারীকে খোঁজার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন?

চারজনের একজন বলল, 'আমরা ওসব কিছু জানি না। তবে জয়শীলকেও রাজভবনের ভেতরে যেতে দেখলাম। তাকে সবাই খাতির করছে। সে রাজার কাছে দাঁড়িয়েছিল।'

শ্মশান পাহারাদারের ছেলে এসে বলল, 'প্রভু, মরে বেঁচে ওঠা আমার বাবাকে যে শেষ করে ফেলেছে তার কী ক্ষতি করতে পারেন আমাকে বলুন?' আমি ওর কী ক্ষতি করেছি বলুন? তাকে মন্ত্রীর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। মন্ত্রী তার কথা শুনে রাজার সঙ্গে আলোচনা করল। তারপর তাকে বলল, 'দেখ বাবা মারা গেছে বলে অত দুঃখ করছ কেন? রাজা

শ্মশান পাহারার ভার তোমাকেই দেবেন। তোমার বাবা যে কাজ করত সেই কাজ তুমি করবে। সারা দেশে যত শ্মশান আছে সমস্ত শ্মশানের পাহারাদারের ওপরে তোমার স্থান থাকবে। তোমার রোজগার এক-শো গুণ বেড়ে যাবে। প্রত্যেকেরই বাবা তো একদিন মরে। তার জন্য দুঃখ করে কী লাভ? এখন যাও।'

'আজ্ঞে যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন আপনার উপকারের কথা ভুলব না। আমার বাবা মারা গেলে দুঃখ পেয়েছিলাম। বেঁচে উঠে আবার মরে গেলে আরও দুঃখ পেয়েছিলাম। আপনি আজ আমাকে কত বড়ো পদ দিলেন।

সারা দেশের শ্মশান পাহারাদারদের চেয়ে আমি বড়ো! আনন্দে আমার বুক ভরে যাচ্ছে। বাবা থাকলে আমার এই উন্নতি দেখে কত খুশি হতেন।' শ্মশান পাহারাদারের ছেলে বলল।

মন্ত্রী ধর্মমিত্র একটু হেসে বলল, 'আচ্ছা এখন যাও বাকি কথা পরে হবে।' তারপর রাজা, মন্ত্রী ও জয়শীল রাজভবনের অন্য একটি ঘরে ঢুকে বসল।

কিছুক্ষণ ভেবে রাজা কনকাক্ষ বললেন, 'মহামন্ত্রী, এখন কী করা যায় ? যুবরাজ আর রাজকুমারীকে খোঁজার জন্য আমাদের যারা গিয়েছিল তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। এখন কি জয়শীলকে পাঠানো যায়?'

মন্ত্রী জয়শীলের দিকে একবার তাকিয়ে কী যেন বলতে যাবে এমন সময় সিদ্ধ সাধক বলে উঠল, 'মহারাজ, যুবরাজ ও রাজকুমারীকে খোঁজার দায়িত্ব সাধারণ লোকের উপর দিয়ে কোনো লাভ নেই। শুধু দৈহিক ক্ষমতা থাকলেই ওদের উদ্ধার করে কেউ আনতে পারবে না। ওদের আনতে হলে চাই দৈহিক শক্তি, মনের সাহস আর অলৌকিক জ্ঞান। এসব না থাকলে যে ওদের উদ্ধার করা যাবে না তা প্রমাণ হয়ে গেছে। এর আগে যারা গিয়েছিল তাদের অনেকেরই দেহবল ছিল। অস্ত্রবলও কয়েক জনের ছিল না তা নয়। কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ তাদের অলৌকিক জ্ঞানের অভাব। তাই বলছি জয়শীলের সঙ্গে আমাকেও ওদের খোঁজার জন্য যেতে দিন। আমাকে এই অনুমতি দিলে আমার ধারণা আমি এবং জয়শীল সফল হব।'

জয়শীল কিছুটা অধৈর্য হয়েই যেন মাথা নেড়ে বলল 'মহারাজ, আমার একটি নিবেদন আছে।'

'বল, বল কী বলতে চাও। আমি তোমার কথা শুনতে চাই।' রাজা কনকাক্ষ বললেন।

'মহারাজ, আমি আমার নিজের দেশ ছেড়ে আপনার দেশে এসেছি, একটি চাকরি পাওয়ার আশায়। চাকরিটা পেলেই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতাম।' জয়শীল বলল।

কনকাক্ষ মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কী যেন চোখে চোখে বললেন। মন্ত্রী জয়শীলকে বলল, 'যে মুহূর্তে তুমি বাঘের মোকাবিলা করেছ সেই মুহূর্ত থেকেই আমার রাজা তোমাকে

চাকরি দিয়েছেন। নির্দেশমতো কাজ করা কি তার অধীনস্থ কর্মচারীর কর্তব্য নয়? যেকোনো কর্মচারীর ধর্ম তো এই, তাই না?'

'শুধু ধর্মই নয়, নীতিও। বলুন, কী করতে পারি?' জয়শীল বলল।

'রাজার নির্দেশ, যুবরাজ ও রাজকুমারীকে খুঁজে, তাদের উদ্ধার করে তুমি নিয়ে এসো।? মন্ত্রী বলল।

জয়শীল মাথা নেড়ে সম্মত হল। তারপর কী যেন বলতে যাবে এমন সময় রাজার একজন অনুচর একটি মুক্তোর হার ও ভাঙা তরবারি এনে বলল, 'মহারাজ, এগুলো মনে হচ্ছে যুবরাজ ও রাজকুমারীর। একটা গাছের নীচে একজন ব্যাধ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তার কাছেই পেলাম।

পাঁচ

কনকাক্ষ মহারাজ ও মন্ত্রী ধর্মমিত্র অনুচরের আনা ওই মুক্তোর হার দেখে অবাক হয়ে গেলেন। মন্ত্রী মুক্তোর হার নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে দেখে বলল, 'মহারাজ, এই হার কি যুবরাজের হতে পারে? এই ধরনের তরবারি কি যুবরাজের কাছে ছিল ?'

কনকাক্ষ রাজা ওই দুটিকে বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে মন্ত্রীকে বললেন, 'সন্দেহ যে আমার মনেও জাগছে না তা নয়। এই দুটো ঠিক এক জায়গায় পড়ে থাকাতে সন্দেহ জাগছে বই কী। মনে হচ্ছে এগুলো ওদেরই। তবে নিঃসন্দেহে এ-কথা বলতে পারছি না।'

'তাহলে এ দুটো ভালো করে পরীক্ষা করিয়ে দেখতে হবে মহারাজ। রাজকুমারীর প্রধান পরিচারিকা মল্লিকা হয়তো এই হার দেখে চিনতে পারবে। হারের ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেলে তরবারি যে কার বুঝতে দেরি হবে না।' বলল মন্ত্রী।

রাজার নির্দেশে একজন অনুচর তৎক্ষণাৎ চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মল্লিকাকে নিয়ে সে ফিরে এল। রাজকুমারী হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে মল্লিকার দুঃখের আর সীমা ছিল না। তার মনে ভেঙে গিয়েছিল। শরীরও ভাঙছিল। কোথায় যে সেই হার পাওয়া গেছে তা না জানিয়ে রাজা সেটিকে মল্লিকার হাতে দিয়ে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে, এই হার কেউ ভুলে ফেলে গেছে। এটা নিয়ে যাও। খোঁজ করে দেখ এটা কার। খোঁজ পেলে যার হবে তাকে দিয়ে দাও।'

মল্লিকা ওই হার হাতে নিয়ে প্রতিটি মুক্তো পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে একটি মুক্তো দেখে চমকে উঠে আতনাদ করে ওঠে, 'মহারাজ এই হার রাজকুমারীর। উদ্যানে বেড়াতে যাওয়ার সময় এই হার পরে বেড়ানো রাজকুমারীর শখ ছিল। শেষ যখন তাঁকে দেখেছি তখন তার গলায় এই হার ছিল।'

মল্লিকার কথা শুনে রাজার মন কেঁদে উঠল। কী যেন বলতে গিয়েও তিনি আর বলতে পারছিলেন না।

এই অবস্থায় মন্ত্রী ধর্মমিত্র মল্লিকাকে বলল, 'এই ধরনের হার ধনী পরিবারের মেয়েরাও তো পরে, এটা যে রাজকুমারীর তা তুমি জানলে কী করে?'

মল্লিকা মন্ত্রীর কাছে এসে ওই হারের দুটো মুক্তো দেখিয়ে বলল, 'এই দুটো মুক্তো ভেঙে গেছে। একবার রাজকুমারী আমার উপর ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। কেন তা জানি না। রাগের মাথায় উনি এই হার আমার দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন। আমি ঝট করে সরে গিয়েছিলাম। হার লেগেছিল একটি গাছে। তারপর থেকে এই দুটো মুক্তোতে এই ধরনের দাগ হয়ে যায়। রাজকুমারী ভেবেছিলেন, রাজস্বর্ণকারকে দিয়ে এই দুটো মুক্ত সরিয়ে ভালো দুটো মুক্তো হারে লাগিয়ে নেবেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না।'

মল্লিকার জবাব শুনে রাজা ও মন্ত্রীর বিশ্বাস হল যে ওই হার রাজকুমারীর ছাড়া অন্য কারোর নয়। তারপর প্রশ্ন ওঠে তরবারিটি সম্পর্কে। সেটি যে যুবরাজ কাঞ্চনবর্মারই, সে ব্যাপারে কারও মনে সন্দেহ জাগেনি। তবে তরবারিটি যে কী করে ভাঙল, এই প্রশ্ন সকলের মনেই জেগেছিল।

কনকাক্ষ রাজা তরবারিটিকে জয়শীলের হাতে দিয়ে বললেন, 'জয়শীল এই ভাঙা তরবারি দেখে অনুমান করতে পার যে এটা কী করে ভেঙেছে?'

জয়শীল ভাঙা তরবারিটি হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখে বলল, 'মহারাজ, মনে হচ্ছে যুবরাজ কারও বিরুদ্ধে লড়বার সময় অথবা ধস্তাধস্তি করার সময় এটি ভেঙে গেছে। তবে তরবারিটি যে শত্রুর দেহে ঢুকে ভেঙেছে তা নয়, পাথরে আঘাত পেয়ে হয়তো ভেঙে গেছে। গাছে লেগেও ভেঙে যেতে পারে।'

'তাহলে তো ভাঙা তরবারির অন্য অংশ ধারে কাছে কোথাও পড়ে থাকবে। ভালো। কথা, সেই ব্যাধ কোথায়?' বলে রাজা এগুলি যে এনেছিল তার দিকে তাকালেন।

অনুচর এগিয়ে এসে মন্ত্রীকে বলল, 'আজ্ঞে, ব্যাধ ঠিক সুস্থ অবস্থায় নেই। মাঝে মাঝে ভুল বকছে। ওর চাউনি দেখে মনে হচ্ছে পাগল। কখনো কখনো চিৎকার করে বলছে, দু-পা ওয়ালা ভয়ংকর জীব। মনে হচ্ছে ভূত চেপেছে। ওর বন্ধুরা ওঝা ডেকে ভূত ছাড়াচ্ছে। তরবারি ও হার দেখে মনে হল এগুলো যুবরাজ ও রাজকুমারীর। তাই আমি নিয়ে চলে এলাম।'

কথাগুলো শুনে সিদ্ধ সাধক বলল, 'মহারাজ, মহাকালের পরিবারের কয়েকটি পিশাচ এক-এক সময় এক-একটা রূপ ধরে বেরিয়ে পড়ে। আমি ওই ব্যাধের মাথায় যে ভূত

চেপেছে সেই ভূতকে তাড়াতে পারি। ব্যাধ সুস্থ হলে ঠিক জানা যাবে যে সে কোত্থেকে এগুলো পেল। এখন আমাকে আর জয়শীলকে ওই ব্যাধের কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন।'

যুবরাজ ও রাজকুমারী উধাও হওয়ার পেছনে এই ব্যাধের কি কোনো কারসাজি আছে? মন্ত্রীর মনে এই প্রশ্ন জাগল। কনকাক্ষ রাজার মনেও যে নানা প্রশ্ন জাগেনি তা নয়। রাজা ও মন্ত্রী, কী করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে জয়শীল বলল, 'মহারাজ, কোন গাছের নীচে এগুলি পাওয়া গেছে, আগে সেখানে যাওয়া দরকার মনে করছি। ব্যাধের মাথায় ঠিক কোনসময় থেকে ভূত চাপল তাও সেখানে গিয়ে জানতে হবে। এখান থেকে সব জানা যাবে না মহারাজ।'

রাজা ও মন্ত্রী জয়শীল ও সিদ্ধ সাধককে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। ওদের যাওয়ার জন্য ঘোড়া তৈরি ছিল। ওরা ঘোড়ায় চড়ে রওনা দিল। ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সেই অনুচর যে মুক্তোর হার ও তরবারি এনেছিল। গভীর বনে ওরা ঢুকল। বন থেকে অরণ্যে। সেই অরণ্যের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটি পাহাড়।

একটি বিরাট গাছের নীচে দশ-বারো জন ব্যাধ বসেছিল। ওরা সেই ভূতে পাওয়া ব্যাধকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। ওঝা তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, আগুনে কী যেন ছড়াচ্ছে, ধোঁয়া উঠছে তার এক হাতে লাঠি অন্য হাতে ঝাঁটা । মাঝে মাঝে লাফাতে লাফাতে সে বলছে, 'হুম, হট হট, ফট ফট।'

জয়শীল ও সিদ্ধ সাধক একটু দূরেই ঘোড়া থেকে নেমে গেল। সিদ্ধ সাধক চিৎকার করে বলল, 'থামুন!'

ওঝা সাধকের দিকে তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁক কটমট করে কী যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় রাজার অনুচর তাকে বলল, 'ওহে, ওভাবে কার দিকে তাকাচ্ছ ? জানো, ইনি রাজপ্রাসাদের তান্ত্রিক।'
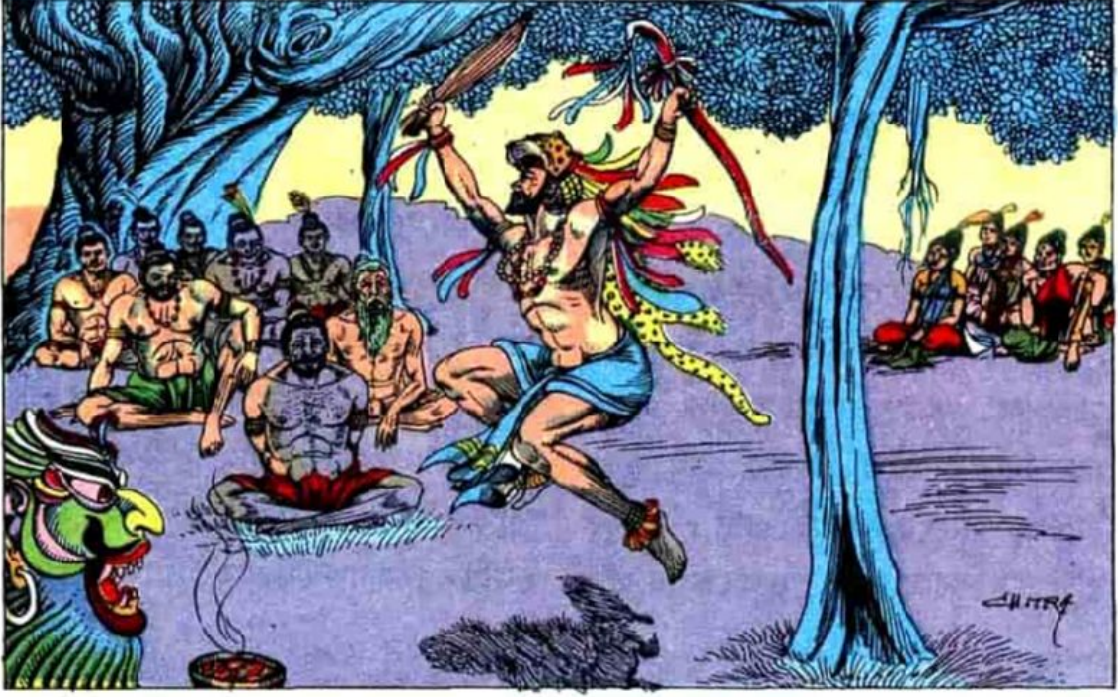
অনুচরের কথা শুনে ওঝা একটু দমে গেল। সাধকের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগল। সাধক এক-পা এক-পা করে এগিয়ে গিয়ে ওঝার কাছে গিয়ে বলল, 'কি হে, ওঝাগিরি করছ? উহু, ভূত তাড়াচ্ছ? আমার মন্ত্রশক্তি বলে তোমাকে এই কড়ে আঙুলের ডগায় নাচাতে পারি জানো।' বলার সময় সিদ্ধ সাধকের চোখ লাল হয়ে উঠেছিল। মুহূর্তে ওঝা কেমন যেন হয়ে গেল। 'আমাকে ক্ষমা করুন,' বলে সে সাধকের পায়ে পড়ে গেল। সাধক পা দিয়ে তাকে সরিয়ে ওই ভূতে পাওয়া ব্যাধের কাছে। গেল। তাকে বলল, 'কী হে, ভীম, তোমাকে যে জীব ভয় পাইয়ে দিয়েছে তাকে এই যুবক জয়শীল মেরে ফেলেছে। এখন আর তোমার কোনো ভয় নেই, ওঠো, দাঁড়াও।'

ওই ব্যাধ সাধকের কথা শুনতে শুনতে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সেখানে যারা ছিল তাদের একজন সাধককে বলল, ‘এর নাম ভীম নয়, রাম।'

এই মুহূর্ত থেকে এর নাম হবে ভীম। আমার মুখ থেকে যা বেরোবে তাই হবে। জয়শীল, যে জীবটিকে তুমি মেরেছ তার রক্ত তোমার তরবারিতে লেগে আছে। সেটি দেখাও।' বলতে বলতে জয়শীলের তরবারি তার খাপ থেকে বের করে তার ডগায় লেগে থাকা লাল রং আঙুলে তুলে ভীমের কপালে সে লাগিয়ে দিল।

তা দেখে অবাক হয়ে ব্যাধ বলল ‘তাহলে ভয়ংকর ওই জীবটিকে মেরে ফেলা হয়েছে? ওই মৃতদেহটি কোথায়?’ এতক্ষণ জয়শীল কোনো কথা বলেনি। সব কিছু লক্ষ করছিল।

সাধকের কথা শুনছিল। সাধক যেভাবে ব্যাপারটাকে কচলাচ্ছে তাতে যেকোনো মুহূর্তে অবস্থা অন্যদিকে ঘুরে যেতে পারে। তখন আবার তাকেই শক্ত হাতে তরবারি ধরতে হবে।

‘ওরে বোকা ব্যাধ, ভূতের মৃতদেহ কী আর থাকে? তুই যেটাকে ভয়ংকর জীব বলছিস সেটি সত্যিকারের ভয়ংকর জীব নয়। প্রকাণ্ড একটি ভূত। ওকে শেষ করা হয়েছে। তোর আর কোনো ভয় নেই। এখন বল, এই হার, তরবারি কোথায় পেলি? ওই ভয়ংকর জীবকে দেখলি কোথায়।'

ব্যাধের ভয় তখনও কাটেনি। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে সিদ্ধ সাধককে বলল, 'এগুলো বোধ হয় ওই ভূতের কাছেই পেয়েছি। ওই ভূতটাই ওগুলো নিয়ে গেছে। এগুলোর জন্যই কি ওকে মেরে ফেলা হয়েছে?’

তাখন রাজার অনুচর বলল, 'ওরে পাগল, এগুলো ভূত নিয়ে যায়নি।

আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। এগুলো আমি যখন তোমার কাছে নিচ্ছিলাম তখন তুমি আমার দিকে পাগলের মতো তাকাচ্ছিলে। মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিলে। তোমার হয়তো এসব কিছুই মনে নেই। বিশ্বাস না হয় তোমার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করো।'

এই কথা শুনে ব্যাধের কাছে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা বলল, ‘রাজার লোক ঠিক কথাই বলছে। তোমার মাথায় ভূত চেপেছিল।'

আপনজনের মুখে যা শুনল তাতে রামের ভয় কেটে গেল। সে বলল, ‘আমার মনে হচ্ছে রাজকুমার ও রাজকুমারীকে ওই ভূত তুলে নিয়ে গেছে। ও ছাড়া আর কেউ এই কাজ করতে পারে না।'

এই ধরনের কথাবার্তা শুনে জয়শীল অধৈর্য হয়ে সিদ্ধ সাধককে বলল, 'সাধক অহেতুক আমরা সময় নষ্ট করছি। আমাদের মনে রাখা উচিত আমরা এখানে কেন এসেছি। রাজকুমার ও রাজকুমারীকে কারা নিয়ে গেছে তা আমাদের খোঁজ করাই প্রধান কাজ। আগে কাজ শুরু করতে হবে, তারপর সময় থাকলে এদের সঙ্গে আলাপ করা যাবে। এখন চল আর এখানে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।'

‘ওহে ভীম, ঠিক করে মনে করে দেখ তো, তুমি এসব কোথায় পেলে? ঠিক কোন জায়গায় পড়েছিল বল তো।'

ব্যাধ একটু গলা ঝেড়ে নিয়ে বলতে আরম্ভ করল, ‘অন্যদিনের মতো সেদিনও অন্ধকারে শিকার করতে বেরিয়েছিলাম। মনে হল, ওই গাছের ডালে একজোড়া বনমুরগি বসে আছে। আমি তির ছুঁড়লাম। তিরটি ওর বুকে বিদ্ধ হয়ে ডানায় বিদ্ধ হল। সে ওই তিরবিদ্ধ ডানা নিয়ে উড়তে গেল। উড়তে না পেরে সে ওই ঝোপের মধ্যে পড়ে গেল।'

‘ওই ঝোপ মানে? কোন ঝোপ? চল তো দেখি।' জয়শীল বলল।

ব্যাধ কাছের একটি ঝোপের কাছে নিয়ে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে জয়শীল ব্যাধকে জিজ্ঞেস করল, 'এখানেই ?' ব্যাধ মাথা নেড়ে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

হঠাৎ ঝোপের ভেতর ঢুকে সিদ্ধ সাধক চিৎকার করে উঠল 'জয়শীল, এই গভীর অরণ্যে ঢোকা আমার সার্থক হয়েছে। এই দেখ, তালপাতার পুঁথি। জয়, মহাকাল!' সে বেরিয়ে এল।

ছয়

সিদ্ধ সাধক তালপাতার পুঁথি হাতে পেয়ে খুব খুশি হল। ওইরকম একটা জায়গায় ওই পুঁথি পেয়ে জয়শীল অবাক হয়ে গেল। সিদ্ধ সাধকের খুশি খুশি ভাব বেশিক্ষণ রইল না। পুঁথির দু-একটা পাতা ওলটাতেই তার সেই খুশিভাব উবে গেল। সেই পুঁথির লেখা দেখে সিদ্ধ সাধক বলল, 'এটা কোন ভাষা? এটা কোন লোকের অধিবাসীদের ভাষা? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এখন মনে হচ্ছে এগুলো ঠিক তালপাতা নয়। পদ্মপাতার মতো কি যেন একটা পাতা। পাতাগুলো যত্ন করে কাটা হয়েছে। প্রত্যেকটা পাতার মাপ সমান।

'সাধক, কোন পাতা সেটা বড়ো কথা নয়। যা লেখা আছে তা কি পড়া যাচ্ছে?' জয়শীল জিজ্ঞেস করল।

সিদ্ধ সাধক মাথা নেড়ে বলল, 'এটা কোনো দেবভাষা। অথবা রাক্ষসদের ভাষাও হতে পারে। ওদের সাহায্য ছাড়া এটা তো পড়া যাবে না। কনকাক্ষ রাজার অধীনে যেসব পণ্ডিতরা আছে তাদের মধ্যে কেউ এই ভাষা জানে কি না খোঁজ নিয়ে দেখলে হত। অনেক রাজার অধীনে বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিত থাকেন।

সাধকের হাত থেকে পুঁথিটা নিয়ে জয়শীল নেড়েচেড়ে দেখে বলল, 'আচ্ছা, ব্যাধ যে বিচিত্র দু-পা ওয়ালা জীবের কথা বলছিল এটা হয়তো সেই-ই ফেলে গেছে। কিন্তু আমরা তো যাচ্ছি যুবরাজ ও রাজকুমারীর খোঁজ করতে। এই পুঁথির ভাষা উদ্ধার করলে আমাদের কাজের কি কোনো সাহায্য হবে? কী হবে এটা?' বলে সে ওই পুঁথি ঝোপে ফেলে দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

ফেলে দিতে দেখে সিদ্ধ সাধক হা-হা করে উঠে বলল, 'এ কী করলে জয়শীল? কী আছে তা না জেনে ফেলে দেওয়া কি উচিত? হয়তো এটা ধরেই মহাকালের বংশ পরিচয় জানা যাবে। কে বলতে পারে, এই পুঁথির সূত্র ধরে যুবরাজ ও রাজকুমারীর সন্ধান করতে হয়তো পারব।' বলে ছুটে গিয়ে সাধক ঝোপ থেকে ওই পুঁথি কুড়িয়ে আনল।

জয়শীল রেগে গিয়ে সাধককে বলল, 'তোমার আসল উদ্দেশ্য হল মহাকালের বংশপরিচয় জানা। বনে-জঙ্গলে পড়ে থাকা পুঁথির প্রতি তোমার টান দেখে আমি অবাক হচ্ছি। যুবরাজ বা রাজকুমারীর ব্যাপারটা তোমার কাছে গৌণ। তাই না?'

এই প্রশ্ন শুনে সাধক কিছুটা দমে গিয়ে বলল, 'জয়শীল, আমি এই ভীমের মাধ্যমে ঠিক জানতে পারব ওই দু-পা ওয়ালা জন্তুটাই যুবরাজ ও রাজকুমারীকে নিয়ে গেছে।'

'দু-পা ওয়ালা জন্তু বলতে যে মাথা-মুণ্ডু কি বোঝ আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।' জয়শীল বেশ রেগে গিয়েই তাকে বলল।

সাধক ভীমের কাঁধে হাত রেখে বলল 'শোনো হে যুবক, তোমার কোনো ভয় নেই। ওই যে জন্তুটা এসেছিল না, ও তোমাকে কী বলেছিল? ওই দু-পা ওয়ালা জন্তুটাকে তুমি কতদূর থেকে দেখেছ? তোমার কাছে এসেছিল কি? তোমার ঠিক মনে পড়ছে সব কিছু? জন্তুটা কোন ভাষায় কথা বলেছিল?'

ভীম ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে সাধককে বলল, 'এর কথা বলা পর্যন্ত কি আমার জ্ঞান ছিল! মুরগিটাকে ঝোপ থেকে তোলার জন্য আমি একটা টান দিয়েছিলাম ঠিক সেইসময় একটা শব্দ হল। মুখ ঘোরাতেই চোখে পড়ল বিরাট দু-পা ওয়ালা জন্তু। মানুষের মতো পা, কিন্তু দেহটা জন্তুর মতো। ওকে দেখেই আমি জ্ঞান হারিয়েছি। তারপর যে কী হল তা কিছুই জানি না।'

'তুমি যে বুনো মুরগিটাকে মেরেছিলে, কখন মেরেছিলে? কীভাবে মেরেছিলে? সেটা কোথায় গেল?' জয়শীল বলল।

'ওই মুরগিটাকে হয়তো পাহাড় দেবতা নিয়ে গেছে। জানি তো পাহাড় দেবতার কয়েকটা বিশেষ দিক আছে। সব কাজ ঠিক ঠিক ভাবে ঠিক সময়ে না হলে উনি ভীষণ চটে যান। সাতসকালে মুরগিটাকে মেরে এ খুব খারাপ কাজ করেছে। সেইজন্যই হয়তো পাহাড় দেবতা এর উপর রুষ্ট হয়েছে।' ওঝা বলল।

ওঝার মুখ থেকে এই কথা শুনে জয়শীল তার দিকে বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে সাধককে বলল, 'মনে হচ্ছে এখানে দাঁড়িয়ে আর কিছু হবে না। এমন কোনো খবর নেই যে কনকাক্ষ রাজার কাছে গিয়ে আমরা বলতে পারি। তার চেয়ে এই অঞ্চলের আশেপাশে পাহাড়ের এধার-ওধার ঘুরে কিছু দেখলে হত। পাঁচ-সাত দিন এখানে ঘুরলে হয়তো কোনো কিছুর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।'

'মন্দ বলনি জয়শীল। আশেপাশে ঘুরলে হয়তো কাজের কাজ কিছু হতে পারে।'

সাধক বলতে বলতে পুঁথির পাতা ওলটাতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বলল, 'বুঝলে জয়শীল, এই পুঁথিটা যে ফেলে গেছে সেই যদি যুবরাজ ও রাজকুমারীকে নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে নিশ্চয়ই রাক্ষস। অথবা দেবতা। কোনো রকমে এই পুঁথির ভাষা যদি পড়া যেত! কিছুতেই বুঝতে পারছি না এতে কী লেখা আছে।'

‘সাধক এ-কথা তো শুনেছি একবার। যেই হোক আমার এই তরবারি এবং কবজির জোরে আমি তাদের পরাজিত করে যুবরাজ এবং রাজকুমারীকে উদ্ধার করব। আমি কনকাক্ষ মহারাজের মুখে হাসি ফোটাবই।' জয়শীল বলল।

ওদের কথা শুনে রাজকর্মচারী জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে আমি এখন ফিরে গিয়ে রাজাকে কী বলব।'

জয়শীল কী একটা বলতে যাবে এমন সময় তাকে বাধা দিয়ে সাধক বলল, ‘শোনো, রাজাকে বলবে যে জায়গায় ভাঙা তরবারি ও মুক্তোর মালা পড়েছিল সেই জায়গায় একটা মহামূল্যবান পুঁথি পাওয়া গেছে। আর বলবে আমরা কিছুদিনের মধ্যেই যুবরাজ ও রাজকুমারীকে যেকোনো ভাবে উদ্ধার করে ফিরছি।'

তার কথা শুনে জয়শীল মনে মনে হাসল।

তারপর দু-জনে আরও গভীর বনে ঢুকে গেল। ইতিমধ্যে অরণ্য প্রান্তের গ্রামের মানুষ ওদের খবর পেয়ে আতঙ্ক ও আশঙ্কায় নানারকম কথা বলাবলি করছিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার আর একটি কারণ হল খেতে পাহারা দেবার সময় একটি চোদ্দো বছরের ছেলে দূর থেকে একটি হাতিকে যেতে দেখল। সে পাহারা দিচ্ছিল ভুট্টার খেত। ভুট্টার খেতে হাতি ঢুকলে কিছুক্ষণের মধ্যেই খেত পরিষ্কার করে চলে যাবে।

ছেলেটির বয়স চোদ্দো হলেও তার সাহস ছিল। মাচায় বসে হাতিকে দেখে প্রাণের ভয় না করে মাচা থেকে নেমে সে গ্রামের মানুষকে ডাকতে গেল সে বুঝেছিল তার একার পক্ষে হাতিকে তাড়ানো সম্ভব নয়। আবার সে ভাবল, গ্রামবাসীদের ডেকে আনার আগে দু-একটা পাথর হাতির দিকে ছুঁড়ে মারলে কেমন হয়। হয়তো হাতি ভয় পেয়ে অরণ্যে ঢুকে যাবে।

এই কথা ভেবে সে খুব জোরে একটি পাথর হাতির দিকে ছুড়ল। পাথরটা সোজা গিয়ে হাতির গায়ে লাগল। সঙ্গেসঙ্গে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেল। একটি চেহারা হাতির পিঠে হঠাৎ যেন গজিয়ে উঠল। সে চিৎকার করে বলল, ‘পাথরটা কে ছুঁড়েছে রে? আমাকে এখনও চিনতে পারিসনি?'

এতক্ষণ সে যেটাকে হাতি ভেবেছিল কাছে আসতে দেখল সেটা হাতি নয়। ভয়ংকর জীব।

তারপর সে কী হুংকার। ছেলেটি ওই হুংকার শুনে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। তার হাত-পা অবশ হয়ে গেল। সে আর নড়তে পারল না। সেখানেই পড়ে রইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতিটি মাচার কাছাকাছি এল। তখন হাতিটিকে হাতির মতো লাগছিল না। তার গোটা শরীর যেন ঢাকা ছিল বড়ো বড়ো মাছের আঁশে। সেই হাতির

উপর যে বসেছিল তার মাথাটা দেখে মনে হচ্ছিল কুমিরের মাথা। তার গায়ের চামড়া ছিল কুমিরের চামড়া।

এই অদ্ভুত ধরনের জীবটিকে দেখে চোদ্দো বছরের ওই চাষির ছেলেটি ভয়ে কাঠ হয়ে রইল। তার দিকে তাকিয়ে ওই জীবটি বলল, 'শোন রে ছেলে, তুই অত ভয় পাচ্ছিস কেন। তোর কোনো ভয় নেই। তুই সোজা গ্রামে যা। আমার জন্য খাবার নিয়ে আয়। আর শোন, যদি ভালো বৈদ্য থাকে নিয়ে আয়। শল্য চিকিৎসক হলে আরও ভালো হয়। একটা তরবারির টুকরো শরীরে গেঁথে গেছে। সেটিকে টেনে বের করে প্রাণে বাঁচাতে হবে। যা বলছি তাই কর।'

চাষির ছেলে ভয়ে কাঁপতে লাগল। তার কথা শুনে, গ্রামের দিকে যাওয়ার শক্তি তার ছিল না। তার ওই অবস্থা দেখে সেই বিচিত্র চেহারার জীব ছেলেটিকে ধরে তুলে আবার মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিল। তখন যেন ছেলেটি অনেক শক্তি পেল। সে এক নিশ্বাসে ছুটে গ্রামের ভেতরে ঢুকে গেল।

গ্রামের মুখে একটি গাছের নীচে বসে কয়েক জন গল্প করছিল। তাকে ওইভাবে ছুটে আসতে দেখে ওরা জিজ্ঞেস করল, 'কী রে খোকা, অত ছুটছিস কেন? কী হয়েছে?'

ছেলেটি থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে যা যা ঘটেছিল বলল। ওখানে যারা ছিল তারা কেউ এর কথা বিশ্বাস করল না। দু-একজন ভাবল ছেলেটির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ঠিক সেইসময় গ্রামের মোড়ল ওইদিক দিয়ে যাচ্ছিল। সে ছেলেটির কথা শুনে বলল, 'এরকম হতে পারে। আমি নিজে কত রকমের হাতি দেখেছি। শুধু হাতি নয়, দুটো মাথার সিংহও দেখেছি। তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না আমি আমার জীবনে দশটি মাথার মানুষও দেখেছি।'
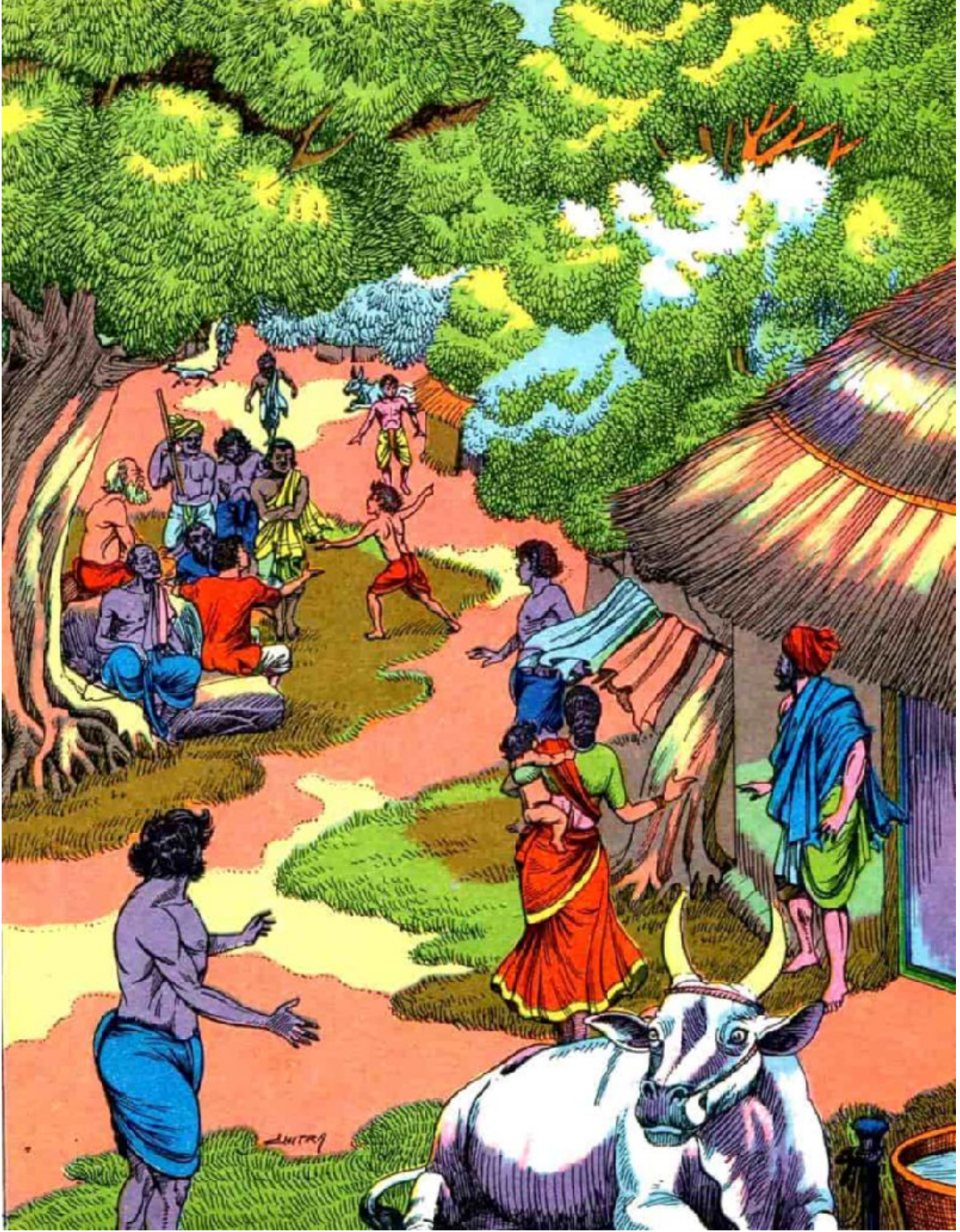
‘সে না-হয় দেখেছেন। কিন্তু এখন কী করা যায়? এমনও তো হতে পারে ওই বিচিত্র জীবটি আমাদের সবাইকে শেষ করে ফেলার জন্য এগিয়ে আসছে। তা ছাড়া হাতি যদি একবার ভুট্টার খেতে ঢোকে তাহলে কী আর রক্ষে থাকবে?’ ওদের মধ্যে একজন বলল।

'হাতির পিঠে বসে, আমাদের এদিকে এসে ডেকে, আনতে বলছে কাকে?

না শল্য চিকিৎসককে। তাহলে নিশ্চয় ব্যাপারটা সহজ নয়। ভাঙা তরবারি তার দেহে গেঁথে আছে। বিচিত্র জীব যদি হয়ে থাকে তাহলে সে থাকে কোথায়? কার শরীরে ভাঙা তরবারি ঢুকে গেঁথে আছে। এসব কিছু ভাববার কথা।' অন্য একজন বলল।

ইতিমধ্যে সেখানে হাজির হল ওই গ্রামের এক বৈদ্য। নাম চরকাচারি।

ওদের কথাবার্তা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনে তার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। এমন সময় কয়েক জন তাকে বলল, 'এই যে চরকাচারি মশাই, এতদিনে বোধ হয় একটা ভালো মওকা পেয়েছেন। যান চিকিৎসা করে আসুন। মোটামুটি কিছু হবে।'

'তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে। মানুষের চিকিৎসা করতে পারি বলে কি রাক্ষসের চিকিৎসাও করতে হবে? তা ছাড়া যা শুনলাম তাতে তো মনে হচ্ছে এটা ওই শল্য চিকিৎসকের কাজ। কাটাকুটি করে আমাদের গ্রামের নাপিত বীরনারায়ণের খুব নামডাক হয়েছে। ও যদি কাটাকুটি করে ভাঙা তরবারি বের করতে পারে তখন না হয় আমি ওষুধ দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারি কিন্তু কাটাকুটি করতে তো পারব না।'

তৎক্ষণাৎ দু-জন লোক ছুটে গিয়ে বীরনারায়ণকে ডেকে আনল। সে ওদের কথা শুনে আর্তনাদ করে বলল, 'তোমরা কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও? ওই রাক্ষসের শরীর থেকে কাটাকুটি করে আমি ভাঙা তরবারি বের করব? আমার কি এতটা শক্তি আছে?'

'থাক বা না থাক সেসব বিচার পরে হবে। আগে তোমার কাটাকুটি করার অস্ত্রগুলো নিয়ে এগিয়ে চল। আমাদের যেতে দেরি হলে ওইদিকে ভুট্টার খেত পরিষ্কার হয়ে যাবে। চল আর দেরি নয়।' বলল গ্রামের মোড়ল।

গ্রামের লোকগুলো লাঠি, বল্লম, তরবারি নিয়ে ওইহাতি যেখানে ছিল সেদিকে দল বেঁধে এগিয়ে আসতে লাগল। ওদের ওই অবস্থায় আসতে দেখে ওই বিচিত্র জীবটি হাতিকে খোঁচা মারল হাতি হনহন করে ওই গ্রামবাসীদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

সাত

হাতির পিঠে না-মানুষ না-কুমির গোছের ওই বিচিত্র লোকটিকে দেখে গ্রামের লোক ভীষণ ভয় পেল। কিছুক্ষণ এরা থমকে দাঁড়াল। ওদের পা চলছিল না। জীবনে এই প্রথম এই ধরনের ভয়ংকর প্রাণী দেখে ওরা ঠিক করতে পারল না পালাবে না আক্রমণ করবে। এমন সময় সেই ভয়ংকর লোকটা বলে উঠল, 'তোমাদের মধ্যে যে পালাবে তার ক্ষতি করব। যে দাঁড়িয়ে থাকবে তাকে কিছু করব না।

তার কথা শুনে গ্রামবাসীরা অবাক হল। ওদের ভয় একটু কমল। যতই ভয়ংকর দেখাক, কথা শুনে মনে হল, হাতির পিঠে যে আছে সে মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীব নয়।

ওরা এই ধরনের কথা ভাবছিল। হাতির পিঠে বসা লোকটা বলল, 'তোমাদের মধ্যে বড়ো কে? তোমরা কাকে মানো? ওই মাচার উপর যে ছিল সে কী তোমাদের গ্রামের ছেলে? ওকে বলেছিলাম আমার জন্য ভালো কিছু খাবার আনতে। একজন বৈদ্যকেও আনতে বলেছিলাম। কিন্তু তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে তোমরা আমাকে আক্রমণ করতে আসছ। তা না হলে তোমাদের হাতে লাঠি সড়কি থাকবে কেন?'

ওর কথা শুনে গ্রাম প্রধানের মন থেকে ভয় টা কেটে গেল। সে ভাবল, দেখতে ভয়ংকর হলেও আচার আচরণে, কথাবার্তায় লোকটা আমাদেরই মতো মানুষ। তাই ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তারপর সে ওই লোকটাকে জোড়হাত করে, নমস্কার করে, এগিয়ে হাতির কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'আজ্ঞে কুমির মশাই, ক্ষমা করুন। আপনাকে যে কী নামে ডাকব ভেবে পাচ্ছি না। যাই হোক যে ছেলেটির কথা আপনি জিজ্ঞেস করছেন সেই ছেলেটি আমাদেরই গ্রামের ছেলে। আপনি ওকে যে কথা বলেছেন সেই সেই কথা আমাদের জানিয়েছে। কিন্তু তার মুখে শুনলাম, বিরাট হাতি, বিচিত্র ভয়ংকর লোক আমাদের গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। এই কথা শুনে আমরা ভয়ে, আতঙ্কে কী করব কিছুই ভেবে পাইনি। নানা কথা ভেবেছি। আমরা ভেবেছিলাম এই অরণ্যে কত রকমের ভয়ংকর জীব আছে। তাই আমরা ভয় পেয়ে আমাদের ফসল রক্ষা করার জন্য লাঠি সড়কি নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসেছি। আপনি তো জানেন অনেক সময় হাতিও দল বেঁধে এসে সমস্ত ফসল নষ্ট করে দিয়ে চলে যায়।'

হাতির পিঠে বসে থাকা লোকটা হাতির মাথায় চাপড় মেরে, মাথা উঁচু করে চিৎকার করে বলল, 'ওরে এই গ্রাম প্রধান, তুমি অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলছ। কিন্তু এখনও আমার প্রশ্নের জবাব আমি পাইনি। আমি জানতে চেয়েছি, আমি যে খাবার ও বৈদ্যকে চেয়েছিলাম তার ব্যবস্থা কী হল? আমার প্রশ্নের সরাসরি জবাব চাই।'

ওর রাগ দেখে গ্রাম প্রধান একটু পেছিয়ে বলল, 'আজ্ঞে আপনি যা চেয়েছেন তার ব্যবস্থা হচ্ছে।'

হাতির পিঠের লোকটা নিজের শরীরের ভেতরে যে অর্ধেক তরবারি ঢুকেছিল সেটির দিকে একবার তাকিয়ে কিছুক্ষণ কষ্ট এবং যন্ত্রণা পাওয়ার মতো মুখভঙ্গি করে গ্রামবাসীদের দিকে ফিরে বলল, 'কোথায় বৈদ্য ?'

গ্রাম প্রধান চতুর ছিল। সে হাতের লাঠি তৎক্ষণাৎ পেছনের দিকে তুলে বলল, 'ওরে, এই তোদের মধ্যে দু-একজন ছুটে গ্রামে যা। তাড়াতাড়ি খাবারটা আনবি। আর আমাদের চরকাচারি কোথায়? বীরনারায়ণ কোথায় মরতে গেল?'

গ্রাম প্রধানের কথা শেষ হতে-না-হতেই ওরা চরকাচারি ও বীরনারায়ণকে সামনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল। গ্রাম প্রধান ওদের দুজনের হাত ধরে টানতে টানতে হাতির কাছে এনে বলল, 'কুমির মশাই, এই যে আমাদের বৈদ্য। এরাই আমাদের চিকিৎসা করে থাকে। এই দুজনের খুব হাতযশ আছে। যেকোনো রোগ এরা সারিয়ে তুলতে পারে।'

হাতির পিঠে বসে থাকা লোকটা ওদের দুজনের দিকে তাকাল। এতক্ষণ যে শিরস্ত্রাণ দিয়ে তার মাথাটা ঢাকা ছিল সেটি পেছনের দিকে টেনে নিল। তার মুখটা গ্রামবাসী দেখতে পেল।

'আরে এ তো সাধারণ মানুষ! এ তো অন্য কোনো জীব নয়। দেখে তো মনে হচ্ছে কোনো এক রাজপরিবারের ছেলে।' শল্য চিকিৎসক বীরনারায়ণ চরকাচারিকে বিড়বিড় করে বলল।

'রাক্ষস এবং দেবতারা মুহূর্তের মধ্যে যেকোনো রূপ ধারণ করতে পারে। দেবতাই হোক আর রাক্ষসই হোক আমি চিকিৎসা করব।' চরকাচারি বলল।

গ্রাম প্রধান ওদের কথা শুনে বুঝল যে ওদের মনে আর কোনো ভয় নেই। তখন সে নিজে পেছিয়ে গেল। দু-জন বৈদ্য এগিয়ে হাতির কাছে দাঁড়াল। চরকাচারি মাথা তুলে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কীসের কষ্ট? কী হচ্ছে জানান। না জানালে চিকিৎসা হয় না।'

হাতির পিঠের লোকটা বিরক্ত হয়ে রেগে গিয়ে বলল, 'তোমরা কি চোখের মাথা খেয়েছ? ছেলেটাকে আমি কী বলেছিলাম? দেখতে পাচ্ছ না তরবারিটা কীভাবে ভেঙে ভেতরে ঢুকে আছে। এটাকে টেনে বের কর।' চরকাচারি চট করে পেছনের দিকে সরে গিয়ে বলল, 'তাহলে আপনার কোনো ভয় নেই। আমাদের এই বীরনারায়ণ শ্যল চিকিৎসায় অদ্বিতীয়। অতি সহজেই বীরনারায়ণ আপনার শরীর থেকে ওই ভাঙা তরবারি টেনে বের করতে পারবে। ঘা যাতে চট করে শুকিয়ে যায় তারজন্য যে গাছের পাতার রস লাগে তা জোগাড় করতে আমি যাচ্ছি।' সে বলে চলে গেল।
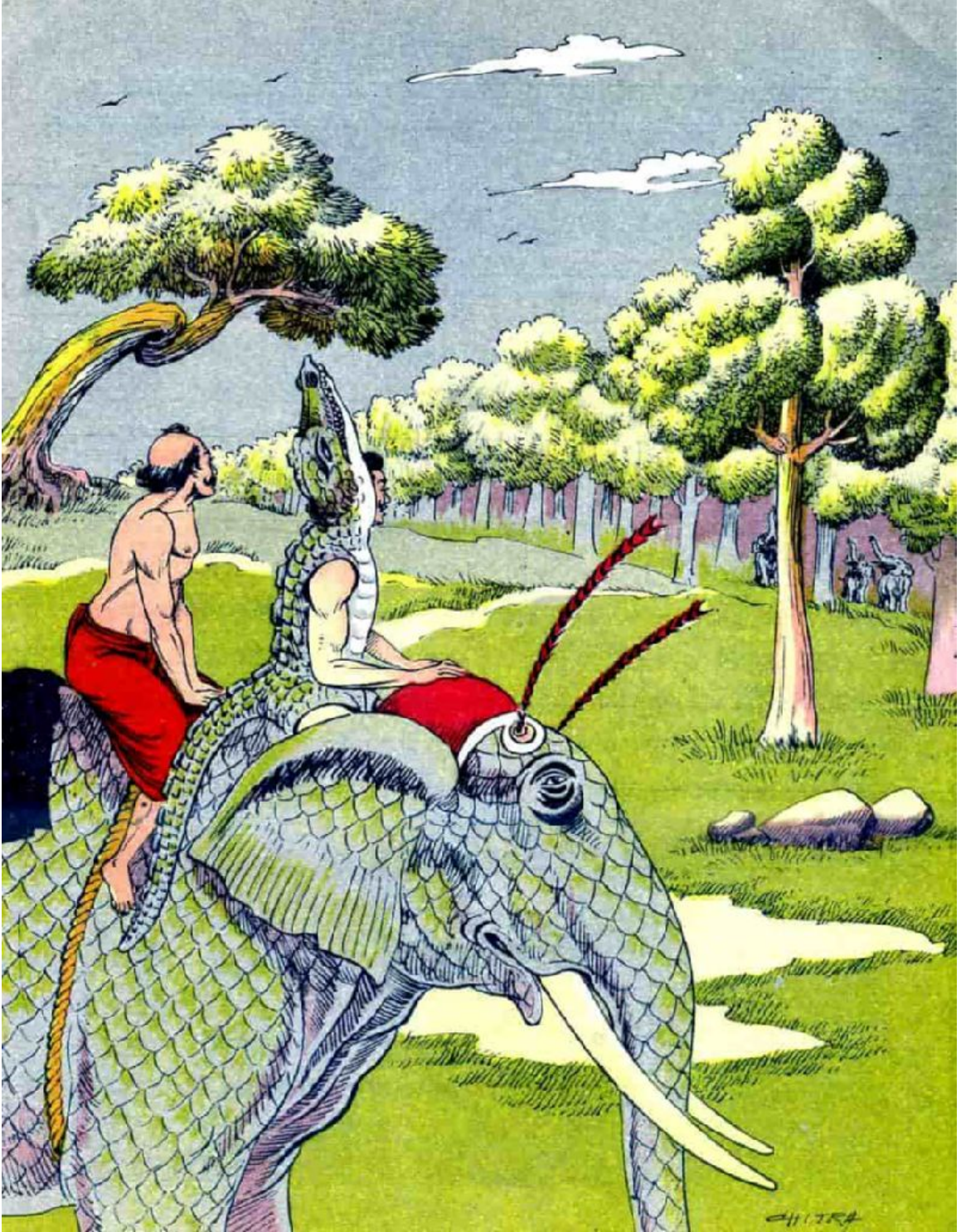
তারপর হাতির পিঠের লোকটা হাত বাড়াল। তার হাত ধরে বীরনারায়ণ হাতির পিঠে উঠল। ভালো করে পরীক্ষা করে সে বলল, 'ভাঙা তরবারিটা দেখে মনে হচ্ছে, সাধারণ তরবারি এটা নয়। কোনো রাজাবাদশার তরবারি হতে পারে।'

বিরক্ত হয়ে লোকটা বলল, 'হতে পারে নয়, যা ভাবছ তাই। এই তরবারি কার জানো? এটা যুবরাজের তরবারি। রাজার একমাত্র ছেলের তরবারি। নেহাত এই কুমিরের চামড়া

ছিল তাই, তা না হলে এতক্ষণে মরে যেতাম।'

এই কথা শুনে বীরনারায়ণের মনে পড়ে গেল, তার রাজার ছেলে এবং মেয়ের হারিয়ে যাওয়ার কথা। ওদের দুজনকে কারা যেন জোর করে নিয়ে গেছে। বীরনারায়ণ ভাবল, 'ইচ্ছে করলে আমি তরবারিটাকে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে লোকটাকে মেরে ফেলতে পারি। কিন্তু একে মেরে ফেললে কে বা কারা রাজার ছেলে-মেয়েকে নিয়ে গেছে তা জানা যাবে না। তার চেয়ে একে জ্যান্ত রেখে কোনোরকমে রাজার হাতে তুলে দিতে পারলে হয়তো একদিন রাজকুমার এবং রাজকুমারীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এই কথা ভাবতে ভাবতে বীরনারায়ণ ছোটোখাটো যন্ত্রপাতি যা এনেছিল সেগুলো বের করে সে বলল, 'আমি এখন প্রস্তুত। কিন্তু প্রস্তুত হলেও এক্ষুনি ভাঙা তরবারিটা টেনে বের করতে পারছি না। কারণ এটা বের করার সঙ্গেসঙ্গে রক্ত ছুটবে। সেই রক্ত বন্ধ করতে না পারলে আপনার বাঁচার কোনো আশা নেই।' এই কথা বলে বীরনারায়ণ গ্রাম প্রধানকে জোরে জোরে বলল, 'তরবারিটা বের করার পর একে কয়েক দিন বিশ্রাম নিতে হবে।'

বীরনারায়ণের কথা শেষ হতে-না-হতে হাতির পিঠের লোকটা তাকে বলল, 'নেহাত কষ্ট পাচ্ছি তাই। তা না হলে এতক্ষণে বুঝিয়ে দিতাম আমি কে? আমি তোমাকে যা বলেছি তার একটি কথাও যেন গ্রাম প্রধানের কানে না যায়। গেলে এইভাবে তোমার গলা ধরে টিপে শেষ করে ফেলব। বুঝেছ?'

'ক্ষমা করুন, আমাকে মেরে ফেলবেন না। আপনি হয়তো আমার রাজার সমপর্যায়ের কেউ। আপনার সাথে হয়তো বিরোধ চলছে। আপনাদের বিরোধের মধ্যে আমি নাক গলাতে চাই না। আপনি একটু দাঁতে দাঁত চেপে থাকুন, আমি ছোরাটা বের করছি।' বীরনারায়ণ বলল।

এই কথাটা বলে তরবারিটা টানতে যাবে এমন সময় চরকাচারির চিৎকার শোনা গেল। সঙ্গেসঙ্গে দু-তিনটি হাতির ডাকও শোনা গেল।

হাতির ডাক এবং চরকাচারির আর্তনাদ শুনে হাতির পিঠের লোকটা সেদিকে তাকাল। কেউ কিছু বুঝতে পারল না। সবাই থতমত খেয়ে গেল। গোটা পরিবেশ মুহূর্তে কেমন হয়ে গেল।

গ্রামবাসীরা সবাই ভয়ে কাঁপতে লাগল। ওরা বাঘ, ভাল্লুক বা সিংহের চেয়ে হাতির দল এগিয়ে এলে ভয় পায়। হাতি দল বেঁধে গ্রামে যখন ঢোকে তখন সব কিছু তছনছ করে দেয়। ঘরবাড়ি গাছপালা কিছুই রাখে না।

গ্রাম প্রধান হাতির পিঠের লোকটার কাছে এসে বলল, 'চরকাচারি একবার মাত্র আর্তনাদ করে থেমে গেল। মনে হয় হাতিগুলো একে মাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। এখন

এখান থেকে সরে যাওয়া ভালো।

'খুব ভালো বলেছ! তাহলে আমার চিকিৎসার কী হবে? আর কতকাল এই ভাঙা তরবারিটা, এই বিষের ফলা শরীরের ভেতরে নিয়ে ঘুরে বেড়াব?' বলল হাতির পিঠের লোকটা।

কয়েকটা হাতির ডাক শুনে বীরনারায়ণ ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। সে বলল, 'সত্য কথা বলতে কী আমি ভয়ে কাঁপছি। যতক্ষণ না আমার ভয় কাটছে ততক্ষণ আমার শরীর কাপবে। কাঁপতে কাঁপতে আমি তোমার শরীর থেকে ভাঙা তরবারিটা টেনে বের করব কী করে?'

চরকাচারি চিৎকার করল 'বাঁচান।' আতঙ্কে চেঁচিয়ে হাঁপাতে লাগল।

পরিষ্কার বোঝা গেল বহু বুনো হাতি একসঙ্গে এগিয়ে আসছে। সব কিছু ভেঙে, মাড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে। এসব কিছু বুঝে গ্রাম প্রধান হাতের লাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে গ্রামবাসীদের বলল, 'ওহে, আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। যে যেদিকে পার ছুটে পালাও।'

চোখের পলকে গ্রামবাসীরা যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। হাতির পিঠে লোকটা চট করে মাথায় শিরস্ত্রাণ পরে বীরনারায়ণকে বগলদাবা করে শূল দিয়ে হাতির মাথায় মারল। হাতি হনহন করে এগিয়ে যেতে লাগল। বীরনারায়ণ চরকাচারির চেয়ে জোরে চিৎকার করতে লাগল, 'আমাকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। আমি মরে গেলাম! আমি মরে যাচ্ছি! বাঁচাও!'

আট

হাতির পিঠের লোকটা বুঝতে পারল বুনো হাতিগুলো তার দিকে এগিয়ে আসছে। ছোটো-বড়ো মিলে পাঁচ-সাতটা হাতি আছে। সে মনে মনে ভাবল, ওই হাতিগুলো কোনোদিন তার হাতিটাকে দেখেনি। হাতিটা অন্যভাবে সাজানো আছে। এই হাতিকে দেখে যদি ওই হাতিগুলো ভয় পায় তাহলে ভালোই হয়। তার হাতে অস্ত্র বলতে এক বল্লম আছে। এই দুটিকে ভয় পেয়ে বুনো হাতিগুলো কি ফিরে যাবে? অথবা এমনও হতে পারে একটি হাতিকে আক্রমণ করল অন্য হাতি বনে পালাতে পারে। আর যদি তৎক্ষণাৎ অন্য হাতি তাকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে তাহলে বাঁচার কোনো উপায় নেই।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে হাতির পিঠে বসা লোকটা নিজের হাতিকে নাম ধরে ডেকে বলল, 'জলগ্রহ, ওই সামনে যে হাতিটা তেড়ে আসছে সেটিকে তুমি গুতিয়ে শেষ করে ফেল।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে জলগ্রহ হনহন করে এগিয়ে ওই বুনো হাতিদের একটিকে গুতিয়ে দিল। সেই গুঁতো খেয়ে বুনো হাতিটি সেখানেই পড়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটা

হাতির দিকে বল্লম ছুঁড়ে মারল কুমির রূপধারী লোকটা। বল্লমের আঘাত খেয়ে হাতিটা মাটিতে পড়ে গেল। তাকে মাড়িয়ে জলগ্রহ এগিয়ে আর একটা হাতিকে আক্রমণ করল। এইভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনটে হাতি আহত হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। অন্য হাতিগুলো পালাতে শুরু করল। কুমির রূপধারী লোকটা ওই হাতিগুলোকে ধাওয়া করতে করতে বল্লম দিয়ে যত বার পারল তত বার আঘাত করতে লাগল। আঘাতের পর আঘাত খেয়ে ওই হাতিগুলো কিছুক্ষণের মধ্যে অরণ্যের গভীরে পালিয়ে গেল। তারপর লোকটা জলগ্রহকে থামাল। তখন তার মনে পড়ল বীরনারায়ণের কথা। সে ভাবল, 'এই গোলমালের মধ্যে বীরনারায়ণ কোথায় গেল? কোনো হাতির চাপে পড়ে মরে যায়নি তো? সে যদি মরে যায় তাহলে তো সর্বনাশ। ভাঙা তরবারিটা আজীবন আমার শরীরের মধ্যেই থেকে যাবে। ওটা বের না করলে আমি হয়তো বাঁচতেই পারব না। সে চারদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, 'বীরনারায়ণ, তুমি কোথায়?'

সঙ্গেসঙ্গে তার পেছনের দিক থেকে আওয়াজ এল, 'এই যে কুমিরমশাই, আমি এখানে। এতক্ষণ আমি আপনার লেজ ধরে ঝুলছিলাম। ভয়ে এখনও আমার চোখ বোজা আছে। কে জিতেছে, বুনো হাতি না আপনি?'

পিছনের দিকে তাকিয়ে কুমির রূপধারী লোকটা কিছু বলল না।

বীরনারায়ণ হাতির দল আসার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে যে কীভাবে বাঁচাবে ভেবে পাচ্ছিল না। প্রথমে ভেবেছিল জলগ্রহ হাতির পেছন দিক থেকে নেমে পালিয়ে যাবে। কিন্তু তা করল না। কারণ পরক্ষণেই তার ভয় হল।

সে ভাবল, 'নেমে গেলে হাতির পায়ের তলায় পড়তে পারি। হাতির নীচে পড়লে প্রাণে বাঁচার কোনো উপায় নেই। তখন এমন অবস্থা যে লেজ বেয়ে আবার উপরে উঠে এসে জলগ্রহের পিঠে যে বসবে তার সে সাহসও ছিল না। বুনো হাতিগুলো যদি কুমিররূপী লোকটাকে ফেলে দেয় তাহলে তাকেও ফেলে দেবে। আর একবার ফেলে দিলে বাঁচার উপায় নেই!'

কুমিররূপী লোকটা বলল, 'তাহলে তুমি আমার কাছেই আছ? তুমি পালানোর চেষ্টা করনি? না পালিয়ে ভালো করেছ। পালাতে গেলে মরেই যেতে। এখন আমার এই ভাঙা তরবারিটা বের কর। আর কতদিন তরবারির বিষ নিয়ে ঘুরে বেড়াব?'

'হাতি মারার গোলমালের মধ্যে আপনি হয়তো আসল কথা ভুলে গেছেন। চরকাচারি আর্তনাদ করছিল মনে আছে? লতাপাতা আনতে গিয়েছিল। কারণ ভাঙা তরবারি টেনে বের করার সঙ্গেসঙ্গে রক্ত ছুটবে। সঙ্গেসঙ্গে লতাপাতার রস না লাগালে রক্ত আর থামবে না।' বীরনারায়ণ বলল।

এই কথা শুনে কুমির লোকটা চমকে উঠে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। বাঁচান বাঁচান' আর্তনাদের পর আর তো কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না। আচ্ছা, চরকাচারি যদি মরে গিয়ে

থাকে তাহলে আমার এই ভাঙা তরবারি বের করা। যাবে না। কোন পাতার রস লাগাতে হয় তুমি জানো না?'

এই প্রশ্ন শুনে বীরনারায়ণ একগাল হেসে বলল, 'জানব না কেন। গ্রামে আমরা দু-জন বৈদ্য আছি। প্রত্যেকটা রোগ সারানোর ব্যাপারে আমরা এই কৌশল করে থাকি। যেকোনো রোগ সারানোর জন্য লোকে আমাদের দুজনকেই ডাকতে বাধ্য হয়।'

কুমির লোকটা শুনে হো-হো করে হাসল। কিন্তু পরক্ষণেই ভীষণ ব্যাথা পাওয়ার মতো 'আঃ, করে উঠে বলল, 'ওহে, তুমি আর কতক্ষণ আমার লেজ ধরে ঝুলবে? আমার কাছে এসো।

বীরনারায়ণের ভয় তখনও যেন কাটল না। সে ভয়ে ভয়ে এল। তার কাছে এখন সব কিছুই বিস্ময়ের বস্তু। জলগ্রহ হাতিটি একা দুটো হাতিকে মেরে ফেলল। একটা হাতি আর একটা হাতিকে গুতিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই হাতি দুটো হাতিকে প্রায় মেরে ফেলেছে। অন্যগুলোকে মারতে মারতে ভাগিয়ে দিয়েছে। একটা হাতি এতগুলো হাতিকে জব্দ করতে পারল কী করে?

এসব কথা সে যখন ভাবছিল, তখন কুমির লোকটি বলল, 'ওহে নারায়ণ, ওভাবে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকো না। তাড়াতাড়ি এই তরবারিটা বের কর। তা না হলে...'

'কুমিরমশাই, ওটা বের করলে সত্যি রক্ত ছুটবে। ওই লতাপাত ছাড়া আমি ওটা বের করার সাহস পাচ্ছি না।' বীরনারায়ণ বলল।

'আমি মরে গেলে তুমিও মরবে। কোনোক্রমেই এখান থেকে বেঁচে পালাতে পারবে না। ঠিক আছে। চল এখন আমার সঙ্গে। চরকাচারি কোথায় পড়ে আছে এখন খুঁজে বের করতে হবে। ওকে যদি কোনো বাঘ অথবা সিংহ খেয়ে থাকে তাহলে অন্তত হাড়গুলো পড়ে থাকবে।' বলল কুমির লোকটা।

তারপর সে জলগ্রহকে খোঁচা মেরে এগিয়ে যেতে বলল। যেদিক থেকে চরকাচারির আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল সেদিকেই সে এগিয়ে গেল।

চরকাচারি বেঁচেছিল বটে তবে সে যেন মরে বেঁচে ছিল। সে গাছ খুঁজতে খুঁজতে একটি গাছের কাছে দাঁড়িয়ে আপন মনে বলছিল, 'বাঃ এই গাছটাকে আমি কতদিন ধরে খুঁজেছি। পাইনি। এটা নিয়ে গেলে গ্রামপ্রধানের বাতের রোগ সারানো যাবে।' এই কথা বলতে বলতে সে গাছের পাতা ছিড়তে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার নজরে পড়ল এক বিরাট অজগর গাছের ডালে জড়িয়ে ঝুলছে। তাকে দেখে মনে হল কয়েক দিন তার পেটে কিছু পড়েনি। বড়ো কিছু ধরে খেলে তার পেট ভরবে। চরকাচারিকে দেখে অজগরটি আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। হঠাৎ গাছের বিরাট ডাল পড়ে যাওয়ার

মতো তার ঘাড়ে অজগর পড়ে গেল। সে নিজেকে ছাড়িয়ে ছুটে পালাবে ঠিক করল। কিন্তু তার হাত-পা অবশ হয়ে গিয়েছিল। হাত-পা অবশ হলেও তার অজান্তেই তার মুখ থেকে 'বাঁচান, বাঁচান' আর্তনাদ বেরুল।

তার সেই আর্তনাদ গ্রামবাসী, বীরনারায়ণ, কুমির লোকটা এবং জয়শীল ও সিদ্ধ সাধক শুনেছিল। জয়শীল ও সিদ্ধসাধক তখন লতাপাতার পুঁথির বিষয় ভাবছিল।

জয়শীল ও সিদ্ধসাধক 'বাঁচান বাঁচান' আর্তনাদ শুনতে পেলেও, কে যে আর্তনাদ করছে তা তারা বুঝতে পারল না। তবে যেদিক থেকে আর্তনাদ আসছিল সেদিকে তারা এগিয়ে গেল। এগিয়ে দেখল কয়েকটা হাতি ছুটে পালাচ্ছে। তারপরেই ওরা দেখতে পেল কুমির লোকটাকে এগিয়ে আসতে।

সিদ্ধ সাধক ওই পুঁথি উপরের দিকে তুলে ধেই ধেই করে নেচে বলল,'জয়শীল পেয়ে গেছি! আমাদের কনকাক্ষ রাজার ছেলে-মেয়েকে ওই দুরাত্মা ছাড়া আর কেউ নিয়ে যায়নি। ঠিক এই হবে। লোকটা যক্ষ গন্ধর্ব অথবা কিন্নর হবে।'

'তুমি যা বলছ তা নাও হতে পারে। তবে সে যে আমাদের মতো মানুষ নয় তা বোঝা যাচ্ছে। আর ও যে হাতির উপর বসে আছে সেই হাতিটা দেখ, আমি অন্তত এই ধরনের হাতি দেখিনি।' জয়শীল বলল।

আবার শোনা গেল চরকাচারির আর্তনাদ। জয়শীল তৎক্ষণাৎ তরবারি বের করে সেইদিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'ভয় নেই, আসছি।'

সিদ্ধ সাধক অবাক হয়ে বলল, 'জয়শীল, কী করছ? যুবরাজ ও রাজকুমারীকে যে অপহরণ করেছে তাকে হাতের কাছে পেয়েও ছেড়ে দেবে। কোথায় ছুটে যাচ্ছ?'

'তাকে বাঁচাতেই হবে। এই মুহূর্তে যে 'বাঁচান বাঁচান' বলে আর্তনাদ করছে তাকে বাঁচানো আমার কর্তব্য। রাজকুমার ও রাজকুমারী এতদিন যদি বেঁচে থাকে তবে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকবে। ভয় নেই।' বলে জয়শীল যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল সেদিকে ছুটে গেল। তার পেছনে ছুটল সিদ্ধ সাধক।

ওরা দুজনে চরকাচারির কাছে পৌছে দেখতে পেল অজগর চরকাচারির গোটা শরীর গ্রাস করতে যাচ্ছে।

খাপ খোলা তরবারি জয়শীল অজগরের মুখের কাছে ধরল। ধরতেই অজগল ফেঁস করে সেই তরবারির মুখে ছোবল মারল। তার মুখে তরবারি ঢুকে গেল।

'জয়শীল, এই লোকাট ব্যাধ নয়। দেখে মনে হচ্ছে পণ্ডিত। অজগরটাকে মেরে ফেল। বলল সিদ্ধ সাধক। জয়শীল অজগরের মাথাটাকে ধরে নিজের দিকে টানল। পরক্ষণেই কেটে ফেলল তার মাথা। দূর থেকেই অজগরটাকে মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু তার ভয়

হল তরবারি চালানোর সময় যদি এদিক-ওদিক কিছু হয়ে যায়, তাহলে সেই আঘাত পড়বে চরকাচারির গায়ে।

মুণ্ডু কেটে ফেলার সঙ্গেসঙ্গে অজগরের গোটা শরীর ভীষণভাবে লাফাতে লাগল। চরকাচারির শরীর মুক্ত হল। চরকাচারিকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে জয়শীল সিদ্ধ সাধককে বলল, 'সাধক, ছুটে গিয়ে জল নিয়ে এসো। মনে হচ্ছে লোকটা বেঁচে আছে।'

সিদ্ধ সাধক ছুটে গিয়ে কমণ্ডুলু করে জল আনল। ভালোভাবে জলের ছিটে দেওয়ার পর চোখ তুলে চরকাচারি বলল, 'আমি কোথা? অজগরটি কি আমাকে এখনও জড়িয়ে আছে?'

'তুমি ভালোভাবেই বেঁচে আছ। আগে এই মন্ত্রজল পান কর। এই জল খেলে তোমার মন থেকে ভয় ভীতি কেটে যাবে।' বলল সিদ্ধ সাধক। তারপর তাকে জল খেতে দিল।

জল খেয়ে এদিক-ওদিক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে চরকাচারি বলল, 'কে আপনারা? কুমীর লোকটা কোথায় ? বীরনারায়ণের কী অবস্থা হয়েছে?'

তার প্রশ্ন শুনে জয়শীল বুঝতে পারল চরকাচারি কার কথা জিজ্ঞেস করছে। সে সিদ্ধ সাধককে বলল, 'সাধক, এ কি বলছে বুঝতে পারছ? এই কুমির লোকটা তোমার বন্ধু না শত্রু?'

ইতিমধ্যে ওই কুমির লোকটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'এর নাম চরকাচারি। এ আমার নিজের বৈদ্য। কে তোমরা? সত্যি কথা না বললে এই জলগ্রহ হাতি তোমাদের মাড়িয়ে মেরে ফেলবে। তাড়াতাড়ি বল, কে তোমরা?'

জয়শীল ও সিদ্ধ সাধক দৃঢ়ভাবে দাঁড়াল। জয়শীল তরবারিটাকে শক্ত করে ধরল। যেকোনো বিপদের মোকাবিলার জন্য সিদ্ধ সাধক শক্তহাতে নিজের মন্ত্রদণ্ড ধরে রইল।

নয়

জয়শীল ও সিদ্ধসাধক নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পালানোর কোনো প্রশ্নই ওদের মনে ছিল না। ওরা ভাবছিল কীভাবে আক্রমণ করবে। ওদের হাবভাব দেখে কুমির লোকটা চমকে উঠেছিল। সে ভেবেছিল, তার ওই কুমিরের মুখোশ দেখে ওরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু তা হল না ওরা অটল, অনড়।

কুমির লোকটা বল্লম তুলে বড়ো গলায় বলল, 'কে তোমরা? এই ভয়ংকর অরণ্যপ্রান্তে কেন এসেছে?' সে এমনভাবে গর্জন করে প্রশ্ন করল যাতে সিদ্ধ সাধক ও জয়শীল ভয় পায়।

জয়শীল তৎক্ষণাৎ খাপ থেকে তরবারি টেনে বের করে বলল, 'কুমিরের চামড়া গায়ে দিয়েছ কেন? মুখোশ? ওই চামড়া দিয়ে সব কিছু ঢাকা যায়? আমরা এখানে কেন এসেছি জানাব। কিন্তু তুমি কে? প্রশ্ন করার আগে নিজের পরিচয় দিতে হয়। একই প্রশ্ন তো আমি

তোমাকে করতে পারি। ভয়ংকর অরণ্যে জেনে-শুনে তুমি এখানে আছ কেন? তুমি যে হাতির পিঠে চেপে বসে আছ সেটাকেও বেশ সাজিয়েছ দেখছি। ওইসব দিয়ে কি হাতি ঢাকা পড়বে? এত মুখোশ, এত অভিনয় কীসের জন্য?'

'ছি, এই তুচ্ছ মানুষের সঙ্গে কথা বলে কী হবে? ফিরে যাই নিজের ডেরায়।' বলে নিজের হাতিকে কুমির লোকটা বলল, 'জলগ্রহ, এবার চল ফিরে যাই।' এতক্ষণ কুমির লোকটার লেজ ধরে ঝুলছিল বীরনারায়ণ। সে কুমির লোকটার হাত ধরে মিনতি করে বলল, 'একটা কথা কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন। আপনার ভালোর জন্যেই বলছি। আপনার শরীরে যে ভাঙা তরবারিটা ঢুকে আছে সেটা কি আপনি বের করতে চান না? ওই দু-জনের খপ্পরে চরকাচারি আছে। আমার মনে হয়, এখন আপনার ওই দু-জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত। চরকাচারিকে না পেলে ভাঙা তরবারিটা বের করা যাবে না। আর ওটা বের করার আগে কারও সঙ্গে বিরোধ করা আপনার উচিত নয়। চরকাচারি আপনার জন্য লতাপাতা আনতে গিয়েই হয়তো ওদের খপ্পরে পড়ে গেছে। আপনার প্রধান কর্তব্য হল ওদের হাত থেকে এখন কৌশলে চরকাচারিকে উদ্ধার করা।'

বীরনারায়ণের কথা শুনে কুমির লোকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চরকাচারির দিকে একবার তাকাল। চরকাচারি উঠে দাঁড়িয়ে কী যেন ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করে বলছিল। তার পাশেই পড়েছিল মণ্ডুকাটা অবস্থায় একটা বুনো পাখি। পাখিটার দেহ ছটফট করছিল। এসব দেখে কুমির লোকটা কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, 'চরকাচারি, আমার জন্য তুমি বিপদে পড়ে গেলে? তুমি বললে হাতিকে গিলে ফেলার মতো বড়ো বড়ো বুনো পাখি এই বল্লম দিয়ে মেরে তোমার কাছে এনে ফেলতাম।'

চরকাচারি তৎক্ষণাৎ, 'কুমিরমশাই' বলে চিৎকার করে কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। শেষে তর্জনী দিয়ে সিদ্ধ সাধক ও জয়শীলকে দেখাতে দেখাতে কাশতে লাগল।

কুমির লোকটা রক্তচক্ষু করে জয়শীল ও সিদ্ধ সাধকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা এখনও এখানে আছ? হুঁ! ভালো চাও তো আমার নাগালের বাইরে চলে যাও। তা যদি না যাও তাহলে তোমাদের চরম পরিণতি হবে। তোমরা আমাকে দেখে যা ভাবছ আমি তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান! যা বলছি তোমাদের মঙ্গলের জন্যই বলছি, যাও, চলে যাও!'

সঙ্গেসঙ্গে জয়শীল তরবারি হাতে নিয়ে তার দিকে এক-পা এগিয়ে এল। তাকে এগিয়ে আসতে দেখেই বীরনারায়ণ একটু জোরে জয়শীলকে বলল, 'এই যে তরবারিধারী, একটু দাঁড়ান। এই কমির ভদ্রলোককে তরবারি দিয়ে আক্রমণ করা মস্তবড়ো অপরাধ হবে। এই বেচারির পেটে কত বড়ো তরবারি ঢুকে গেছে। দেখুন। এরকম একটা অসহায় লোককে

তরবারি দিয়ে আক্রমণ করলে মহা অপরাধ হবে! এর পেট থেকে ভাঙা তরবারি বের না করলে বেচারা মরে যাবে!’

‘লোকটা খুব সুখে মরুক আমি তা চাই না। ওর পেটে ভাঙা তরবারির একটা অংশ আছে। অন্য অংশ কোথায় রয়েছে জানো? অন্য অংশ রয়েছে কনকাক্ষ মহারাজের কাছে।' বলল জয়শীল।

ওর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে কুমির লোকটা বিরক্ত হয়ে বিকট গলায় বলল, 'তাহলে আমি যে কে তাও নিশ্চয় তুমি জানো।'

‘জানি। তুমি সেই লোক যে আমাদের রাজকুমার ও রাজকুমারীকে অপহরণ করেছ। তোমার পেটে রয়েছে আমাদের যুবরাজের তরবারির ভাঙা অংশ।' জোরে জোরে জয়শীল বলল।

'তুমি যখন আমার সম্পর্কে এত কিছু জানো তখন তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা আমার পক্ষে নিরাপদ নয়।' বলে কুমির লোকটা হাতিকে খোঁচা দিল। জলগ্রহ হাতি জয়শীলের দিকে এগিয়ে এল। তৎক্ষণাৎ বীরনারায়ণ কুমির লোকটা যে হাতে বল্লম ধরেছিল সে হাতটা ধরে কাকুতিমিনতি করে বলল, ‘একী, এই অবস্থায় এত রাগ করলে চলে? এ যে রক্তারক্তি কাণ্ড হবে’ বলতে বলতে বল্লমটাকে শক্ত করে ধরে বীরনারায়ণ ধপাস করে নীচে পড়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুদবেগে জয়শীল জলগ্রহের পেছন দিকে উঠে কুমির লোকটার গলা জাপটে ধরল। আর তখনই সিদ্ধ সাধক নীচে পড়ে থাকা বল্লমটাকে তুলে নিয়ে বলল, ‘জয় মহাকাল!’ মহা আনন্দে সে আবার জোরে জোরে বলল, ‘জয় মহাকাল!’

কুমির লোকটা থতমত খেয়ে গেল। চোখের পলকে সে তার বল্লম হারিয়েছে। শত্রুর হাতে সে ধরা পড়েছে। তার হাতে আর কোনো হাতিয়ার নেই। জয়শীল তার গলার উপর তরবারি ধরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী বল? আমি যা জিজ্ঞেস করছি বলতে হবে। তা না হলে তোমার মুণ্ডু কেটে ফেলব।'

কুমির লোকটা কিছুক্ষণ জয়শীলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওহে মানুষ, তোমার সাহস দেখে আমি খুশি হয়েছি।'

সিদ্ধ সাধক হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'জয়শীলের সাহস দেখে খুশি হওয়ার তুমি কে হে? আসল বেশে থাকার তো তোমার সাহস নেই। ভয়ে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ। সাক্ষাৎ মহাকাল জয়শীলের উপর খুশি হয়ে তার। হাতে তরবারি তুলে দিয়েছেন। মহাকালের আশীর্বাদ পেয়েছেন জয়শীল।'

'কার কথা বলছ? মহাকাল আবার কে?’ অবাক হয়ে কুমির লোকটা সিদ্ধ সাধককে জিজ্ঞেস করল।

জয়শীল তার গলা ধরে জোরে নাড়িয়ে বলল, 'ওহে কুমির-চর্মধারী, ওসব গল্প বলতে তোমার কাছে কেউ আসেনি। ওসব কথা তোমাকে কেউ এখানে। বসে বলবে না। আমি যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও। তোমার নাম কী? প্রাণে যদি বাঁচতে চাও তবে আমার সঙ্গে হিরণ্যপুরের রাজার কাছে চল। রাজকুমার ও রাজকুমারীকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ তা রাজাকে বল?’

‘আমার নাম মকরকেতু। রাজার ছেলে-মেয়েকে কোথায় রেখেছি তা জানানোর জন্য রাজার কাছে যাবার কী দরকার? তোমাকেই বলে দেব।' কুমির লোকটা তৎক্ষণাৎ বলল।

এত সহজে যে লোকটা রাজকুমার ও রাজকুমারীর ব্যাপার বলে দেবে তা জয়শীল ভাবতে পারেনি। তার মনে হল এত চট করে নত হওয়ার পেছনে কোনো কারণ আছে। জয়শীল ভাবল, এই লোকটাকে যেকোনো ভাবে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়াই সবচেয়ে ভালো হবে। রাজা ও মন্ত্রী একে নানা ধরনের প্রশ্ন করে ঠিক করুক কী করবে না করবে।

এইভাবে ভেবে জয়শীল বলল, 'কেতু, তোমার শংকরজাতের হাতিটিকে ঘোরাও। হিরণ্যপুরের দিকে চল। পথে যদি কোনোরকম এদিক-ওদিক কর, পালানোর চেষ্টা কর তাহলে কিন্তু এক কোপে তোমার গলা কেটে ফেলব। কথাটা মনে রেখ।'

মকরকেতু কোনো কথা না বলে জলগ্রহকে ঘোরাল। তখন সিদ্ধ সাধক হাতির কাছে এসে বলল, 'জয়শীল আমাকে ধর। আমিও হাতির পিঠে উঠে বসব।'

জয়শীল সিদ্ধ সাধককে হাত বাড়িয়ে ধরে তুলল। হাততালি দিয়ে বীরনারায়ণ ও চরকাচারি বলল, 'শুনুন, শুনুন, কাছেই আমাদের গ্রাম। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পথে নানা ধরনের বিপদ আছে। এই অরণ্যে হাতি বাঘ যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। আমাদের কথা একটু ভাবুন।'

'তোমাদের কোনো ভয় নেই। তোমরা এই পাজি লোকটার পেট থেকে তরবারি বের করার চেষ্টা করেছ বলেই এ আমাদের হাতে ধরা পড়েছে। অরণ্য পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত এই হাতি আস্তে আস্তে এগোবে। তোমরা সঙ্গে সঙ্গে এসো।' জয়শীল বলল।

ওরা হিরণ্যপুরের দিকে রওনা হল। কিছুক্ষণ চলার পর চরকাচারি গলা ঝেড়ে বলল, 'জয়শীলমশাই, আমাদের একটা আবেদন আছে।'

জয়শীল কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কীসের আবেদন?'

'আমি আর বীরনারায়ণ সকাল থেকে এই কুমির লোকটার পেট থেকে তরবারি বের করার ব্যাপারে খুব ব্যস্ত ছিলাম। যত বড়ো ভাঙা তরবারি ওর পেটে ঢুকে আছে তা যদি অন্য কারুর পেটে থাকত তাহলে এতক্ষণে সে মরে যেত। কিন্তু এই লোকটা এমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন ওই তরবারি তার কাছে তরবারিই নয়, অলংকার। আর ওর নাড়ি দেখে মনে হল ও ঠিক মানুষ নয়। জলের জীব।' চরকাচারি বলল।

'তার মানে, তুমি বলতে চাও, এই লোকটা জলে ডাঙায় সমান দক্ষ। ঠিক আছে, কনকাক্ষ রাজার কাজ হয়ে গেলে তাকে বলব এই লোকটাকে আর এর হাতিকে তোমায় উপহার দিতে। তুমি নেবে তো চরকাচারি?' জয়শীল হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল।

ওদের কথাবার্তা শুনে মকরকেতু দাঁত কটমট করতে লাগল। ওর গলার উপর তরবারিটা ধরে জয়শীল বলল, 'শোন হে, তোমার চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি একটা কিছু তাল করছ। সাবধান।'

সিদ্ধ সাধক হাসতে হাসতে বলল, 'সত্যি, জয়শীল, সেদিন শ্মশানে ওর মুণ্ডুটাকে যেভাবে ফেলে দিলে তা দেখে আমি অবাক হয়েছি। কী অপূর্ব দৃশ্য! আজও আমার চোখের সামনে সেই দৃশ্য ভাসে!'

চরকাচারি ও বীরনারায়ণ একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিল। বীরনারায়ণ বলল, 'কী হে চরকাচারি, আবেদন তোমার যে একেবারে উবে গেল।'

চরকাচারি জিভ কেটে বলল, 'এই যে জয়শীলমশাই, আমার আবেদন শোনা হল না? মানে পুরোটা শোনা হল না। বলছিলাম কী, ওই লোকটার ভাঙা তরবারি বের করার জন্য

আমি আর বীরনারায়ণ সারাদিন খেটেছি। আমাদের অনেক পরিশ্রম হয়েছে। যতই হোক পরিশ্রমের একটা মূল্য আছে!'

ওর কথা শুনে জয়শীল মনে মনে হাসল। এমন সময় কাছের একটা গাছ থেকে একটি তির তীব্রবেগে এসে মকরকেতুর কাঁধে ঢুকে গেল। সে আর্তনাদ করে উঠল, 'জয়শীল, এ কিন্তু অন্যায় হচ্ছে। আমার কোনো হাতিয়ার নেই আর এই সময় তুমি আমাকে মারছ?'

এই ঘটনায় জয়শীল ও সিদ্ধ সাধক দু-জনেই অবাক হল। ওরা ভেবে পেল না কোত্থেকে তিরটা এল। জয়শীল চারদিকে ঘুরে ঘুরে গাছের ডালে ডালে খুঁজতে লাগল। গাছের আড়াল থেকে কে যেন হো-হো করে হেসে বলল, 'ওহে কুমিররূপী, আমি যে বুনো মুরগিটাকে মেরেছিলাম সেটা কি তুমি নিয়ে যাচ্ছ? তুমি যে অন্য কোনো জীব নও, তুমি যে মানুষ আমি তা জেনে গেছি। এতক্ষণ আমার তিরটা নিশ্চয়ই তোমার বুকে ঢুকে গেছে।'

ওই কথা শুনে সিদ্ধ সাধক ও জয়শীল বুঝতে পারল এ কার কণ্ঠস্বর। তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ সাধক মন্ত্রদণ্ড উপরে তুলে জোরে জোরে বলল, 'ওহে, শিকারি ভীম, চলে এসো। আর তির ছুঁড়ো না। এবার তির ছুঁড়লে তোমাকেই মহাকালের প্রসাদ হতে হবে।'

'কে হে? রাজার ওঝা নাকি?' ভীম জিজ্ঞেস করল।

'আমি ওঝা নই। সিদ্ধ সাধক, তান্ত্রিক। চুপচাপ গাছ থেকে নেমে চলে এসো। নামলে আমি এই মন্ত্রদণ্ড বলে গাছটাকে পুড়িয়ে ফেলব।' সিদ্ধ সাধক বলল।

'এ সেই শিকারি! মায়া সরোবরের লোক। দাঁড়াও এই মুহূর্তে আমি ওকে জলগ্রহ দিয়ে মাড়িয়ে শেষ করে ফেলছি।' বলে জলগ্রহকে ওই গাছের দিকে কুমির লোকটা হেঁকে নিয়ে গেল।

জয়শীলের কিছু করার আগেই জলগ্রহ হাতি সোজা গিয়ে ওই গাছে একটা ধাক্কা মারল। গাছের ডালে বসে থাকা ভীম মরে গেলাম! 'মরে গেলাম! বাঁচান। বাঁচান!' বলে হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে আর্তনাদ করতে লাগল।

দশ

লোকটা ছিল ভিল। নাম ভীম। জলগ্রহ ওই গাছটাকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল। গাছের সঙ্গে সঙ্গে ভীমও নীচে পড়ে গেল। জয়শীল মকরকেতুর কাঁধে হাত দিয়ে দু-বার ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'ওহে কুমিরের চামড়াধারী, কী আরম্ভ করেছ? আমার অনুমতি ছাড়া গাছটাকে ফেলে দিতে তুমি জলগ্রহকে বললে কেন?'

মকরকেতু তার বাঁ-কাঁধে যে তিরটা বিঁধেছিল তার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে কষ্টে বিড়বিড় করে বলল, 'জয়শীল, আমি ওই ভিলকে যদি নীচে না ফেলে দিতাম তাহলে সে

এতক্ষণে আর একটা তির ছুঁড়ে আমার বুকে গেঁথে ফেলত। ওর হাতের তির সামনের দিক থেকে বিধে আমাকে এতক্ষণে মাটিতে ফেলে দিত। আমি যা বলছি তা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে তো।'

জয়শীলের মনে হল মকরকেতু যে কথা বলছে তা সত্য।

ইতিমধ্যে সিদ্ধ সাধক ওই লোকটার কাছে গেল। সে ঝোপে-ঝাড়ে পড়ে গিয়েছিল। গাছ থেকে পড়ার ফলে সে আহত হয়েছিল। তাকে তুলে দাঁড় করাতে করাতে সিদ্ধ সাধক বলল, 'ওহে, দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে হাত-পা চালিয়ে দেখ কিছু ভেঙে-টেঙে গেছে কি না।' ভিল গা ঝেড়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'শোনো হে ভূতের ওঝা, আমার কোনো চোটফোট লাগেনি। গরুড়পাখি যেভাবে গাছ থেকে ঝুলে নীচে নামে সেইভাবে নেমেছি। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি ওই কুমির লোকটা আমার। তির বেঁধা সত্ত্বেও এখনও বেঁচে আছে। হাতি তো নয় ওটা একটা পিশাচ। ওর মাথা আগে নাবিয়ে ফেলতে হবে। আর একটু সময় পেলে তির দিয়ে আমি ওই কুমির লোকটার কলিজা চিরে ফেলতাম।' বলে ধনুকে তির চড়াল।

সিদ্ধ সাধক ঝট করে তার হাত ধরে জলগ্রহের পিঠে বসে থাকা জয়শীলকে ডেকে বলল, 'জয়শীল, এই ভিল তির ছুঁড়ে কুমির লোকটার বুক বিদ্ধ করতে চায়। তুমি কি একে তা করার অনুমতি দিচ্ছ?'

সেই প্রশ্ন শোনার সঙ্গে সঙ্গে জয়শীল জলগ্রহ থেকে নেমে ভিলের হাত ধরে বলল, 'কি হে, মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমি হাতির উপর বসে আছি দেখেও তোমার তির ছোঁড়ার ইচ্ছা উবে যায়নি? তোমার তির যে ঠিক কুমির লোকটার বুকেই বিধবে তার কী মানে আছে? সেটা তো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আমার গায়েও বিধতে পারে? আমাকে অকালে মারতে চাও?'

'আমার তির লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আপনি দেখতে চান? দেখুন। ওই কুমির লোকটার, যে কুমিরের চামড়া পরে আছে সেই কুমিরের দুটো চোখের মাঝখানে আমি তির মারছি।' বলে ভিল ধনুকে তির চড়াল।

জয়শীল ঝট করে ধনুকটাকে ধরে টেনে দূরে ফেলে দিয়ে বলল, 'শোনো, এখন ওই মকরকেত আমার অধীনে আছে। আমি ওকে রাজার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। এই সময় তুমি যদি ওর কোনো ক্ষতি কর তাহলে আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়তে পারব না। প্রত্যেক দেশের কতকগুলো নিয়ম থাকে। মকরকে এখন রাজার বন্দি। আমরা বন্দিকে নিয়ে যাচ্ছি। বন্দি পালালে দোষ চাপবে আমাদের উপর। বন্দি আহত হলে আমরা উদবিগ্ন হতে বাধ্য। আহত বন্দি পথে মরে গেলে কী অবস্থা হবে।'

'তাহলে আমার বুনো মুরগির ব্যাপারটা কী হবে?' তুমি জানো ও আমার মুরগি চুরি করেছে।' ভিল খুব রেগে গিয়ে প্রশ্ন করল।

'চোপ, আর কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। মুরগির ব্যাপারে তুমি যদি বিচার চাও তো এসো আমার সঙ্গে। রাজার কাছে অভিযোগ কর, উনিই বিচার করবেন।' বলল সিদ্ধ সাধক। তারপর তার কাঁধে হাত দিয়ে সে তাকে সরিয়ে দিল।

ইতিমধ্যে সেখানে চরকাচারি ও বীরনারায়ণ পৌঁছে গেল। ওরা মকরকেতুর দিকে অবাক হয়ে তাকাল। চরকাচারি বলল, 'এ কী! আগে পেটে ঢুকেছিল আধখানা তরবারি। এখন দেখছি কাধে একখানা তির বিধে আছে। কুমির লোকটার কপাল মন্দ।'

'ছিঃ, এতগুলো মানুষের হাতে লাঞ্ছিত অবহেলিত ও উপেক্ষিত হওয়ার চেয়ে আমার বল্লম দিয়ে নিজেকে নিজে শেষ করে ফেলা অনেক ভালো।' বলে মকরকেতু এদিক-ওদিক ঘুরে বল্লমটাকে খুঁজতে লাগল।

সিদ্ধ সাধক নিজের হাতে ধরে থাকা বল্লম তুলে বলল, 'ওহে মকরকেতু তোমার বল্লম যে আমার হাতে অনেকক্ষণ ধরে আছে তা কি তুমি লক্ষ করনি?' মকরকেতু হকচকিয়ে গিয়ে হতাশ হয়ে বলল, 'হায়, মায়া সরোবরেশ্বর, এখনও কি তুমি টের পাচ্ছ না এরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কি করতে চাইছে?

জয়শীল চরকাচারিকে কাছে ডেকে বলল, 'আচারি, এই মকরকেতুকে ঠিক। এইভাবে নিরাপদে হিরণ্যপুর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাবে?'

'আজ্ঞে জয়শীলমশাই, সেটা ঠিক হবে না। ওই ভাঙা তরবারি আর বিদ্ধ তির না বের করলে যেকোনো মুহূর্তে সে মারা যেতে পারে। শেষে এর শব নিয়ে পৌঁছতে হবে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে বীরনারায়ণকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।' চরকাচারি বলল।

'আচারি যা বলেছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এক্ষুনি একে আমদের গ্রামে। নিয়ে যাওয়া উচিত। সেখানে চিকিৎসার পরে দু-দিন বিশ্রাম সেরে রাজার কাছে নিয়ে গেলে বুদ্ধিমানের কাজ হত!' বিজ্ঞের মতো বলল বীরনারায়ণ।

ওদের কথা শুনে জয়শীল ও সিদ্ধ সাধকের মনে হল ওদের কথাই ঠিক। মকরকেতুকে সুস্থ করে কনকাক্ষ মহারাজার কাছে নিয়ে গেল রাজার ছেলে-মেয়ের যে কোথায় আছে তা প্রশ্ন করে অবশ্যই জানা যাবে। তারপর যা করার রাজাই ভেবেচিন্তে করবেন।

তারপর আর দেরি না করে জয়শীল ও সিদ্ধ সাধক জলগ্রহের উপর উঠে বসে মকরকেতুকে বলল, 'কেতু, তোমার কোনো ভয় নেই। কাছাকাছি যে গ্রাম আছে সেই গ্রামে নিয়ে গিয়ে তোমার দেহ থেকে ভাঙা তরবারি ও বিদ্ধ তির বের করা হবে। ওই ঘা গুলো শুকিয়ে গেলে তোমাকে হিরণ্যপুরে নিয়ে যাওয়া হবে।'

মকরকেতু দুটো হাত উপরের দিকে তুলে বিড়বিড় করে বলল, ‘সবই, ওই মায়া সরোবরেশ্বরের দয়া। পথে আবার কোনো ভিল হয়তো আর একটা তির ছুঁড়ে আমার ডান কাঁধ বিঁধে ফেলবে। তখন কি আপনারা...’ ‘ওরকম কোনো ভয়ের কারণ নেই। আমরা নজর রাখব। জলগ্রহকে এগোতে বল।' তারপর জলগ্রহ চলতে লাগল। চরকাচারি যেদিকে এগোতে বলল মকরকেতু জলগ্রহকে সেদিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। শেষে ওরা চরকাচারির গ্রামে পৌছাল। সেখানে পৌঁছে জয়শীল একটি বিষয়ে ভাবতে লাগল। মকরকেতুর মুখে সে দু-বার মায়া সরোবরেশ্বর শব্দটি শুনেছে। কেতু তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে জোরে জোরে বলেছে। একবার তার ইচ্ছা জাগল মায়া সরোবরেশ্বর কে তা জানার। কিন্তু পরে মনে হল কেতুকে এই প্রশ্ন করে কোনো লাভ হবে না। সে তো সত্য কথা বলবে না। তবে যেভাবে মকরকেতু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বার বার মায়া সরোবরেশ্বরকে ডাকছিল তাতে জয়শীলের মনে হল এই সরোবরেশ্বর নিশ্চয় কোনো শক্তি। এই শক্তির পেছনে মায়া থাকতে পারে, মন্ত্র থাকতে পারে, তবে এটা ঠিক যে মায়া সরোবরেশ্বরের উপর মকরকেতুর বিশ্বাস আছে।

জয়শীল ভাবতে ভাবতে হঠাৎ লক্ষ করল কারা যেন আসছে। কান খাড়া করে শুনল দূর থেকে ঢোলক বাজার শব্দ। কিছুক্ষণের মধ্যে দশ-পনেরো জন ভিল ঢোলক বাজাতে বাজাতে ওদের দিকে এগিয়ে এল। ওদের সঙ্গে ছিল একজন ওঝা। সে বলল, ‘বলি চাই, বলি। আমি হলাম ভিল মহাকালী। কুমির লোকটার গলা কেটে তার রক্তে পা ডোবাতে চাই। তোমরা যদি বাধা দাও আমি রেগে যাব। রেগে গিয়ে সমস্ত ভিলদের খেয়ে ফেলব। সব ধবংস করে ফেলব।' সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল।

হাতির পেছনে পেছনে আসছিল চরকাচারি, বীরনারায়ণ ও ভীম। ভীম তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, 'মা, মাগো, মা কালী!’ তারপর সে সিদ্ধ সাধককে বলল, ‘সাধক, এ হল আমাদের রাজার ওঝা। এর উপর এখন মা কালী ভর করেছে। মা র আমার কুমির লোকটার রক্ত চাই। কুমির লোকটাকে তাড়াতাড়ি নাবান। তারপর যা করার গণাচারি করে ফেলবে।'

জয়শীল বুঝল, ওঝাকে দেখে ভীম ঘাবড়ে গেছে। সে চোখের ইশারায় বীরনারায়ণকে কী যেন বলল। তৎক্ষণাৎ বীরনারায়ণ ভীমের কাছে যে অস্ত্র ছিল তা কেড়ে নিল। আর সেই মুহূর্তে জয়শীল মকরকেতুর কানে কানে কী যেন বলল ।

মকরকেতু হঠাৎ ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাতিকে বলল, 'জলগ্রহ, একে ধরে তুলে ফেল।'

জলগ্রহ ঝট করে ভীমের কোমরে শুঁড় জড়িয়ে ধরে ওপরের দিকে তুলে ফেলল। ভীম হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে আর্তনাদ করতে লাগল।

‘কেতু, এবার তুমি জলগ্রহটাকে ওই যারা বাজনা বাজিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে ওই দিকে নিয়ে যাও। তোমার কোনো ভয় নেই, আমি আছি। আমার কথা না শুনলে আমি এবং সিদ্ধ সাধক তোমাকে শেষ করে ফেলব।' বলে জয়শীল ভীমকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'শোনো, ভীম, তোমার লোকজনকে ফিরে যেতে বল। ওরা যদি তির ছোঁড়ার চেষ্টা করে তুমি কিন্ত সঙ্গেসঙ্গে মারা পড়বে। ওরা আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করলে তোমাকে হাতির পায়ের নীচে ফেলা হবে। হাতি তোমাকে মাড়িয়ে শেষ করে ফেলবে। তারপর ওদের সবাইকে মেরে ফেলে আগুন ধরিয়ে দেব।'

'জয়শীল, তুমি এসব কী বলছ? স্বয়ং ভিল মা কালী কুমির লোকটার রক্ত চাইলে আমরা কি না দিয়ে পারি। তাতে মা কালী ভীষণ চটে যাবে। আমরা কি তাকে চটাতে পারি? আমাদের এই মা কালীর ক্ষমতা যে কত বেশি আমরা তার পরিচয় বহু বার পেয়েছি। এই কালী যখন যা চেয়েছে। আমরা তাকে তা দেওয়ার চেষ্টা করে এসেছি।' ভীম বলল।

‘দেখ ভীম আমার সঙ্গে তর্ক করো না। এই মকরকেতু হল রাজার বন্দি। একে রক্ষা করার ভার আমার। এর যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে আমাকে লক্ষ রাখতেই হবে। বুঝতে পেরেছ?’ ভীমের গায়ে তরবারি ঠেকিয়ে জয়শীল বলল।

‘ওহে জয়শীল, তরবারি সরাও। মা কালীর খাঁড়ার চেয়েও তোমার তরবারিতে বেশি ধার আছে মনে হচ্ছে।' গোঁ গোঁ করতে করতে ভীম বলল।

ঠিক সেইসময় ওঝা চুলে ঝাঁকানি দিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে ওদের দিকে এগিয়ে এল। ওর পেছনে যে ভিলেরা ছিল ওরা ধনুকে তির চড়াল।

'জয়শীল, এখন কী হবে? চটপট বল আমাকে কী করতে হবে?’ আমার কী হবে?’ মকরকেতু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল।

বীরনারায়ণ চট করে জলগ্রহের পেছনে লুকিয়ে পড়ল। চরকাচারি কাঁপতে কাঁপতে জয়শীলকে বলল, 'তাড়াতাড়ি বলুন, আমরা কী করব? আমাদের কী হবে?'

'ওহে ভীম, আমার কথা কি বুঝতে পারোনি?' বলে জয়শীল তরবারি দিয়ে ভীমকে খোঁচা মারল। ঠিক সেইসময় সিদ্ধ সাধক 'জয় মহাকালী' বলে ওই ওঝার বুকে বল্লম ধরল।

ভীম দুটো হাত তুলে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'ওহে মামা, খবরদার তির-টির ছুঁড়বে না। কুমির লোকটা রাজার বন্দি। জয়শীল এই বন্দিকে রাজার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। বন্দির কোনো ক্ষতি হলে জয়শীল আমাদের আস্ত রাখবে না।'

কুমির লোকটার রক্তে আমি পা ভেজাতে চাই। ভিলদের মহাকালী।' বলে গণাচারি জলগ্রহের দিকে এগিয়ে আসতে চাইল।

জয়শীল ওর উপর ভীষণ রেগে গেল। চোখের পলকে জয়শীল জলগ্রহ থেকে এক লাফে নীচে নেমে গণাচারির চুলের মুঠো ধরে আছাড় মেরে তাকে নীচে ফেলে বলল, মিথ্যা কথা বলার জায়গা পাও না? মহাকালী তোমার উপর ভর করেছে? নেশাভাঙ করে এখানে ভয় দেখাতে এসেছ?'

'ও মা কালী, মা কালী গো, আমাকে বাঁচাও।' গণাচারি হাত-পা ছুঁড়ে আর্তনাদ করতে লাগল।

অন্যেরা কিছু করার আগেই সিদ্ধ সাধক বল্লম নিয়ে 'জয় মহাকালী' বলে ওই ভিলদের তাড়া করতে ছুটে গেল।

পরমুহূর্তেই দূর থেকে শোনা গেল, ‘দাঁড়াও! দাঁড়াও!’ দশ জন অশ্বারোহী দ্রুত এসে ওদের ঘিরে ফেলল।

এগারো

অশ্বারোহীদের দেখে জয়শীল সহজেই বুঝল ওরা কনকাক্ষ রাজার সেনা। তরবারি নামিয়ে জয়শীল ওদের বলল, 'ওই দেখ, ওই যে কুমির রূপধারী বিচিত্র হাতির পিঠে বসে আছে ও হল কনকাক্ষ রাজার বন্দি। ও যাতে পালিয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখবে।'

অশ্বারোহীদের নেতা মকরকেতু যে হাতির উপর বসেছিল সেই জলগ্রহ হাতিটিকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে অবাক হয়ে জয়শীলকে প্রশ্ন করল, ‘এ কি পিশাচ, দেবতা না দানব?’

‘সেটাই তো প্রশ্ন। এ দেবতা নয়, দানব নয়। মানুষ নয় জন্তুও নয়। এখনও বুঝতে পারিনি।' জয়শীল বলল।

ইতিমধ্যে সিদ্ধ সাধক, ব্যাধ ও গণাচারিকে আলাদাভাবে একটু দুরে নিয়ে গিয়ে বলল, 'ওহে, তোমরা ভুল করছ, ওকে তোমরা ভাবছ কালীভক্ত। ও কিন্তু কালীভক্ত নয়। ওর আচার-আচরণ সব কিছুর মধ্যে একটা মুখোশ আছে। আমি হলাম মহাভক্ত। ওকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তোমার তির চালাতে চাও, চালাও। তবে এমনভাবে চালাবে যাতে ওর বুকে তিরগুলো গেঁথে যায়। আমি এক, দুই, তিন বলব।'

সিদ্ধ সাধকের কথা শুনে ব্যাধেরা অবাক হল, কিছুটা ভয়ও পেল। দশ জন কালো পোশাক পরা অশ্বারোহীকে দেখে ওদের ভয় আরও বেড়ে গেল। বিরাট দাড়িধারী সিদ্ধ সাধক আর খাপ খোলা তরবারি হাতে জয়শীল-এরা

সবাইকে এক দলের ভেবে ওদের ভয় বেড়ে গেল।

ব্যাধেরা বুঝল সিদ্ধ সাধকের কথা না শুনে উপায় নেই। ওদের নেতা সবাইকে জিজ্ঞেস করল, 'ওহে শোনো, এখন কী করবে ভেবে দেখ? ওই মন্ত্র দণ্ডাধারী তান্ত্রিকের কথামতো তির ছুঁড়বে?’

‘এতগুলো লোক আমরা বিপদে পড়তে যাব কেন? কি বলেন গণাচারি?’ একজন ব্যাধ জিজ্ঞেস করল।

এই প্রশ্ন শুনেই গণাচারি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে জয়শীলের কাছে প্রাণের ভয়ে গিয়ে বলল, 'বাঁচান, আমাকে আমার দলের এই ব্যাধদের হাত থেকে বাঁচান। ওদের হাত থেকে তির বেরিয়ে এলে আর আমার রক্ষে থাকবে না।'

'মৃত্যু তো হবেই। তরবারিতে হলেই-বা কী আর তির বিধে হলেই-বা কী। মৃত্যুর হাত থেকে তোমার রেহাই নেই।' সিদ্ধ সাধক রাগের স্বরে বলল।

ব্যাধেরা একসঙ্গে ধনুকে তির চড়াল। তির ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত হল। তৎক্ষণাৎ জয়শীল ওদের থামতে বলে সিদ্ধ সাধককে বলল, 'সাধক, তুমি যা করছ তা ভালোভাবে ভেবে করছ না। তুমি রাজা নও। রাজাই পারে মৃত্যুদণ্ড দিতে।'

জয়শীলের গম্ভীর গলা শুনে সিদ্ধ সাধক থতমত খেয়ে বলল, 'তুমি কি এসব সত্য সত্যই করব ভেবেছ জয়শীল? গণাচারি কে নিয়ে একটু ঠাট্টাতামাসা । করছিলাম। এই অশ্বারোহীরা ঠিক সময়ে না এলে এই গণাচারি হয়তো তার জাতভাইদের দিয়ে আমাদের মেরে ফেলার চেষ্টা করত।'

এতক্ষণ যা ঘটছিল তা অশ্বারোহীদের নেতা দেখে জয়শীলকে জোড়হাত করে বলল, 'আপনার নাম কি জয়শীল? আমরা মন্ত্রীর কাছে আপনার নাম শুনেছি। আপনি নাকি রাজকুমার ও রাজকুমারীকে যারা নিয়ে গেছে তাদের ধরেছেন? আপনাকেই খুঁজছিলাম।'

'খুব ভালো হল অশ্বনেতা। আমরা গোটা অরণ্য খুঁজে এ লোকটাকে ধরেছি। লোকটাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে না? আমি মানে সিদ্ধ সাধক আর এই জয়শীল আমরা একসঙ্গে খুঁজে একে ধরতে পেরেছি।' বলল সিদ্ধ সাধক। 'লোকটাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। কাধে, পেটে, তির তরবারি গেঁথে হাতির পিঠে বসে আছে। এরকম দৃশ্য আমি দেখিনি। এমনভাবে বসে আছে যেন এগুলো তার অলংকার।' অশ্বনেতা বলল।

'ওগুলো অলংকার নয়। ওগুলো আছে বলেই সে মরে যাবে। আমি আর চরকাচারি ওকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করব ভেবেছিলাম। আমার গ্রামের লোকের মুখেই মন্ত্রীমশাই সব খবর শুনেছেন।' হাতির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বীরনারায়ণ বলল।

আর বেশিক্ষণ সেখানে থাকা জয়শীলের কাছে নিরাপদ বলে মনে হল না। খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে মন্ত্রীকে সমস্ত জানানো উচিত। রাজার ছেলে-মেয়েদের এখনও যে খুঁজে পাওয়া যায়নি, তা জানাতে হবে। মকরকেতু যাতে মরে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। ও মরে গেলে রাজকুমার ও রাজকুমারীকে পাওয়া যাবে না।

জয়শীল এসব কথা ভাবতে ভাবতে মকরকেতুকে বলল, 'কেতু, তোমার আর কোনো প্রাণের ভয় নেই। স্বয়ং কনকাক্ষ রাজা তোমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছেন। স্বয়ং মন্ত্রী যখন কেতুর খবর রাখছেন তখন আর ভাবনার কিছু নেই।'

মকরকেতু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'পেটে যে তরবারিটা আছে, তার চেয়ে কাঁধে যে তির গেঁথে আছে সেটা বেশি কষ্ট দিচ্ছে। এই তির যে ছুঁড়েছে সে আর একটু হলে আমার জলগ্রহের খোরাক হয়ে যেত। তবে ওই যে একটু ধরেছে তাতেই হয়তো লোকটা মরে গেছে।'

জয়শীল তাড়াতাড়ি গিয়ে ভীমকে দেখল। তাকে দেখে মনে হল তার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। পেছনে পেছনে চরকাচারিও এল। সে পরীক্ষা করে দেখে বলল, ‘জয়শীলমশাই, এ তো বেঁচে আছে। নাড়ী চলছে।'

‘সে-কথা ঠিক। কিন্তু একে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে কী করে? ভালো হত, একে ওর জাতভাইদের হাতে যদি দেওয়া যেত।' জয়শীল বলল।

জয়শীলের কথা শেষ হতে-না-হতেই সিদ্ধ সাধক ভীমের কানে মুখ রেখে চিৎকার করে বলল, 'ওরে ভীম, এবার ওঠ। তুমি যে বুনো মুরগিটাকে মেরেছিলে সেটা মন্ত্রীমশাই কুমির লোকটাকে খাওয়াবে ভেবেছিল। কিন্তু হঠাৎ সেটা নিয়ে গণাচারি ছুটে পালাচ্ছে।'

লাফিয়ে উঠে পড়ল ভীম। পালাতে যাবে এমন সময় অশ্বারোহীদের সে দেখতে পেল। দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কই ভূতের নেতা গণাচারি কোথায়?’

সিদ্ধ সাধক ভীমের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'ওরে ভীম, তুমি যে দেখেও দেখছ না। দেখ, তোমার গণাচারি কি না?’

সাধকের কথা শুনে ভীম তাকিয়ে দেখল। তার জাতভাইরা একধারে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। গণাচারির দিকে তাকাতেই তার মুরগির কথা মনে পড়ল।

‘কোথায়? আমার মুরগিটা কোথায়? আমার মুরগি না দিলে আমি আস্ত রাখব । অনেক কষ্টে মুরগিটাকে মেরেছি। বলে ভীম পাথর তুলে গণাচারির দিকে ছুটল।

গণাচারি চিৎকার করে বলল, 'আমার এই লোকটার ঘাড়ে কুক্কুর পিশাচ ভর করেছে। বিড়াল মন্ত্র ছাড়া ওই পিশাচ ছাড়বে না। ও যাকে-তাকে মেরে দেব।' গণাচারির সঙ্গে সকলে ছুটল।

‘বেঁচে গেলাম জয়শীল মুক্তি পেয়েছি।' বলতে বলতে সিদ্ধ সাধক হাসল।

ওদের পালানো দেখে জয়শীল বলল, ‘সাধক, এই গোটা ঝামেলাটা হয়েছে। তোমার জন্য। লোকটা এটা-ওটা মেরে খিদে মেটাচ্ছিল। ওর নাম ছিল রাম। তুমি ওর বিরাট একটা নাম দিলে ভীম। সেও বীরপুরুষ সেজে ছোটাছুটি করছিল। যাক, এখন সবাই পালিয়েছে, বাঁচা গেল।'

‘জয়শীল, কথাটা ঠিকই বলেছ। তবে একটা লাভ হয়েছে। ওরা এখন ওই খ্যাপা ভীমের জন্যে ছোটাছুটি করবে। আমাদের দিকে আর কেউ আসবে না।' সিদ্ধ সাধক বলল।

অশ্বনেতা বলল, ‘রওনা হওয়া যাক।'

‘ঠিক আছে।' বলে জয়শীল চরকাচারি ও বীরনারায়ণকে কাছে ডেকে বলল, 'এবার তোমরা সামনে থেকো। খবর পেয়েছি মন্ত্রীমশাই সদলবলে তোমাদের গ্রামে এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।'
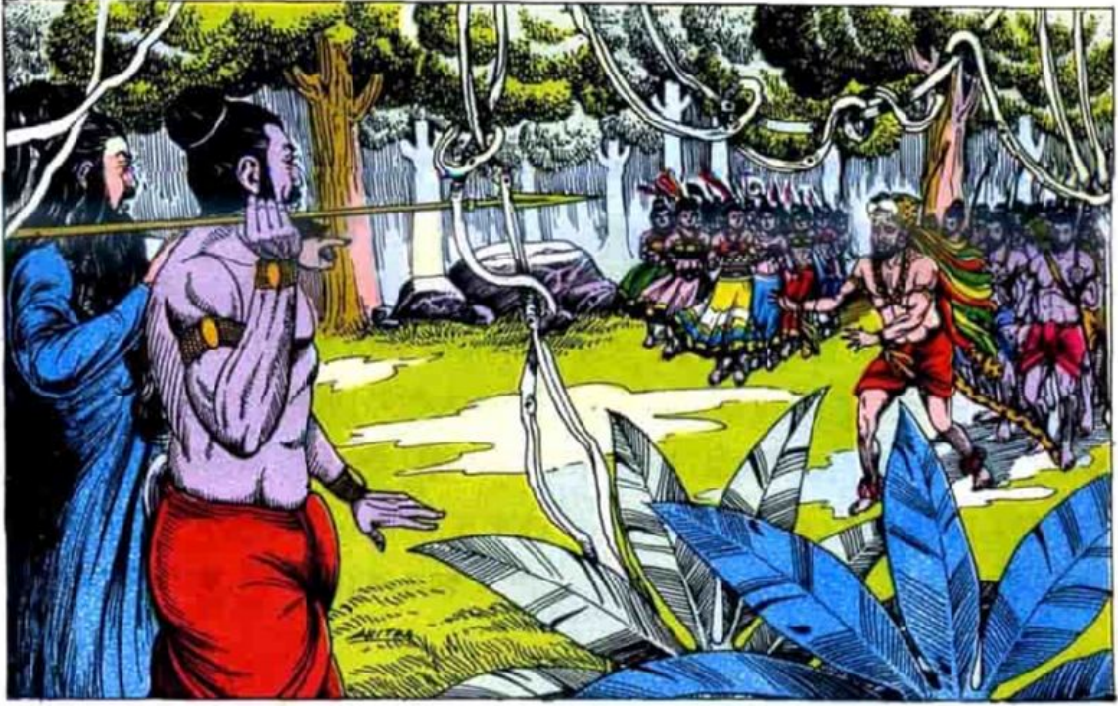
‘ওদের গ্রামের কাছেই সেনাবাহিনীর তাবু পড়েছে। আপনার দেখা পেলেই আমাদের উপর ভার ছিল আপনাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার।' বলল অশ্বনেতা।

জয়শীল সবাইকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করল, 'কথাটা সকলের কানে গেছে তো? এবার রওনা হওয়া যাক।'

চরকাচারি বলল, 'তাহলে কুমির লোকটাকে রাজ বৈদ্য চিকিৎসা করবেন মন্ত্রীর সামনে ওর চিকিৎসা হবে?’ ‘দেখ চরকাচারি, রাজার অশ্বারোহী সৈন্য এখানে এসেছে। ওদের কর্তব্য আমাদের নিয়ে যাওয়া। আমাদের কর্তব্য হল সেখানে যাওয়া। সেখানে যাওয়ার পর মন্ত্রীমশাই যা বলবেন তাই আমরা করতে বাধ্য। চিকিৎসা রাজ বৈদ্যকে দিয়ে হয়তো করাবেন।' জয়শীল বলল।

‘আজ্ঞে আমাদের একটা আশা ছিল। আমরা মন্ত্রীর সামনে চিকিৎসা করার সুযোগ পেলে তার নজরে পড়তাম, তাতে আমাদের ভবিষ্যত ভালো হত।' চরকাচারি বলল। ঘাড় নেড়ে বীরনারায়ণ সায় দিল।

‘আচারি পদটা যে কীসের জন্য নামের সঙ্গে জোড়া হয়েছে জানি না। তবে মন্ত্রীর সামনে চিকিৎসা করার সময় যদি মককেতু মরে যায় তাহলে কিন্তু তোমরা দু-জনে, যতবড়ো বৈদ্য হও না কেন, শাস্তি পাবে। এটা মনে রেখো।’ জয়শীল বলল।

‘ওদের দুজনকে শাস্তি দেওয়ার ভার আমাকে দিও জয়শীল। আমার খুব ইচ্ছে দু-জনকে মহাকালের সামনে বলি দেওয়ার। বলি দিতে পারলে শুধু আমাদের নয় জগতের মঙ্গল

হবে জয়শীল।' বলল সিদ্ধ সাধক।

'আর কথা নয়, এবার সবাইকে এগোতে হবে।' বলল জয়শীল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে পাহাড়ের কোলে, যেখানে মন্ত্রীর তাঁবু পড়েছিল, সেখানে সবাই পৌঁছে গেল। মন্ত্রী ধর্মমিত্র সকলের দিকে তাকিয়ে জয়শীলকে বলল, 'রাজার পুত্র-কন্যাকে উদ্ধারের সূত্র পাওয়ায় তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই দুরাত্মাটা কি ওদের কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, কিছু বলেছে?'

জয়শীল সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বলে শেষে বলল, 'মন্ত্রীমশাই প্রথমে ওর শরীর থেকে ভাঙা তরবারি, তির ইত্যাদি বের করতে হবে। এগুলো বের করার পর তাকে প্রশ্ন করা সঠিক ও শোভন হবে।'

'ঠিক আছে তাই করা যাবে। তবে চিকিৎসার পর সে যদি মুখ না খোলে, আমাদের প্রশ্নের জবাব না দেয়, তাহলে কিন্তু হাতি দিয়ে মাড়িয়ে ওকে প্রাণে মেরে ফেলব।' মন্ত্রী বলল।

ওদের কথাবার্তা মকরকেতু কান খাড়া করে শুনে বলল, 'জয়শীল, আমার এই জলগ্রহ অনেকদিন জলপান করতে পারেনি। জলখাইয়ে নিতে চাই।'

'তা করতে পার। তবে আমি এবং সাধক দু-জনেই জলগ্রহের পিঠে, তোমার পেছনে বসে থাকব। তোমাকে বিশ্বাস নেই। তুমি যেকোনো মুহূর্তে জাদুর খেলা দেখাতে পার।' বলে জয়শীল ও সিদ্ধ সাধক উঠে তার পাশে বসল।

মকরকেতু জলগ্রহকে হেঁকে কাছে যে পুকুরটা ছিল সেই পুকুরে নেমে অনেকদূর চলে গেল। সেখানে মকরকেতু বলল, 'জয়শীল, আমাকে তো মরতেই হবে। আগে আর পরে।' বলে, এক মুহূর্ত পরে চিৎকার করে বলল, 'হে, মায়া সরোবরেশ্বর!' তারপর জলগ্রহকে বলল, 'জলগ্রহ, জলে পথ কর।'

সঙ্গেসঙ্গে জলগ্রহ পিঠে জয়শীল ও সিদ্ধ সাধককে নিয়েই ডুবে গেল।

বারো

জলগ্রহ হঠাৎ জলে ডুবে যাওয়ায় জয়শীল ও সিদ্ধ সাধক জল থেকে উঠে আসতে পারল না। দু-জনে বুঝল জলে ডুবেই তাদের মরে যেতে হবে। সিদ্ধ সাধক আর বাঁচবার উপায় নেই ভেবে তার দেবীকে স্মরণ করল, 'জয় মহাকাল!'

জয়শীল এই ডাক শুনতে পেয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। তার সামনেটা মকরকেতু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। তার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল। গভীর জলে নেমেও সিদ্ধ সাধকের গলা সে শুনতে পেল। সামনে সে মকরকেতুকে দেখতে পাচ্ছিল। এসব দেখে জয়শীল অবাক না হয়ে পারল না।

জয়শীল স্থান-কাল-পাত্র ভুলে যেন হঠাৎ মকরকেতুর কাঁধে হাত দিয়ে গর্জে উঠল, 'ওরে এই দুরাত্মা, কী করছ? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আমরা অনেক আগেই তোমাকে মেরে ফেলতে পারতাম। কিন্তু মারিনি। প্রতিদানে তুমি আমাদের জলে ডুবিয়ে মারতে চাইছ?'

এই প্রশ্ন শুনে মকরকতু হো-হো করে হেসে বলল, 'জয়শীল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তালগাছ প্রমাণ গভীর জলে আমরা এখন আছি। কোনো মানুষ এত গভীর জলে ডুবে দেখতে পায়, কথা বলে? শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে? বাঁচতে পারে?'

'সত্যি জয়শীল, এ তো অদ্ভুত ব্যাপার। আমার মনে হচ্ছে, এসব মহাকালের দয়া।' বলে সিদ্ধ সাধক চারদিকে তাকাল।

ওই পাহাড়ি পুকুরের গভীরে নানা ধরনের প্রাণী সাঁতার কেটে ওদের আশপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। বড়ো বড়ো মাছ, কুমির সাপ আরও যে কত রকমের প্রাণী ছিল তা বলার নয়। জলগ্রহ মাঝে মাঝে শুঁড় তুলে এগিয়ে যাচ্ছিল সেখান থেকে ওরা ঢুকলে একটা পাহাড়ি গুহায়। ঝরনার জল বেরিয়ে আসছিল ওই গুহা থেকে।

মকরকেতু হুকুম দেওয়ার মতো বলল, 'জলগ্রহ!'

'জয়শীল, সিদ্ধ সাধক, কথা বলছ না কেন? কী ভাবছ? এত গভীর জলে ঢুকেও কীভাবে বেঁচে আছ তাই ভাবছ? বুঝতে পারছ কীভাবে কি হচ্ছে? মকরকেতু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল।

জয়শীল শক্ত হাতে তরবারি ধরে বলল, 'বুঝতে পেরেছি। তোমাকে আর তোমার জলগ্রহকে যতক্ষণ ছুঁয়ে আছি ততক্ষণ আমাদের গায়ে জল লাগবে না, আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারব।'

'আস্তে আস্তে সবই বুঝতে পারবে জয়শীল। অত শক্ত হাতে তরবারি ধরে আছ কেন?' মকরকেতু বলল।

তোমার মুণ্ডু কাটার জন্যে। তুমি জলগ্রহকে নিয়ে উপরে উঠবে কি না জানতে চাই?' জয়শীল বলল। সিদ্ধ সাধক হাতের ত্রিশূল উপরে তুলে জোরে জোরে বলল, 'জয় মহাকাল! জলের তলায় বলি দেওয়া নিষেধ। ধৈর্য ধর জয়শীল। এইবার দেখ কী হয়।' বলে ত্রিশূলটা মকরকেতুর গর্দানের উপর রেখে চাপ দিল।

মকরকেতু হাসতে গিয়ে হাসতে পারল না। ত্রিশূলের চাপ লাগছিল। হাত দিয়ে সেটা সরাতে সরাতে সে বলল, 'মহাবীরের আর মহাকালের ভক্তের— দু-জনেরই মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। শুনে রাখ, আমি আর এই জলগ্রহকে নিয়ে জলের উপরে উঠছি না। আর তোমাদের হাতে বন্দি হতেও যাচ্ছি না। আর এ ও শুনে রাখ, তোমরা যে মুহূর্তে আমাকে মেরে ফেলবে সেই মুহূর্তেই তোমাদেরও মৃত্যু হবে। এত গভীর জল থেকে

উপরে উঠে যাওয়ার ক্ষমতা তোমাদের কোনোক্রমেই থাকবে না। হয়তো ভেসে উঠবে তবে জ্যান্ত অবস্থায় নয়।'

জয়শীল ও সিদ্ধ সাধক ভালোভাবেই বুঝতে পারল যে ওরাই এখন মকরকেতুর হাতে বন্দি। ওদের ভয় করল। কিন্তু করার কিছুই ছিল না। জলগ্রহ ওই গভীর জলে অবলীলাক্রমে এগিয়ে যাচ্ছিল।

'মকরকেতু, তাহলে তুমি আমাদের দুজনকে বন্দি করে নিয়ে যাচ্ছ? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ শুনি?' জয়শীল জিজ্ঞেস করল।

এমন সময় একটা কুমির বিরাট বড়ো মাছকে তাড়া করতে করতে ওদের দিকে এগিয়ে এল। জয়শীল তরবারি তুলে কুমিরটাকে মারতে গেল। তখন মকরকেতু কুমিরের লেজ ধরে কয়েক বার পাক দিয়ে তাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর সে বলল, 'জয়শীল তোমরা দুজনে আমার বন্দি নও। আমিও এখন তোমাদের হাতে বন্দি নই। জলগ্রহ এখন যেখানে নিয়ে যাচ্ছে। সে জায়গায় পৌঁছে গেলে তোমরা তোমাদের পথে যেতে পারবে।'

মকরকেতুর কথা শেষ হতে-না-হতেই জলগ্রহ একটি গুহায় ঢুকল। ঘন। অন্ধকার গুহা। জয়শীল মকরকেতুকে শক্ত হাতে ধরে রইল। কারণ ওই অন্ধকারে একবার গড়িয়ে পড়লে আর রক্ষে ছিল না। সিদ্ধ সাধক ডাকতে লাগল, 'জয় মহাকাল! বিপদ থেকে তুমিই একমাত্র রক্ষা করতে পার।' তারপর সে জয়শীলের কোমর শক্ত হাতে ধরল।

কিছুক্ষণ পরেই জলগ্রহ সেই গুহা থেকে বেরিয়ে একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠল। মকরকেতুর নির্দেশে জলগ্রহ সশব্দে ডাক ছাড়ল।

এতক্ষণ পরে জল থেকে বেরিয়ে আসার আনন্দে জয়শীল ও সিদ্ধ সাধক টেনে শ্বাস-প্রশ্বাস নিল। তারপর যে জায়গায় ওরা দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে চারদিকে তাকাল। চারদিকেই পাহাড় ছিল। মাঝখানে নীচের দিকে জল ছিল।

পাহাড়ের ভেতর থেকে, গুহা থেকে জল আসছিল। অন্য গুহা দিয়ে জল সশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

এসব দেখে জয়শীলের মনে পড়ল আগের ঘটনা। জলে ডোবার আগে মাঝে মাঝে জয়শীল ‘মায়া সরোবরেশ্বর’ বলে চিঙ্কার করত। সে সরোবরেশ্বরকে স্মরণ করত। এটাই হয়তো সেই সরোবর। জয়শীল মনোযোগ সহকারে চারদিকের সব কিছু দেখছিল।

মনের প্রশ্ন মনে না রেখে সে মকরকেতুকে জিজ্ঞেস করল। মকরকেতু তাকে বলল, ‘জয়শীল, তুমি যা ভাবছ তা ঠিক নয়। আমাদের রাজা সরোবরেশ্বর যে সরোবরে থাকে এটা সেটা নয়। যে মানুষ ওই জায়গাটা দেখেছে সে। আর ফিরে যেতে চায়নি।'

'তাহলে কি আমাদের সেখানে নিয়ে যাচ্ছ?’ জয়শীল জিজ্ঞেস করল।

মকরকেতু মাথা নেড়ে জানাল যে সেখানেই সে নিয়ে যাচ্ছে। তখন সিদ্ধ সাধক পেছন থেকে ত্রিশূল দিয়ে তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করতেই মকরকেতু নির্ভয়ে বলল, 'তোমরা দুজনেই বড্ড তাড়াহুড়ো কর। অহেতুক আমাকে ধরে তোমরা এই বিপদে পড়লে। আমার পেটে তরবারি ঢুকে রয়েছে দেখেও বের করতে দিলে না। উপরন্তু কাঁধে তির বেঁধালে। তোমরা কি সাঁতার জানো? না জানলে, জলে ভেসে আসা কাঠ ধরে ভাসতে ভাসতে যেদিকে ইচ্ছে চলে যাও।' বলে সে জোরে জোরে বলল, জলগ্রহ এগিয়ে চল।'

জয়শীল বুঝতে পারল বিরাট একটা বিপদে তারা পড়ে যাবে। তাই জলগ্রহ জলে ডোবার আগেই সিদ্ধ সাধককে ইশারা করে জলে ঝাঁপ দিল। কিছুক্ষণ পর ওরা বিশাল গাছ ধরল। গাছ বেয়ে একটু উঠতেই সামনে দেখতে পেল একটি বাঘ।

একই সঙ্গে এরা বাঘকে আর বাঘ ওদের দেখতে পেল। একবার ডেকে সামনের দুটো পা তুলে বাঘ সিদ্ধ সাধকের দিকে তাকাল। সাধক ত্রিশূল তুলতেই জয়শীল। তাকে বলল, 'সাধক, খুব সাবধান! এমনও হতে পারে যে বাঘও আমাদেরই মতন জল থেকে ডাঙায় ওঠার চেষ্টা করছে। ত্রিশূল দেখেই হয়তো সে তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা ভাবছে। সে হয়তো তোমাকে ভয় পাচ্ছে। তোমার আর বাঘের লাফালাফিতে এই গাছ জলে ডুবে যেতে পারে।'

‘সেটা ঠিক। কিন্তু বাঘটা যেভাবে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য পা তুলে আছে তা দেখে আমি কি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি?’ বলে এক দৃষ্টিতে বাঘের দিকে তাকিয়ে

থেকেই সাধক বলল, 'জয়শীল, আমি মুখ ঘোরালেই বাঘ হয়তো আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই গাছটা ভাসতে ভাসতে কোথায় যে যাবে বুঝতে পারছি না।'

একটু ভয় পেয়ে জয়শীল বলল, 'আমিও বুঝতে পারছি না সাধক। তবে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই অঘটন ঘটে যাবে।'

সিদ্ধ সাধক ভয়ে কাঠ হয়ে বলল, 'এই গাছটা ছেড়ে দিলে কেমন হয় ?'

'খবরদার, গাছ ছেড় না। আর বাঘের দিকে যেভাবে তাকিয়ে আছ সেভাবেই থাক।' জয়শীল বলল।

পরক্ষণেই বাঘ গর্জন করে উঠল। সিদ্ধ সাধকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। পর মহর্তেই জলপ্রপাতের মখে পড়ে গাছটা দু-তিন-শো গজ নীচের দিকে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

জয়শীল ও সাধক ওই গাছ ধরে জলপ্রপাতের সঙ্গে গড়াতে গড়াতে নীচের দিকে পড়তে পড়তে, পরিষ্কার বুঝতে পারছিল যে ওরা জীবনের শেষ মূহূর্তগুলো কাটিয়ে যাচ্ছে। অবশেষে গাছটা যেখানে পড়ল সেখানে অনেকগুলো বড়ো বড়ো পাথর ছিল। নীচে পড়ে গাছটা দু-ভাগ হয়ে গেল। একটা ভাগে রইল জয়শীল অন্যভাগে রইল সিদ্ধ সাধক ও বাঘ। জলপ্রপাতের সঙ্গে নীচে পড়ার কিছুক্ষণ পরে জয়শীল চোখ খুলে তাকাল। দেখতে পেল এক কোমর জলে সে দাঁড়িয়ে আছে। সে জলপ্রপাতের গর্জন শুনছিল।

'তাহলে আমি বেঁচে আছি। হাত-পা আছে না ভেঙে গেছে!' বলতে বলতে সে নিজের শরীরটাকে দেখল। হাত-পা নাড়ল। ডান হাতে খুব ব্যথা। দুটো পা-ই ব্যথা করছিল। নীচের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে সে অবার বলল, 'আশ্চর্য ব্যাপার! আমার হাত-পা সব আছে! আমি বেঁচে আছি!' কয়েক জায়গায় চোট লেগেছে। হঠাৎ মাথা তুলে বলল, 'তাই তো, সাধক কোথায়!'

আশেপাশে বড়ো বড়ো পাথর ছড়িয়ে ছিল। গাছের যে অংশে সে ছিল। সেই অংশটা ওই পাথরের আড়ালে পড়েছিল। সে সাধককে দেখতে পেল না।

'সাধক কোথায় গেল! সে কি আর নেই! কোনো বড়ো পাথরের উপর পড়েই হয়তো সে মারা গেছে! বলতে বলতে জয়শীল চারদিকে তাকাতে লাগল। সিদ্ধ সাধককে দেখতে না পেয়ে তার মনে কষ্ট হচ্ছিল। এর আগে কত বিপদে-আপদে একসঙ্গে কাটিয়েছে। এতক্ষণে হয়তো সাধকের মৃতদেহ কুমিরের পেটে চলে গেছে। এখন কী করি? শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কি আমাকেই করতে হবে?' জয়শীল আপন মনে বলল।

সেখান থেকে এক-পা এক-পা করে পথ করতে করতে সে বেরোতে লাগল। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর জয়শীল শুনতে পেল বাঘের গর্জন। আর তখনি তার মনে পড়ল ওই বাঘের

কথা।

'সাধক হয়তো বাঘের পেটে চলে গেছে।' বলে তরবারি বের করে যেদিক থেকে বাঘের গর্জন আসছিল সেদিকে সে এগিয়ে গেল। কিছু দূর যাওয়ার পর জয়শীল দেখতে পেল একজায়গায় সাধক কাঠ হয়ে পড়ে আছে। মনে হল, বাঘ পাথরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। জয়শীল দেখতে পেল বাঘ সাধকের দিকে এগোচ্ছে।

তেরো

বাঘকে সিদ্ধ সাধকের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে জয়শীল বুঝেছিল সাধক বিপদে পড়েছে। দেখেই সে বাঘের দিকে ছুটে গেল। বাঘ থাবা তুলে সাধকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে এমন সময় জয়শীল একটি পাথর তুলে বাঘের দিকে ছুঁড়ল।

জয়শীল আর বাঘের মধ্যে দূরত্ব মাত্র তিরিশ ফুট। যে মুহূর্তে বাঘ সাধকের মুণ্ডুটা আশা করেছিল সেই মুহূর্তে পাথরের আঘাত খেয়ে সে থতমত খেয়ে গেল। চারদিকে তাকাতে লাগল সে। তীব্র বেগে জয়শীল ঠিক সেইসময় বাঘের পেছনে এসে তার পেছনের পা ধরে উপরের দিকে তুলল। বাঘ সামনের পা তুলতে না পেরে গর্জন করতে লাগল। এতক্ষণ সিদ্ধ সাধক অচেতন অবস্থায় পড়েছিল। গর্জন শুনে চোখ খুলতেই বাঘের মুখ তার চোখে পড়ল। সে যথারীতি 'জয় মহাকাল' বলে তার ত্রিশূল তুলতে গেল। কিন্তু ত্রিশূল কোথায় ? তখন তার মনে আরও বেশি ভয় ঢুকল।

এতক্ষণে জয়শীল বাঘের পেছনের পা দুটো ধরে বুঝতে পারল যে তার ওই দুটো পা-ই ভাঙা। ওই পাগুলো ধরে বাঘকে টানতে টানতে সাধকের কাছে গিয়ে জয়শীল বলল, 'সাধক, শুধু বাঘ দেখছ, আমাকে দেখতে পাচ্ছ না?'

এই প্রশ্ন শুনে সাধক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বড়ো বড়ো চোখে জয়শীলের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, 'আরে, জয়শীল! তুমি এখানে আছ! আমার অনেকক্ষণ চেতনা ছিল না। বাঘের গর্জন কানে যেতেই আমার জ্ঞান ফিরেছে।'

'যাই হোক, এখনও আমরা দু-জনে প্রাণে বেঁচে আছি।' বলে জয়শীল বাঘকে টানতে টানতে আবার বলল, 'বেচারা বাঘ, এর গায়েও আঘাত লাগে! পা দুটো তো গেছে ভেঙে। জানো সাধক, এর এখন নিজের খাবার জোগাড় করার ক্ষমতা নেই। খিদের জ্বালায় তিলে তিলে মরার চেয়ে এর বোধ হয় এক্ষুনি মরে যাওয়া ভালো।' বলে তরবারি তুলে বাঘকে হত্যা করার জন্য যে প্রস্তুত হল।

ইতিমধ্যেই সাধক এদিক-ওদিক খুঁজে তার ত্রিশূল পেয়ে গেল। শূল হাতে করে সে জয়শীলের কাছে এল। বাঘ মাথা নীচু করে পড়েছিল। জয়শীল বলল, 'সাধক এই বাঘটা তো আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি। এটাকে মেরে ফেলতে আমার ইচ্ছে করছে না।'

সাধক জয়শীলের হাত থেকে তরবারি নিয়ে বলল, 'এই বাঘটা বেঁচে মরে আছে। খিদের জ্বালায় নরকযন্ত্রণা ভোগ করছে এখানে। ওকে এই কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়া উচিত। তাতে আমাদের পূণ্য হবে।' বলে সাধক এক আঘাতে বাঘের মুণ্ডু মাটিতে নামিয়ে দিল।

জয়শীল চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'সাধক, এখন আমরা কোনদিকে যাব? কনকাক্ষ রাজার ছেলে-মেয়েকে যে অপরহরণ করেছে, বলতে গেলে আমরা তাকে ছেড়ে দিয়েছি। এটা বোধ হয় আমাদের উচিত হয়নি।'

'জয়শীল, ওকে আমরা ছেড়েছি না ও আমাদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল তা বলা শক্ত। আমরা তাকে ছাড়ি বা না ছাড়ি জলগ্রহের পিঠে বসে আমরা কতদিন বাঁচতে পারতাম। যাই হোক, এখন আমাদের ভাবতে হবে কী করা যায়। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আমরা কীভাবে এখান থেকে যেতে পারব তাই ভাবতে হবে। পথ খুঁজে বের করতে হবে।' সাধক বলল।

সাধকের কথা শেষ হতে-না-হতেই বনজঙ্গলের আড়াল থেকে মানুষের আর্তনাদ শোনা গেল। শুধু মানুষ নয়, অন্য একটা জন্তুরও আর্তনাদ একই সঙ্গে শোনা গেল।

'জন্তু কি মানুষকে ধরেছে, নাকি মানুষ জন্তুকে ধরেছে। একে অন্যকে ধরলে দু-জনের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে কেন? যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল। সেদিকে তাকিয়ে সাধক বলল।

'সাধক, এমনও তো হতে পারে যে মানুষ এবং জন্তু দুটোই অসহায় অবস্থায় পড়েছে। দুটোকেই অন্য কোনো কিছু ধরে শেষ করে ফেলতে চাইছে। এই অবস্থায় জন্তু এবং মানুষ আর্তনাদ করে। চল, দেখা যাক।' বলে জয়শীল তীর ধরে এগিয়ে গেল।

সাধক ও জয়শীল কিছুদূর যাওয়ার পর ভয়াবহ এক দৃশ্য দেখতে পেল। জলের ধারে এক বিরাট গাছ। সেই গাছের ডালে ঝুলছে একটি জন্তু এবং মানুষ। জন্তুটাকে দেখে মনে হচ্ছে নেকড়ে। দূর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না কোন জানোয়ার। গাছের ডালে ছোটো ছোটো পাতা আছে।

'এ তো অদ্ভুত ব্যাপার। অন্য কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না গাছের উপরে। অথচ মানুষ এবং জন্তু এমনভাবে আর্তনাদ করছে যেন ওদের ওপর থেকে কেউ টানছে।' জয়শীল বলল।

'আমার মনে হয় জয়শীল, ওদের টানছে ভূত অথবা পিশাচ। তুমি বললে, এই ত্রিশূল দিয়ে আমি পিশাচটাকে গাছ থেকে নামাব।' বলতে বলতে সাধক ওই ডালের দিকে এগিয়ে যেতেই অন্য একটা ডাল আস্তে আস্তে নেমে তার কাঁধ ধরতে গেল। সাধকের মনে হল কোনো শক্তিশালী লোক যেন তার কাঁধ ধরে তাকে উপরে তোলার চেষ্টা করছে। তৎক্ষণাৎ

লাফ দিয়ে, সরে গিয়ে, সাধক বলল, 'জয়শীল, সাবধান! এটা সাধারণ গাছ নয়। এটা নিশ্চয়ই রাক্ষুসে গাছ।'

'এটা রাক্ষুসে গাছ নাকি ভূত পিশাচের গাছ আমি তা জানি না। তবে একটা ব্যাপার বেশ বুঝতে পারছি; এ গাছ মানুষ জন্তুজানোয়ার যা পায় তাই খায়।' বলে জয়শীল ছুটে গিয়ে যে ডালে মানুষ এবং জন্তু ছিল সেই ডালটা তরবারির এক আঘাতে, কেটে ফেলল। সঙ্গেসঙ্গে ওই জন্তু ও মানুষ ডালসহ জলে পড়ে গেল।

জয়শীল ও সাধক তাড়াতাড়ি গিয়ে লোকটাকে জল থেকে তুলে আনল। জন্তুটাও জল থেকে উঠে এল তীরে!

'জয়শীল, ওই জন্তুটা দেখছি অদ্ভুত ধরনের। অনেকটা ঘোড়ার মতো। এটাকে বোধ হয় কাজে লাগানো যায়।' সাধক বলল।

যে লোকটা ওই গাছের ডালে মৃত্যুভয়ে আর্তনাদ করছিল সে ফ্যালফ্যাল করে জয়শীল ও সাধকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা একজন সেনা নায়ককে মানুষখেকো গাছের খপ্পর থেকে বাঁচালেন। আমাদের রানি, এরজন্য আপনাদের পুরস্কৃত না করে পারবেন না।'

জয়শীল ওই অদ্ভুত চেহারার লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই অঞ্চল শাসন করার একজন রানি আছেন, সেই রানির সেনাবাহিনী আছে। সেই সেনাবাহিনীর, তোমার মতো একটা সেনানায়ক হাছে। তাহলে তো দারুণ ব্যাপার।'

'জয়শীল, আমার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে এই গাছটা। মানুষখেকো গাছ আছে শুনেছিলাম, আজ প্রথম দেখলাম। গাছের পেছনের দিকে দিয়ে দেখ মানুষ আর জন্তুর কত হাড় পড়ে আছে। গাছটার দেখছি কুম্ভকর্ণের মতো ক্ষুধা আছে।' সাধক বলল।

তারপর সাধক ও জয়শীল গাছের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করে অনেক হাড় দেখতে পেল। হাড় দেখতে দেখতে জয়শীল গাছের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। হঠাৎ তার চোখের সামনে একটি ডাল নেমে এল। দেখেই জয়শীল একলাফ দিয়ে দূরে চলে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে ওই গাছটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

এমন সময় ওই সেনানায়ক তার ওই জন্তুটিকে ধরে জয়শীল ও সাধকের কাছে এসে বলল, 'আপনারা আমাকে আজ প্রাণে বাঁচিয়েছেন। গড়ে জাতির উপকার করেছেন। আসুন, আপনাদের রানির কাছে নিয়ে যেতে চাই। আসুন।'

সাধক বিরক্ত হয়ে বলল, 'কীসের সেনানায়ক হে তুমি? একটা গাছের খপ্পর থেকে তুমি নিজেকে ছাড়াতে পারনি। তোমার মতো সেনানায়ক যে রানির আছে। সে আমাদের কী পুরস্কার দেবে? হয়তো দুটো ফল খাওয়াবে আর না হয়...।'

এমন সময় দূর থেকে শোনা গেল অন্য ধরনের আওয়াজ। কান খাড়া করে শুনে বোঝা গেল রথের মতো কিছু আসছে। ওরা যা ভেবেছিল তাই। ওদের দিকেই একটি রথ আসছিল। আশেপাশে অনেক লোক। রথ দেখে মহাশব্দে ওদের সেনানায়ক এগিয়ে গিয়ে বলল, 'মহারানি', বলেই মাথা নুইয়ে নমস্কার করে সাধক ও জয়শীলকে দেখিয়ে বলল, 'মহারানি, এই দু-জন আমাকে এই প্রাণীখেকো গাছের খপ্পর থেকে বাঁচিয়েছে।'

রানি ওই সেনানায়কের কথা শুনে জয়শীল ও সাধকের দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'আপনারা কাল রাত্রে আমার স্বপ্নে এসেছিলেন। আমাকে কথা দিয়েছিলেন। আমার জাতিকে বিরাট বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।'

ওর কথা শুনে সাধক আস্তে আস্তে বলল, 'জয়শীল, এ মেয়ে তো মেয়ে নয়। মারাত্মক কিছু হবে। বদমাইস মেয়ে না হলে এত ভালো কথা বলে।'

'তা না হয় হল। কিন্তু এই বেঁটে বেঁটে লোকগুলোর শত্রু আছে সেটাই তো আশ্চর্যের কথা। শত্রু যে কে তা জানতে আমার ইচ্ছে করছে। আমরা যদি পারি, তো এই নিরীহ বেচারিদের একটু সাহায্য করলে ক্ষতি কি?' জয়শীল বলল।

সাধক বিরক্ত হয়ে বলল, 'জয়শীল, যে উদ্দেশ্যে আমরা বেরিয়েছি সেটা তো ভুলে গেলে আমাদের চলবে না। এসব ছোটোখাটো ব্যাপারে আমরা জড়িয়ে পড়লে কনকাক্ষ রাজার ছেলে-মেয়েদের আর উদ্ধার করতে পারব।'

'সাধক, কনকাক্ষ রাজার ছেলে-মেয়েদের যেমন প্রাণ আছে, এই বেঁটেখাটো লোকগুলোরও তেমনি প্রাণ আছে। ওদের যদি বিপদ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে পারি, এদের পারব না কেন?' জয়শীল বলল।

তার কথা শেষ হতে-না-হতেই পাহাড়ের উপর থেকে বিকট চিৎকার শোনা গেল। সবাই সেই দিকে তাকাল। ওরা দেখতে পেল এক বিরাটদেহী প্রকাণ্ড পাথর তুলে, পাহাড়ের উপর থেকে নীচে ফেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তার কোমরের লোহার চেন ধরে অদূরে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার এক হাতে চেন অন্য হাতে তরবারি।
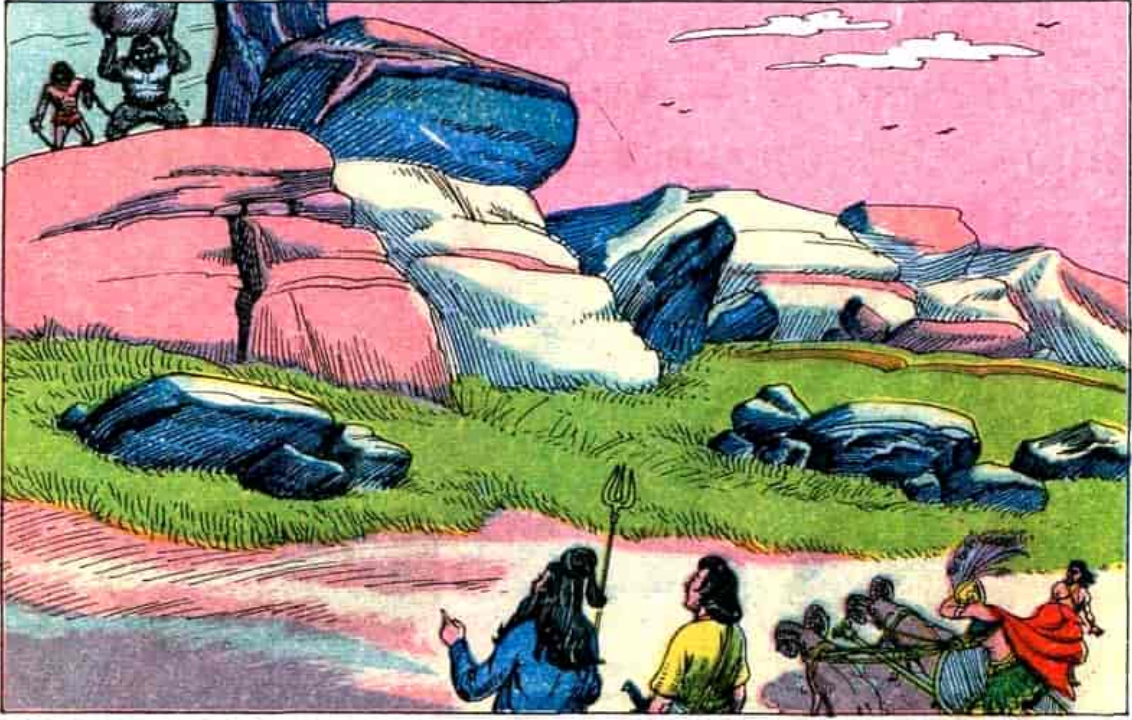
ওই দৃশ্য দেখে রানি এবং তার আশেপাশে যারা ছিল তারা ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। পাহাড়ের উপরের লোকটা তরবারি নাড়ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওই বিরাট আকৃতি নড়ছিল, চিৎকার করছিল।

এমন সময় জয়শীল সিদ্ধ সাধককে বলল, 'সাধক ওই বিরাট আকারের জন্তুটাকে যে লোকটা ভয় দেখাচ্ছে সে কিন্তু বেঁটে নয়। আমাদেরই মতো শরীরের লোক।' বলে জয়শীল রানিকে জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কি জন্তু ? ওই তরবারি হাতে কি মানুষ?'

রথ থেকে নেমে এসে রানি বলল, 'পাহাড়ের ওপাশের লোকগুলোও আমাদেরই মতো বেঁটেখাটো। তবে ওরা মনে করে যে ওদের সৃষ্টি হয়েছে যক্ষজাতি থেকে। ওরা নাকি আমাদের চেয়ে উন্নত জাতির লোক। ওদের ক্ষতি করিনি কিন্তু ওরা আমাদের ধ্বংস করতে চায়।'

'অত বড়ো জন্তুটাকে যারা হাত করতে পারে, তারা ইচ্ছে করলে অনেক আগেই তোমাদের ধ্বংস করে ফেলতে পারত।' বলল সিদ্ধ সাধক।

'আপনারা হয়তো জানেন না। ওই বিরাট আকারের জন্তুটা হল নরদানব। সে পাহাড়ের উপর থেকে আমাদের উপর পাথর ছোড়ে। তরবারি হাতে লোকটা আপনাদেরেই মতো লোক। দশ-বারো দিন আগে এসে শক্রদের দলে যোগ দিয়েছে।' বলল ওই বেঁটে রানি।

এমন সময় বিরাট পাথর উপর থেকে পড়তে লাগল।

চোদ্দো

পাহাড়ের উপর থেকে যে ভয়ংকর জন্তু পাথরটাকে ওদের উপর ছুঁড়ে ফেলল তার দিকে জয়শীল ও সিদ্ধ সাধক তাকিয়ে রইল। ওই জন্তুর পাশে ছিল একটি মানুষ। জয়শীলের মনে হল পাশের লোকটাকে যেন কোথায় দেখেছে। এমন সময় ওই পাথরটা, ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে কুড়ি-পঁচিশ ফুট দূরে পড়ল।

ওই লোকটা পাথরটা পড়তে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে পেল। সবাই আর। একটু সরে দাঁড়াল। লোকটা জয়শীল ও সিদ্ধ সাধককে বলল, 'দেখুন ওই ভয়ংকর নরদানবের সঙ্গে যে লোকটা আছে সে গত দশ-বারো দিন ধরে আমাদের ভীষণ জ্বালাচ্ছে। আমাদের চার-জন জাতভাই শিকারে গিয়েছিল। সে ওদের মেরে ফেলল। মনে হচ্ছে যেকোনো সময়ে যেকোনোদিন লোকটা ওই নরদানব নিয়ে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের উপর।'

জয়শীল ও সিদ্ধ সাধক ওর কথা মন দিয়ে শুনল। শুনে ওদের উপর তাদের করুণা জাগল। এতগুলো লোক কেন যে ওই একটি মাত্র নরদানবকে ভয় পাচ্ছে তার কারণ অনুধাবন করল তারা। তারা যত না ওই নরদানবকে ভয় করে তার চেয়ে দানবের সঙ্গে যে লোকটা আছে তাকে ভয় করে।

'আচ্ছা জয়শীল, নরদানবের পাশে তরবারি হাতে যে লোকটা আছে সে আমাদের দেশের কেউ নয় তো? ভালো ভাবে লক্ষ করে দেখ তো।' সিদ্ধ সাধক কিছু অনুমান করার মতো বলল।

লোকটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে জয়শীলের মনে হয়েছিল কোথায় যেন তাকে দেখেছে। কিন্তু নীচে থেকে তাকিয়ে উপরের লোকটাকে ভালোভাবে দেখা যায় না। বিশেষ কারণ না থাকলে, কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য না থাকলে কেউ এতগুলো বন, পাহাড়, নদী পেরিয়ে এতদূর আসতে পারে না।'

জয়শীল ভাবছিল এসব কথা। হঠাৎ তার নজরে পড়ল পাহাড়ের উপরের ওই লোকটা নরদানবকে তরবারি দিয়ে খোঁচা মেরে কী যেন করতে বলছে। খোঁচা খেয়ে দু-একবার লাফ দিয়ে নরদানব একটা পাথর তুলতে গেল কিন্তু পাথরটি বিরাট হওয়ায় সে কিছুতেই তুলতে পারছিল না।

'সাধক, লোকটাকে আবার একটা বড়ো পাথর আমাদের উপর ছুঁড়ে ফেলতে নরদানবকে বলছে। দানবটা তুলতে পারছে না। আমার মনে হচ্ছে লোকটার বুদ্ধি একটু কম। লোকটা জানে না যে অত বড়ো পাথর পড়তে দেখে, দিনের আলোতে, যেকোনো লোক সরে যাবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাথরটাকে পড়তে দেখে কেউ এমন জায়গায় দাঁড়াবে না যে পাথরটা মাথায় পড়ে।' বলে জয়শীল ওই রানিকে বলল, 'তোমার প্রজারা শিকার করতে তির-ধনুক, বল্লম, ইত্যাদি যা ব্যবহার করে তা এখানে আনতে বল।'

ওরা সাধারণত শিকার করার সময় বল্লম ব্যবহার করে। ওটা ওদের জাতীয় অস্ত্র। ওদের সেনানায়ক বহুকাল আগে একবার একটা বড়ো বল্লম ও অনেকগুলো তির-ধনুক পেয়েছিল। সেগুলোকে সে যত্ন করে রেখে দিয়েছিল। সে যে রেখে দিয়েছে তা রানি জানত না। তাই হঠাৎ শিকারের অস্ত্রের কথা শুনে ওই লোকটা অন্যমনস্ক হওয়ার মতো ভঙ্গি করে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

তার ওই ভঙ্গি লক্ষ করে সিদ্ধ সাধক তাকে বলল, 'কী হয়েছে? তুমি এত বড়ো যোদ্ধা, শিকার আর অস্ত্রের কথা শুনে তুমি যদি এত ভয় পাও, তোমার প্রজারা কী করবে? সেনাপতি হয়েছ যখন যেকোনো বিপদের মোকাবিলা করতে তোমাকেই তো এগিয়ে আসতে হবে। তুমি যদি ভয় পাও, মুখ ঘুরিয়ে থাক, তাহলে যুদ্ধ করবে কে? সেনাপতি ভয় পেলে সৈন্যরা তো আরও ভয়ে গুটিয়ে যাবে।'

এই প্রশ্ন শুনে লোকটা ফ্যালফ্যাল করে একবার রানির দিকে আর একবার সাধকের দিকে তাকিয়ে শেষে বলল, 'মহারানি, বহু তির-ধনুক আছে বটে কিন্তু সেগুলো ব্যবহার করা আমাদের নিষেধ। এমনকী ছোঁয়াও আমাদের নিষেধ। তবু আমি নিয়মভঙ্গ করে বনে যতগুলো তির-ধনুক পেয়েছিলাম সবগুলো আমার বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছি।'

ওদের রানি তার কথা শুনে কী যেন বলতে গেল। এমন সময় জয়শীল হাত উপরের দিকে তুলে রানিকে শান্ত হওয়ার ইঙ্গিত করে বলল, 'রানি, তোমার এই লোকটা যে কাজ করেছে তা তোমাদের দৃষ্টিতে যে কত বড়ো অপরাধ তা আমি জানি না। তবে এই মুহূর্তে যদি ওই তির-ধনুক আনানো যায়, আমি ওই নরদানবের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারি। অবিলম্বে ওই তির-ধনুক আমার দরকার।'

রানি অন্য কোনো কথা না বলে সেনানায়কের দিকে তাকাল। ওদের সেনানায়ক তৎক্ষণাৎ তির-ধনুক আনতে চলে গেল বাড়িতে।

ইতিমধ্যে নরদানব আর একটা বড়ো পাথর তুলল। তার কোমরে বাঁধা ছিল লোহার শেকল। একপ্রান্ত বাঁধা ছিল অন্যপ্রান্ত পাহাড়ের উপরের লোকটা ধরে ছিল। লোকটা তরবারি দিয়ে তার গায়ে খোঁচা মারছিল। এতে ভীষম রেগে গিয়ে নরদানবটি লোকটার উপরেই পাথরটা ফেলে দিতে গেল। তৎক্ষণাৎ লোকটা দানবের গলায় তরবারি ধরে গর্জে উঠল।

নরদানবকে শেকলে বেঁধে রেখেও লোকটা এত জোরে চিৎকার করল যে তার চিকার পাহাড়ের গায়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। জয়শীল এবং অন্যান্যদের কানেও সেই চিৎকার গেল। জয়শীল হেসে বলল, 'সিদ্ধ সাধক, পাহাড়ের উপরের ওই লোকটা যে কে এখন আমি চিনতে পেরেছি। সে তোমার হিরণ্যপুরের লোক নয়। আমাদের অমরাবতী

নগরের লোক। আমি যে নিজের জন্মভূমি ছেড়ে তোমাদের দেশে গেছি। আর এই বনে-বাদাড়ে ঘরে। বেড়াচ্ছি— এসব কিছুর জন্য দায়ী হল ওই লোকটা সে এক সময় আমাদের রাজা রুদ্রসেনের অশ্বারোহী বাহিনীর সেনানায়ক ছিল। ওর নাম কৃপাণজিৎ।'

এই কথা শুনে সিদ্ধ সাধক অবাক হয়ে বলল, 'জয়শীল, এ তো অদ্ভুত ব্যাপার! কোথায় তোমার অমরাবতী, আর এখন আমরা কোথায় আছি। তাহলে এখন তুমি কী করবে ভাবছ?'

জয়শীল কিছুক্ষণ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভেবে বলল, 'সিদ্ধ সাধক, ওই নরদানবকে যেভাবে মারছে কৃপাণজিৎ তাতে আমি তাকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়ে পারি না। তবে আর একটা দিকও লক্ষ করার মতো, এত অত্যাচার নরদানব শেষ পর্যন্ত সহ্য নাও করতে পারে। রেগে গিয়ে সে কোমরের শেকল ছিড়তে পারে। এমনকী ওই পাথর নিয়েই কৃপাণজিতের উপর ঝাঁপিয়েও পড়তে পারে।'

জয়শীলের কথা শেষ হতে-না-হতেই তির-ধনুক এসে গেল। সমস্ত তির-ধনুক জয়শীলের পায়ের কাছে রেখে দিল ওরা। জয়শীল পরীক্ষা করে দেখল সেগুলো। বেছে বেছে ছ-টা তির সে হাতে তুলে নিল।

সিদ্ধ সাধক ওই তিরগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'জয়শীল, তোমার শত্রু কৃপাণজিৎ এবং নরদানবকে এই তির ছুঁড়ে মেরে ফেলতে চাইছ।'

এই প্রশ্ন শুনে জয়শীল হেসে বলল, 'সাধক, নীচে থেকে পাহাড়ের উপরের ওই দু-জনকে তির দিয়ে মেরে ফেলা কি অত সহজ? দেখতে তো পাচ্ছ, তিরগুলো মামুলি ধরনের। এ তো আর ব্রহ্মাস্ত্র আর নাগাস্ত্র নয় যে যেখান থেকেই মারি-না-কেন লক্ষ্যভেদ হবে।'

এমন সময় পাহাড়ের উপর থেকে বিচিত্র ধ্বনি শোনা গেল। পাথরটা নিয়ে নরদানব কৃপাণজিতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। সে ওকে মারতে চাইছে। আর কৃপাণজিৎ তরবারি দিয়ে নরদানবকে মেরে ফেলতে চাইছে। এমন সময় চার-পাঁচটা বেঁটেখাটো লোক দূর থেকে দড়ি ছুঁড়ে ওই নরদানবকে বেঁধে ফেলল। পাথরটা ফেলে দিয়ে নরদানব বাঁধা অবস্থায় লাফালাফি করতে লাগল।
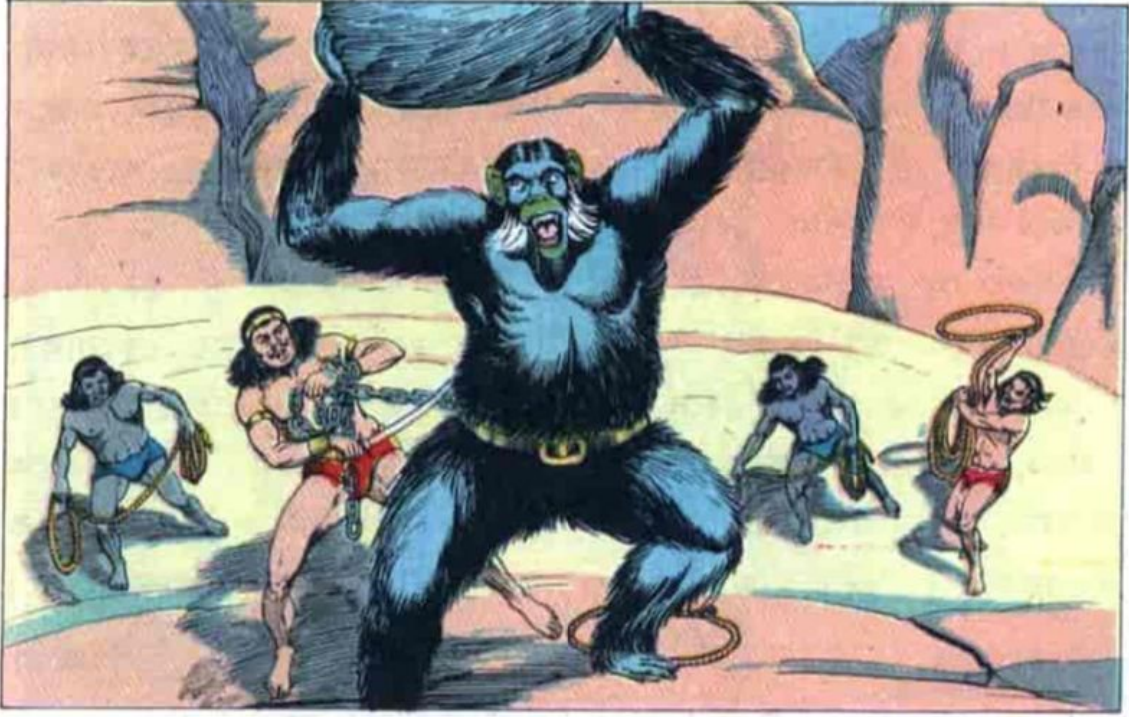
নরদানবকে বাঁধা অবস্থায় দেখে রানির লোক জয়শীলকে মহাউৎসাহে বলল, 'এই হচ্ছে সুযোগ ! এক্ষুনি মারতে পারলে নরদানবটা মরে যাবে। আর দেরি নয়, এক্ষুনি তির ছুঁড়ুন।'

ওদের রানিও মাথা নেড়ে বলল, 'আমরা নরদানবের কাছে যে লোকটা আছে তাকে অত ভয় পাই না। আমাদের ভয় শুধু ওই নরদানবকে। ওই নরদানবকে মেরে ফেলতে পারলে ওই লোকটাকে আমরা দ-দিনেই জব্দ করতে পারব। তাকে এমন শিক্ষা দেব যে তার অনুচররা ভয়ে পালাবে।'

জয়শীল চিৎকার করে বলল, 'ওহে, নীচ কৃপাণজিৎ, তাকিয়ে দেখ, আমি জয়শীল। এখানে দাঁড়িয়ে আছি।' জয়শীলের চিৎকার পাহাড়ের উপরের লোকের কানে গেছে বলে মনে হল না । কৃপাণজিৎ নরদানবের কোমরে বাঁধা শেকলটাকে একদিকে টেনে রেখেছিল অন্যদিকে ওর সঙ্গীরা নরদানবকে ভালোভাবে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করছিল।

জয়শীল কিছুক্ষণ ভেবে রানিকে বলল, 'রানি, আমার একটি তির শত্রুপক্ষের উপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা সবাই আক্রমণ করতে এগিয়ে আসবে। ওদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি না থাকলে কিন্তু বিপদে পড়তে হবে।' এই কথার জবাবে রানি তার সেনাবাহিনীর দিকে তাকাল। ওরা ততক্ষণে হাতে বল্লম নিয়ে বুঝিয়ে দিল যে ওরা প্রস্তুত। ওদের সেনাপতি জয়শীলকে বলল, 'আপনি তির ছুঁড়তে পারেন। আমাদের শত্রুদের গায়ে দু-একবার বল্লমের আঘাত লেগেছে। কিন্তু তির বিধলে যে কি হয় তা তারা জানে না। একবার আপনার তির গিয়ে ওদের একজনের গায়েও যদি বেঁধে, দেখবেন ওরা চঞ্চল হয়ে

উঠবে। ওরা হয়তো জীবনে তির দেখেনি। শরীরে একবার ঠিকমতো তির বিঁধে গেলে, যার গায়ে বেঁধে তার আর কিছু করার থাকে না। ওরা ঘাবড়ে গিয়ে চারদিকে ছোটাছুটি করবে। কেউ কেউ পালাবে। আমাদের সেনাবাহিনী লুকিয়ে থাকবে। যে যাকে যেখানে পাবে সে তাকে সেখানেই শেষ করে ফেলবে। প্রয়োজন হলে আগুন লাগিয়ে দেবে।'

'সেনাপতি, তোমার কথা শুনে যুদ্ধ করার উৎসাহ পাচ্ছি। তোমার কথায়। এবং কাজের মধ্যে মিল থাকে তো? থাকলেই ভালো। তবে তুমি হয়তো সকলের কথা ভাবতে গিয়ে নরদানবের কথা ভুলে গেছ। নরদানব যেদিক দিয়ে যাবে সেদিক থেকে কি তোমার সেনাবাহিনী তার পথ আগলাতে পারবে? পারবে তাকে বন্দি করতে? যাই হোক, পারুক আর নাই পারুক, তোমাদের শক্তি যাচাই করার ইচ্ছে জাগছে।' জয়শীল বলল।

সিদ্ধ সাধক সঙ্গে সঙ্গে শূল তুলে বলল, 'জয়শীল আর দেরি নয়। এই হল উপযুক্ত সময়। নরদানব দড়ি ছিঁড়ে ওদের একজনকে ধরে ফেলেছে। এরা সবাই ঘাবড়ে গেছে। শত্রু যখন ঘাবড়ে যায় তখনই তাকে আক্রমণ করা উচিত।'

পরক্ষণেই জয়শীল নরদানবের দিকে তির ছুড়ল। তির বিদ্ধ হল তার কোমরে। সে আর্তনাদ করতে করতে যে লোকটাকে পেল তাকে ফেলে দিল।

এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে রানির সেনাবাহিনী পাহাড়ের উপরের দিকে উঠতে লাগল।

পনেরো

বেঁটেদের রানির সেনাবাহিনীকে পাহাড়ের উপর আসতে দেখে শত্রুপক্ষের খাড়াপাহাড় নামধারী তার লুকিয়ে থাকা সেনাবাহিনীকে ডাক দিল। অস্ত্র হাতে তার সেনাবাহিনী এগিয়ে এল। ওরা চিৎকার করতে করতে দল বেঁধে ছুটে এসেছিল। ইতিমধ্যে কৃপাণজিৎ এবং তার সঙ্গীসাথীদের নরদানবকে দমন করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল।

জয়শীল লক্ষ করল খাড়াপাহাড়ের অনুচরগুলো সেনাবাহিনী নিয়ে রানির বাহিনীর দিকে এগিয়ে আসছে। সে সাধককে বলল, 'সাধক, এক্ষুনি আমরা যদি রানির সেনাবাহিনীকে সাহায্য না করি রানির বাহিনী শেষ হয়ে যাবে। লক্ষ করেছ, কৃপাণজিৎ কি করছে? তার পোশাক দেখে মনে হচ্ছে সে মস্তবড়ো শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছে। ভাবছি, আমি যখন তাকে লক্ষ করছি সে-ও হয়তো আমাকে দেখছে।'

সিদ্ধসাধকেরও মনে হল, রানির বাহিনীকে সাহায্য করা উচিত। সে রানির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'রানি, তোমার এখানেই থাকা ভালো। আমরা তোমাদের সৈনিকদের সঙ্গে গিয়ে তোমার চিরশত্রু খাড়াপাহাড়ের মোকাবিলা করব। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শত্রু কৃপাণজিৎকেও এক চোট দেখে নেব।'

সাধকের কথা শেষ হতে-না-হতেই নরদানবের ভয়ংকর গর্জন শোনা গেল। তার ডাক শুনে জয়শীল ও সাধক পাহাড়ের উপরের দিকে তাকাল। দেখতে পেল আগের মতোই নরদানবের কোমরে শেকল বাঁধা আছে। শেকলের অন্যপ্রান্ত ধরে আছে কৃপাণজিৎ। নরদানব নীচের লোকের দিকে তাকিয়ে বার বার কাঁধটাকে উঁচু করছিল।

'সাধক, মনে হচ্ছে নরদানব আবার কৃপাণজিতের কবলে এসে গেছে। এইবার ওই জন্তুটাকে যদি বড়ো পাথর তুলে রানির সেনাবাহিনীর উপর ফেলে তাহলে তার একটি সেনাও বাঁচবে না।' বলেই জয়শীল ছুটে গেল। সিদ্ধ সাধক তৎক্ষণাৎ তাকে অনুসরণ করল।

দু-জনে ছুটেই বেঁটেদের সেনবাহিনীর কাছে পৌছে ওই বাহিনীর সেনাপতিকে বলল, 'সেনাপতি, তোমার বাহিনীকে একটু থামতে বল। নরদানবটি তোমাদের বাহিনীর উপর বিরাট পাথর হঠাৎ ছুঁড়ে মারতে পারে।' 'আজ্ঞে, ওই ভয়ংকর জন্তুটা আমাদের যাতে কিছু না করে সেদিকে আপনারা লক্ষ রাখুন। আমরা চেষ্টা করব আমাদের শত্রুর নেতা খাড়াপাহাড়কে মেরে ফেলতে। আমরা ওদের দলের এক-এক জনকে ধরব আর পাহাড়ের উপর থেকে নীচে ছুঁড়ে ফেলব।' বেঁটেদের সেনাপতি বলল।

'তোমার মুখের কথা আর তোমার হাতের বল্লমের মুখ দুটোই বেশ ধারালো মনে হচ্ছে। তুমি যা ভাবছ তা করার ক্ষমতা তোমার দেহে আছে? তুমি তো দেবতা নও, দানবও নও। ক্ষুদ্র মানুষ।' সাধক গম্ভীর স্বরে বলল। জয়শীলের ইশারায় সাধক হঠাৎ চুপ করে গেল। এমন সময় নরদানবকে একটি বিরাট পাথর তুলে ধরতে সাধক দেখল। সে বলল, 'না, এই নরদানবের পাথর ছোড়া ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। আর সহ্য হয় না। ওকে এক্ষুনি উপযুক্ত শিক্ষা না দিলে ওর বাড় বেড়েই যাবে। আমি যাচ্ছি আমার এই ত্রিশূল দিয়ে তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে।'

ত্রিশূল এগিয়ে সাধককে ছুটে যেতে দেখে জয়শীল ভাবল, আবার না সাধক কোনো বিপদে পড়ে। সাধককে থামিয়ে জয়শীল নরদানবকে লক্ষ করে একটি তির ছুড়ল। তিরটা গিয়ে লাগল শেকলের উপর। কৃপাণজিতের হাত থেকে শেকলটা খসে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ নরদানব পাথরটাকে নীচে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাবে এমন সময় হঠাৎ পড়ে যাওয়া শেকল হাতে তুলে নিয়ে তাকে পেছন দিক দিয়ে টান দিল। সেইসময় কৃপাণজিৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করল তির নিক্ষেপকারী জয়শীলকে।

কৃপাণজিৎ জয়শীলকে দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগল। তার পূর্বমূহুর্ত পর্যন্ত দুর থেকে ওদের দুজনকে দেখে কৃপাণজিৎ ভাবতেই পারেনি যে ওই দু-জনের মধ্যে একজন ছিল জয়শীল।

‘খাড়াপাহাড়, শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার বা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার এটা উপযুক্ত সময় নয়। ওদের মধ্যে এমন একজন আছে যার তির গায়ে বিঁধলে আর বাঁচতে হবে না। নেহাৎ এটা নরদানব তাই তির বেঁধার পরেও বেঁচে আছে। আমরা হলে সঙ্গেসঙ্গে মরে যেতাম।' বলল কৃপাণজিৎ। বলতে বলতেই সে নরদানবকে নিয়ে সাবধানে পিছু হাঁটতে লাগল।

খাড়াপাহাড় জয়শীল ও সিদ্ধ সাধকের দিকে তাকিয়ে কৃপাণজিতকে বলল, 'মহারাজ, আপনার নির্দেশ অমান্য করব না, তবু একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে আপনি কি নরদানবকে নিয়ে সোজা গিয়ে ওই তির-ধনুকধারীকে মেরে ফেলতে পারেন না?’ এক ফাঁকে আমরা রানির সেনাবাহিনীকে খতম করে ফেলতে পারব। তার এই কথা শুনে কৃপাণজিৎ রক্তচক্ষু করে নরদানবকে নীচের দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'খাড়াপাহাড়, তোমার মাথার পালকগুলোর মতোই তোমার বুদ্ধি! তুমি আমাকে কি পালক লাগানো পাখি পেয়েছ যে উড়ে যাব আর তাকে মেরে ফেলব? ওদের মারার অন্য উপায় আছে। এখন আর দেরি না করে সকলের উচিত নিজেদের শিবিরে ফিরে যাওয়া, বুঝতে পেরেছ?’

সঙ্গেসঙ্গে খাড়াপাহাড় তার অনুচরদের হুকুম দিল, নিজেদের শিবিরে ছুটে যেতে। খাড়াপাহাড়ের নির্দেশ পেয়ে তার বাহিনীর সবাই পালিয়ে গেল। ওদের পালাতে দেখে জয়শীল বেঁটেদের সেনাপতিকে বলল, 'সেনাপতি, এই হল সুবর্ণ সুযোগ। ওই সুযোগে যারা ছুটে ছুটে নাবছে তাদের উপর এখান থেকে পাথর ছুঁড়ে মার। ওরা যত নীচে নাববে এখান থেকে ছোড়া পাথরগুলো ওদের উপর তত জোরে পড়বে। যার উপরে পড়বে সে ঠিক মরবে।'

শত্রুকে পালাতে দেখে বেঁটেদের সেনাপতির উৎসাহ উদ্দীপনা বেড়ে গেল। তার সাহসও বাড়ল অনকগুণ। সে তার বাহিনীর উদ্দেশে জোরে জোরে। বলল, 'ওহে শোনো, অত বড়ো যে নরদানব, সে-ও পালিয়ে যাচ্ছে, দেখেছ, ওদের সেনাবাহিনী কীভাবে পালাচ্ছে? এখন তোমরা যত পার ওদের উপর বড়ো বড়ো পাথর ছুঁড়ে মার।'

জয়শীল ও সিদ্ধ সাধক খাড়াপাহাড় ও কৃপাণজিতের গতিবিধি লক্ষ করল।

সিদ্ধ সাধক ত্রিশূল উপরে তুলে ‘জয় মহাকাল’ বলে জয়শীলকে বলল, 'জয়শীল, আর এখানে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। চল, ওই খাড়া পাহাড়কে মেরে ফেলি। কৃপাণজিতকে ছাড়ার কোনো মানে হয় না। ওর কবলে যে নরদানব আছে তাকে। এরা সবাই ভয় করে। অতএব, তাকে মেরে ফেললে এদের ভয় কেটে যাবে। ওই একটি নরদানবের জন্যই এরা সবাই ভয়ে গুটিয়ে এতটুকু হয়ে আছে।'

সিদ্ধ সাধকের কথা শুনে জয়শীল হেসে বলল, 'সাধক, শত্রুকে অত ছোটো করে দেখার কোনো কারণ নেই। পথে ওদের উপর আক্রমণ করা আর ওদের শিবিরে গিয়ে আক্রমণ করার মধ্যে পার্থক্য আছে। তার চেয়ে বড়ো কথা, ওদের উপর এইধরনের আক্রমণ করা বা ওদের মেরে ফেলার প্রয়োজন আমাদের আছে কি না? আমি ভাবছি ওদের দু-দলের মধ্যে কীভাবে মিটমাট করা যায়।'

'সে কি! আমি এখন এই ধরনের কিছু তো ভাবছি না। ওদের কথা না-হয় বাদ দিলাম কিন্তু কৃপাণজিতকে কি ছাড়া হবে? ওই নরদানবকে চোখের সামনে দেখেও তাকে ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হবে? বিশেষ করে নরদানব যখন নিজের ইচ্ছামতো কিছু করছে না, করছে ওই শয়তানের নির্দেশে ? চারদিকের অবস্থা যা দেখছি কৃপাণজিতকে ছেড়ে দিলে ও হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই এখানকার সম্রাট হয়ে বসবে।' সাধক বলল।

জয়শীলের জবাব দেওয়ার আগেই বেঁটেদের সেনাপতি এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনাদের নিদের্শ এবং সহযোগিতা থাকলে এক্ষুনি আমরা ওদের শিবির আক্রমণ করতে পারি। ভালোভাবে একবার আক্রমণ করলে আমাদের ভবিষ্যতের আর কোনো দুর্ভাবনা থাকবে না। এখন আপনাদের নির্দেশ চাই।'

জয়শীল চারিদিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'সেনানায়ক, তোমার সাহস এবং উদ্যম নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। যত জনকে পেরেছ মেরেছ। বাকিরা এতক্ষণে হয়তো নিজেদের শিবিরে পৌঁছে গেছে। এখন আমরা গিয়ে আক্রমণ করলে। কিছুটা রক্তপাত হতে পারে। কিন্তু জয় যে নিশ্চিত এমন কথা বলা যায় না।'

'তাহলে এখন কী করতে বলেন ?' সেনাপতি জিজ্ঞেস করল।

'এখন সবাই পাহাড় থেকে নীচে নেমে রানির কাছে যাও। তোমরা যে-যার শিবির সামলাও। এখানে আমরা শত্রুকে যেভাবে আক্রমণ করার কথা ভাবছি শত্রুও তো আমাদের উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করতে পারে? তোমরা শুধু আক্রমণের কথাই ভাবছ, আক্রান্ত হওয়ার জন্যও প্রস্তুত হও। এগোও আমরা যাচ্ছি।' জয়শীল বলল।

জয়শীল সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। সাধক কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার জয়শীল, তুমি নড়তে চাইছ না, আমাদের সময় কাটানো কি ঠিক হচ্ছে?'

'আমরা তো ইচ্ছে করে এখানে আসিনি সাধক। ওই কুমির রূপধারী মকরকেতুর জন্যই আমাদের এই ঝামেলায় পড়তে হয়েছে। হিরণ্যপুরের রাজা কনকাক্ষ নিশ্চয় আমাদের অপেক্ষায় প্রতিমুহূর্ত কাটাচ্ছেন। তবে এখান থেকে ফেরার আগে কৃপাণজিতকে মেরে ফেলতে চাই।' বলল জয়শীল।

জয়শীল ও সিদ্ধ সাধক যেখানে কথা বলছিল সেখান থেকে সামান্য দূরে, গাছের আড়ালে খাড়াপাহাড় ও কৃপাণজিৎ আলোচনা করছিল। ওরা একে অন্যের উপর দোষারোপ করে নিজেদের মধ্যে রাগারাগি করছিল। 'আপনার শরীরটা বিরাট, কিন্তু এত বড়ো শরীরের ভেতরে যে মনটা আছে সেটা তত সাহসী নয়। আমাদের চেয়ে আপনি পালানোর জন্য বেশি আগ্রহী ছিলেন। আপনি বলেছিলেন, এই নরদানবটি আপনার কথামতো চলে। কিন্তু এটি আপনাকেই মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল।' খাড়াপাহাড় বলল।

তার কথা শুনে কৃপাণজিৎ দাঁত কটমট করতে করতে বলল, 'ওহে অন্ধ পাহাড়, আমি শত্রুর কাছ থেকে পালাতে চাইনি। শত্রুকে আক্রমণ করার সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হয়। নরদানব আমার কথা শোনে। প্রমাণ এক্ষুনি দিতে পারি।' বলতে বলতে সে ইশারা করল।

নরদানব তৎক্ষণাৎ এগিয়ে গিয়ে খাড়াপাহাড়কে দু-হাতে তুলে ভয়ংকরভাবে গর্জন করতে লাগল। দূর থেকে খাড়াপাহাড়ের দলের লোক এই দৃশ্য দেখে ভাবল, তাদের নেতাকে নরদানব মেরে ফেলছে। ওরা তৎক্ষণাৎ হাতের কাছে যা পেল তাই নিয়ে নরদানব ও কৃপাণজিতের কাছে ছুটে এল।
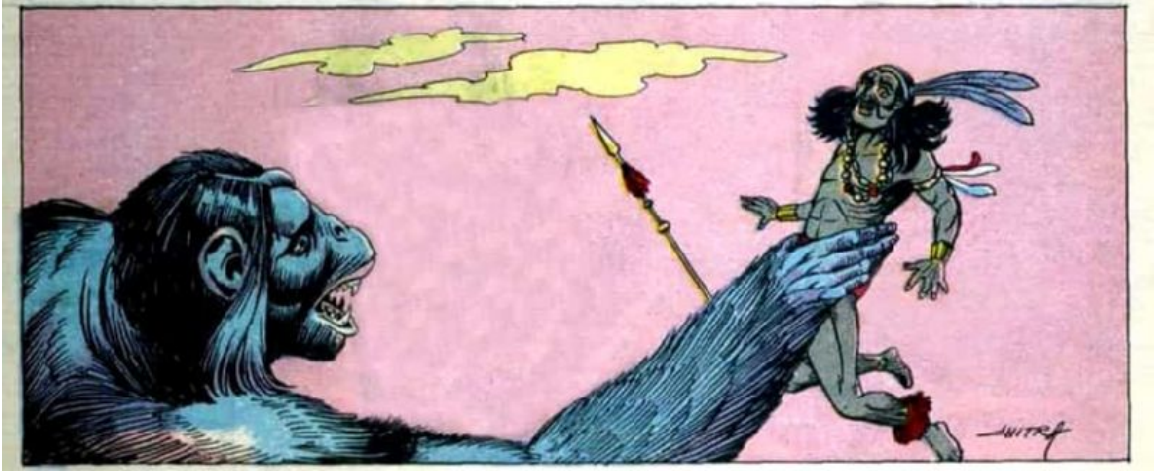
ষোল

খাড়াপাহাড়ের উপর নরদানবকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে তার দলের লোকজন অস্ত্র হাতে কৃপাণজিতের দিকে ছুটে এল। ওরা যতই অক্ষম হোক ওদের বিরুদ্ধে একা লড়ার সাহস কৃপাণজিতের ছিল না। অপরপক্ষে নিজেদের নেতাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে ওরা জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিল।

ওরা এসে কৃপাণজিতকে ঘিরে ফেলল। সে তখন হাসিমুখে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। নরদানব আমার কথামতো চলে কি না তা তোমাদের নেতাকে দেখাচ্ছিলাম।' বলতে বলতে সে তাকে ছাড়িয়ে নিজের কাছে ধরে রাখল।

খাড়াপাহাড় প্রাণের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আস্তে আস্তে একটা ঢিপির উপর বসল। সঙ্গে সঙ্গে তার অনুচররাও তাকে ঘিরে বসল। ওরা তার নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। খাড়াপাহাড় ভাবতে লাগল, 'অজানা লোকের সাহায্য নিতে গিয়ে আমি তো আচ্ছা বিপদে পড়েছি। কিছুক্ষণ পরে নিজের অনুচরদের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে খাড়াপাহাড় বলল, 'ওহে, আমি যা বলছি, কান খাড়া করে শোনো। ওই বিশাল দেহী লোকটা তার ওই পোষা জন্তুটাকে পাশে নিয়ে কটমট করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর কাছে যতক্ষণ ওই ভয়ংকর জন্তুটা আছে ততক্ষণ সামনাসামনি ওকে জব্দ করা যাবে না। যেকোনোভাবে ওর কাছ থেকে ওই জন্তুটাকে সরাতে হবে। তারপর আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করে ওকে খতম করতে পারব।'

'কথাটা তো ভালোই। কিন্তু ও তো সবসময় ওই নরদানবকে সঙ্গে নিয়েই ঘোরে। কীভাবে আলাদা করা যাবে?' একজন অনুচর জিজ্ঞেস করল।

'এই লোকটাকে মেরে ফেললে রানির লোক আমাদের উপর আক্রমণ চালাবে। ইদানীং ওর দলে আবার দুটো লোক সামিল হয়েছে। ওদের দেহ রাক্ষসের মতো বিশাল। ওরা সবসময় রানির কাছাকাছি থাকে।' আর এক অনুচর বলল।

খাড়াপাহাড় প্রশ্নকারীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রাগের স্বরে বলল, 'মরতেই যদি হয় স্বজাতির হাতে মরব। শুধু তাই নয়, আমরা যদি রানির কাছে মিলেমিশে থাকার প্রস্তাব দিই উনি কি আমাদের উপর আক্রমণ করবেন? কখনোই না।'

'আমাদের উচিত এক্ষুনি রানির কাছে গিয়ে এক হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া।' অন্য এক অনুচর বলল।

খাড়াপাহাড় হাতের কাছে যে লাঠিটা পেল সেই লাঠিটা তুলে নিয়ে ওই লোকটার পিঠে বসিয়ে দিয়ে তাকে সতর্ক করে দিল। এতক্ষণ কৃপাণজিৎ ওদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আর থাকতে না পেরে আস্তে আস্তে ওদের কাছে এসে দাঁত কটমট করতে করতে বলল, 'কী ভাবছ? হঠাৎ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাও? ? বল, সাহস থাকে তো সত্য কথা বল।

খাড়াপাহাড়, নিজের দলের অনুচরদের চুপ করে থাকার ইশারা করে দাঁড়িয়ে কৃপাণজিৎকে বলল, আপনি যা ভাবছেন তা ঠিক নয়। রানির দল এখন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তাই ভাবছি, ওদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ না করে রাতারাতি অন্য কোথাও পালিয়ে যাব কি না। কেউ পালাতে চায়, কেউ চায় না। যারা চায় না তারা নিজেদের মত জানাচ্ছে। অন্যেরাও যাওয়ার পক্ষে কথা বলছে।'

ওর কথা শুনে কৃপাণজিতের ভয় করল। বনে ঘোরার জ্বালা যে কী ধরনের তা সে জানে। তা ছাড়া এখন ওরা যদি তাকে ছেড়ে যায় জয়শীল তাকে আস্ত রাখবে না। এসব কথা ভেবে কৃপাণজিৎ ভদ্রভাবে নম্রস্বরে বলল, খাড়াপাহাড়, আমি তোমার ভালো বই মন্দ করব না। আমি ঠিক করেছি। আজ রাত্রের মধ্যে তোমাদের চিরশত্রু ওই রানি আর তার দুটো অনুচরকে শেষ করে ফেলব। আজ ঠিক মাঝরাত্রে তোমাদের মধ্যে যারা খুব সাহসী তারা আমার সঙ্গে থাকবে। আমার এই ভয়ংকর জীবটি ওদের ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ করবে। শত্রু যখন অসহায় অবস্থায় থাকবে তখনই তাদের আক্রমণ করা উচিত। রানি আর ওই দুটো অনুচর সহ কয়েক জনকে মেরে ফেললে তুমিই হবে এই বিরাট অঞ্চলের রাজা।'

বলে কৃপাণজিৎ নরদানবকে মেরে চাঙা করে তুলল।

হঠাৎ মার খেয়ে জন্তুটি কৃপাণজিতকে পালটা মার দিতে গিয়ে তার হাতের তরবারিটা উঁচিয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল।

কৃপাণজিতের কথা শুনে আর ওই জন্তুর আচরণ দেখে খাড়াপাহাড় বলল, 'বেশ বোঝা যাচ্ছে আপনার এই জন্তুটি আপনার সবকথা শুনতে চায় না। আপনি ওকে আর একটু আদর দিলে ও হয়তো আপনার কথামতো চলত।'

'আদর! জন্তুকে আদর! আদর দিয়ে জন্তুর কাছ থেকে কাজ পাওয়া যায় না। ভয় দেখালেই সবাই কাজ করে। মারলে আরও বেশি করে কাজ পাওয়া যায়। আমি এখন আমার এই জন্তুকে নিয়ে বিশ্রাম করতে যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি আমার আর এই জন্তুর খাবার পাঠিয়ে দাও।' কৃপাণজিৎ গম্ভীর গলায় এই কথা বলে চলে গেল।

'খাবার সব রাখা আছে।' বলল একজন অনুচর।

কৃপাণজিৎ নিজের আস্তানায় খেতে বসে চিৎকার করে বলল, 'সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আমাকে কেউ ডেকে তুলবে না। আমি ঘুমোব। সারারাত আমাকে জাগতে হবে। ঠিক মাঝরাত্রে শত্রুর উপর আক্রমণ করা হবে।' খাড়াপাহাড় খুব খুশি হয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'শোনো, যে কথা বলছিলাম, আমরা যদি কৃপাণজিতকে আক্রমণ করি, তা যদি নরদানব আগে জেনে যায় সে নিজেই পালাবে। আমাদের আক্রমণ করবে না। এখন প্রশ্ন হল, কৃপাণজিতের তরবারিটা কীভাবে কেড়ে নেওয়া যায়। সেটাও সম্ভব। প্রথমেই তরবারি কেড়ে নিতে হবে।' বলে কয়েক জন সাহসী অনুচরকে নিয়ে সে চলে গেল।

দু-তিন ঘণ্টা পরে হঠাৎ কৃপাণজিতের ঘুম ভেঙে গেল। উঠে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে বলল, বাইরে কে রে? পচা তেলের গন্ধ বেরোচ্ছে কোত্থেকে? রেড়ির তেল নাকি! কে বাইরে?'

একজন অনুচর বাইরে থেকে বলল, 'আজ্ঞে এটা রেড়ির তেল নয়। অন্য জিনিসের তেল। তেলটা ছড়ানো হয়েছে এখানে। এই তেলের গন্ধ থাকলে মশা-মাছি, পোকামাকড় আসে না। ওসব থাকলে আপনার ঘুম হবে না। সেইজন্যই এই তেল দেওয়া হয়েছে। খাড়াপাহাড়ের নির্দেশে এই তেল ছড়ানো হয়েছে।'

তাই বল। ঠিক আছে ছড়াও, আরও ছড়াও।' বলে হাই তুলে কৃপাণজিৎ আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ওর ঘরের দরজার কড়ার সঙ্গে বাঁধা ছিল নরদানব। সে ওই তেলের গন্ধ সহ্য করতে না পেরে ছটফট করতে লাগল। কৃপাণজিৎ নাক ডেকে ঘুমোতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে খাড়াপাহাড় কয়েক জন অনুচর সহ সেখানে এল। তার ইশারায় একটা লোক ভেতরে ঢুকে, পা টিপে টিপে গিয়ে, তরবারিটা নিয়ে বেরিয়ে এল।

তরবারিটাকে হাতে নিয়ে খাড়াপাহাড় বলল, 'এই অস্ত্র আমরা তুলতে পারি কিন্তু ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারব না।' বলে ওই অনুচরের হাতে তরবারিটা দিয়ে দিল।

পরিকল্পনা মতো খাড়া পাহাড়ের লোকজন ঠিক সময়ে বল্লম নিয়ে হাজির হল।

সে সকলের দিকে এবার তাকিয়ে বলল, ‘এখন হয় আমরা বাঁচব, না হয় এই দুরাত্মাটা বাঁচবে। এবার আগুন ধরিয়ে দাও। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেই তাকে বল্লম দিয়ে আক্রমণ কর। নরদানব হয়তো শেকল ছিঁড়ে পালাতে পারবে না। সে যদি পুড়ে মরে মরুক।'

খাড়াপাহাড়ের নির্দেশ পেয়েই চার দিক থেকে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। ঘরটা ছিল পাতার। পাতায় পাতায় ছড়ানো ছিল তেল। আগুন ধরানোর সঙ্গেসঙ্গে দাউ দাউ করে গোটা ঘরটা জ্বলতে লাগল।

আগুনের আঁচ লাগার সঙ্গেসঙ্গে কৃপাণজিৎ উঠে চিৎকার করে বলল, 'এ ধোকাবাজির প্রতিশোধ নেব।'

বলে সে তরবারি খুঁজতে লাগল। তরবারি না পেয়ে সে ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। এমন সময় একটা জ্বলন্ত কাঠ তার ঘাড়ে পড়ল। এদিকে নরদানব ভয়ংকর আওয়াজ করতে করতে টান মেরে শেকল ছিঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শেকল ছেড়ার সঙ্গেসঙ্গে কৃপাণজিৎ নরদানবের শেকলটা ধরে ফেলল। ফলে এক লাফে জন্তুটা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ঘরের বাইরে সে যখন পড়ল তখন তার হাত থেকে শেকলটা ছুটে গেল।

নরদানব ও কৃপাণজিতকে একসঙ্গে ঘরের বাইরে আসতে দেখে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা খাড়াপাহাড়ের অনুচররা প্রথমে ভয় পেল। কিন্তু পরক্ষণেই ওদের সাহস বেড়ে গেল। ওরা লক্ষ করল, ছাড়া পেয়ে নরদানব পালাচ্ছে। খাড়াপাহাড় চিৎকার করে বলল, 'ওই

জন্তুটাকে কেউ বাধা দেবে না। সে যেখানে যাচ্ছে যাক। এই দুরাত্মাকে কিন্তু ছেড়ো না। বল্লম চালাও, আক্রমণ কর, মেরে ফেল।' বলে সে চিৎকার করতে লাগল।

অন্যদিকে অতগুলো লোককে বল্লম হাতে দেখে নরদানব ভীষণ ভয় পেয়ে যাকে হাতের কাছে পেল তাকেই ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। এই অবস্থায় খাড়াপাহাড়ের অনুচররাও যেভাবে আক্রমণ করবে ভেবেছিল সেভাবে পারল না। তাদের মনে ভয় ঢুকে গেল। আর ভয় অমন জিনিস যা একবার মনে ঢুকলে আর বেরোতে চায় না।

এই গোলমালের মধ্যে সবচেয়ে সুবিধা হল কৃপাণজিতের। সে আশেপাশে যেকোনো অস্ত্রের খোঁজ করতে লাগল। হঠাৎ তার হাতে পড়ে গেল গাছের একটি শুকনো ডাল। সে ঝট করে ওই ডাল হাতে নিয়ে জোরে চিৎকার করে। যাকে সামনে পেল তাকেই প্রচণ্ড জোরে আঘাত করতে লাগল। খাড়াপাহাড়ের লোকও, এই অবস্থায় মরণপণ করে বল্লম দিয়ে তাকে আক্রমণ করতে লাগল।

সেখানকার আগুনের শিখা দেখে কোলাহল শুনে নবাগত দুটো লোক কৌতুহলী হল ব্যাপারটা জানার জন্য। অত রাত্রে, গভীর বনে আগুন দেখে এবং চিৎকার শুনে ওই দুজন ঘটনাস্থলের দিকে এগোতে লাগল। ওরা বসেছিল দুটো অদ্ভুত জন্তুর উপর। জন্তুগুলো টাট্টু ঘোড়ার মতো। গায়ের চামড়ায় অসংখ্য মাছের আঁশ যেন লেগে রয়েছে। ওই লোক দুটোর গায়ে মাছের চামড়ার তৈরি পোশাক। ওদের দেখেই মনে হয় মকরকেতুর লোক। ওদের দুজনের হাতেই অস্ত্র ছিল।

মকরকেতু যেমন সুঠাম ও সুদৃঢ় ছিল এই দুজনের দেহেও সেই তেজ সেই ক্ষমতা বর্তমান বলে মনে হয়। মকরকেতুর বাহন ছিল বিচিত্র ধরনের হাতি। তার দাঁতগুলোও ছিল অদ্ভুত ধরনের আর এদের বাহন ঘোড়া। তবে ঘোড়ার গায়ে এই ধরনের চামড়া আগে নজরে পড়েনি।

অরণ্যে নবাগত এই দুজনের চোহারা, চলাফেরা দেখে মনে হয় ওরা বিশেষ কোনো উদ্দেশে ঘোরাঘুরি করছে। মাঝে মাঝে তাদের চোখে মুখে উদবেগ ও আশঙ্কার ছাপ পড়ছিল।

সতেরো

গভীর বনে ওই বিচিত্র দুটি লোক অবাক হয়ে এসব কিছু দেখে একজন আর একজনকে বলল, 'ওরে দাদা, সর্পনখা, নিশ্চয় কোনো শত্রু ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। হয়তো ইতিমধ্যেই লোকটার সর্বনাশ হয়েছে।'

এই কথায় সর্পনখা একটুও বিচলিত না হয়ে বলল, 'কার কী সর্বনাশ হল তা নিয়ে আমাদের কি দরকার সর্পস্বরা? আমরা কোন জগতের লোক আর এটা কোন জগৎ? এখানে যার যা ইচ্ছা করে যাক আমাদের কী। আমরা কেন যে এই বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভেবে পাই না। এত হেঁটেছি যে পায়ের চামড়া খসে যাবে।' ‘তোমার কথা ঠিক। কিন্তু এরকম একটা দৃশ্য দেখে কারণটা না জেনে যাওয়া যায়?’ বলে সর্পস্বরা ঘোড়ার উপর দাঁড়িয়ে, ঝট করে একটা লাফ দিয়ে গাছের ডালে ঝুলতে ঝুলতে ওই ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাদা, অদ্ভুত একটা জন্তু আছে ভেতরে। ঠিক নরদানবের মতো। এ জিনিস দেখে কেটে পড়া যায় না। একটা লোকও সেখানে আছে দেখছি।'

'তাহলে ওই নরদানব আর লোকটাকে ধরতে হবে তো! আমাদের হারিয়ে যাওয়া লোকটার খবর হয়তো ওই লোকটার কাছে পাওয়া যাবে।' তারপর সর্পস্বরা ঘোড়ায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। কিছুক্ষণ পরে দুজনে একসঙ্গে ওই ঘরের কাছে গেল। গিয়ে দেখল নরদানব ঘরের সমস্ত খুঁটি নাড়তে নাড়তে ঘর থেকে বেরোনোর চেষ্টা করছে। আর কৃপাণজিৎ ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে খাড়াপাহাড়ের লোকের হাতে ধরা পড়ে। ওরা তার উপর আক্রমণ করছিল।

‘দাদা, আমি এই নরদানবকে উদ্ধারের চেষ্টা করছি। তুমি ওই বিরাটাকায় মানুষটাকে বন্দি কর।' বলে সর্পস্বরা নিজের ঘোড়াটাকে নরদানবের দিকে ছোটাল।

সর্পনখা গাছের লম্বা লতা দিয়ে কৃপাণজিতের গলা জড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'জয়, মায়া সরোবরেশ্বরের জয়।'

বিচিত্র ধরনের দুটো লোককে দেখে কৃপাণজিৎ ও খাড়াপাহাড়ের লোক অবাক হয়ে গেল। সর্পনখা যে লতা দূরে থেকে ছুঁড়েছিল তা চাবুকের মতো কৃপাণজিতের গলা জড়িয়ে রইল। ওই লতা ধরে দু-একবার টান দিতে-না-দিতেই কৃপাণজিৎ আর্তনাদ করে উঠল, 'না না, আমাকে মের না। তোমাদেরই মতো বিত্রিত ধরনের লোককে আমি অনেক সাহায্য করেছি। দয়া করে আমাকে মের না।'

তার এই কথা শুনে সর্পনখা অবাক হয়ে বলল, 'তাহলে তুমি মকরকেতুর খবর রাখ? অত বড়ো একজন যোদ্ধাকে তোমার সাহায্য নিতে হল কেন?

নিশ্চয় কোনো বড়ো ধরনের বিপদে সে পড়েছে! মকরকেতু এখন কোথায়?'

কৃপাণজিৎ জোড়হাত করে বলল, 'আগে গলায় যা জড়িয়েছ তা সরিয়ে নাও। আমার গলা দিয়ে কথা বোরোচ্ছে না। এত শক্ত করে গলাটা বাঁধা থাকলে কথা কী করে বলব?'

'ঠিক আছে, বাঁধন খুলে দিচ্ছি। তবে তুমি যদি কোনোরকম পালানোর চেষ্টা কর তাহলে কিন্তু রক্ষে পাবে না। আমার হাতের এই লতার অনেক গুণ। পালানোর চেষ্টা করলে এটা আবার তোমার গলা জড়িয়ে ধরবে।' সর্পনখা গম্ভীর গলায় বলল।

কৃপাণজিৎ ছাড়া পেয়ে গলায় হাত বুলিয়ে, ঠিক আছে কি না দেখে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বলল, 'দেখুন, সত্যি কথা বলতে কী, মকরকেতু এখন যে ঠিক কোথায় আছেন আমি তা জানি না। তবে দুটো লোক মকরকেতুকে খুব কষ্ট দিয়েছে। সেটা আমি স্থানীয় লোকের কাছে শুনেছি। ওদের একজনের নাম জয়শীল। ওর সঙ্গে যে আছে সে একজন কাপালিক। এই বনের বাসিন্দাদের মুখে খবরটা শুনলাম।'

এই কথা শুনে সর্পনখা রক্তচক্ষু করে বলল, 'ওহে ধোকাবাজ, আমি তোমাকে কী জিজ্ঞেস করছি আর তুমি কী জবাব দিচ্ছ। আমার প্রশ্ন হল মকরকেতু এখন কোথায়? তোমার সাহসের বলিহারি আমার প্রশ্নের সঠিক জবাব না দিয়ে তুমি আজেবাজে কথা বলছ কেন?'

মারা যাওয়ার ভয়ে মকরকেতুর খবর দিতে রাজি হলেও কৃপাণজিৎ কিন্তু তাকে কোনোদিন দেখেনি। তবে মকরকেতুর সম্পর্কে সে বনে ঘোরার সময় লোকের মুখে শুনেছিল।

একটা মিথ্যা কথাকে ঢাকতে গিয়ে অন্য মিথ্যা কথা বলতে হয়। এবার যে কোন মিথ্যা কথা বলে পার পাওয়া যায় তা কৃপাণজিৎ ভাবতে লাগল। এমন সময় খাড়াপাহাড়ের লোক একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। সর্পনখা ওদের উপর রেগে গিয়ে কটমট করে ওদের দিকে তাকাল। তখন খাড়াপাহাড় নমস্কার করে বলল, 'ওহে জলজ ঘোড়ার আরোহী, এই পাজি লোকটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আপনি আপনার সাথীর কথা ভুলে গেছেন। তার অবস্থা যে কী হয়েছে একবার দেখে নিন। খাড়াপাহাড়ের কথা শুনে সর্পনখার মনে পড়ল ছোটো ভাইকে। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে চিৎকার করে ডাল, 'ভাই সর্পস্বরা! তুমি কোথায়? নরদানবটা কোথায়?'

বার বার ডেকেও সাড়া না পেয়ে সর্পনখা দাঁত কটমট করতে করতে সকলের দিকে তাকাল। লক্ষ করল খাড়াপাহাড়ের লোকজন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

এই অবস্থায় ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সর্পনখা ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, 'তোমরা এভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কী হয়েছে? বল, তাড়াতাড়ি বল।'

খাড়াপাহাড় সবিনয়ে বলল, 'হে জলজ ঘোড়ার আরোহী, আপনার ভাই এবং নরদানব একসঙ্গে ঝোপের ভেতর ঢুকে গেছে। মনে রাখবেন, ওই নরদানবটি এই বদমাইস লোকটার পোষা জন্তু। এই লোকটার মন বোঝে সে। এ যে কখন কী বলবে তা সে জানে। তাই অনেক সময় বলার আগে সে কাজ করে। আপনার ভাইকে ধরে কাঁধে ফেলে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল এই লোকটা। ইশারায় নির্দেশ দিয়েছিল বলেই আপনি টের পাননি।'

'এত বড়ো মারাত্মক খবর তুমি বেশ ঠাণ্ডা মাথায় বলে যাচ্ছ তো!' বলতে বলতে যে লতা দিয়ে কৃপাণজিতের গলা জড়িয়েছিল সেটা আবার তার গলায় জড়িয়ে তার অন্য প্রান্ত খাড়াপাহাড়ের হাতে দিয়ে বলল, 'এই নাও, এটা ধর। আমি ঝট করে ওই নরদানবকে মেরে ফেলে, ছোটো ভাইকে উদ্ধার করে ফিরছি। এসে যদি দেখি এই লোকটাকে তোমরা ছেড়ে দিয়েছ তাহলে আর রক্ষে থাকবে না।' বলে সর্পনখা ওই ঝোপের দিকে দ্রুত চলে গেল।

জয়শীল ও সিদ্ধ সাধকের জানার ইচ্ছা করল খাড়াপাহাড়দের অবস্থা। কিন্তু তখন তারা ছিল পাহাড়ের অন্যপ্রান্তে। খাড়াপাহাড় যেভাবে জিদ ধরে কৃপাণজিতকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে গেল তাতে অন্যের মনে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। যে দু-জন তাদের এগিয়ে দেওয়ার জন্য এসেছিল তাদের খবর জেনে আসতে পাঠাল জয়শীল।

ওই দু-জন অনুচর খাড়াপাহাড় ও কৃপাণজিৎ যেখানে মুখোমুখি লড়ছিল সেখানে এসে অনেকক্ষণ ধরে ওদের লড়াই দেখে উপভোগ করল। তারপর ওরা অবাক হয়ে দেখল বিচিত্র ধরনের দুটো লোককে সেখানে আসতে। ওরা যখন এল তখন কৃপাণজিতের ঘর জ্বলছিল।

খাড়াপাহাড়ের সঙ্গে কৃপাণজিতের যুদ্ধ হচ্ছে শুনে বেঁটেদের সেনাপতি খুব খুশি হল। এই খবরটা তাড়াতাড়ি জয়শীলকে জানাবার জন্য সে দু-পা এগোতেই লক্ষ করল অদ্ভুত ধরনের দুটো লোক ঘোড়ায় চেপে এসে অদূরে দাঁড়াল।

ওদের আর ওদের ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে বেঁটেদের সেনাপতি খুব অবাক হল। চোখ বড়ো বড়ো করে সে দেখল একজন দড়ির মতো কী একটা ছুঁড়ে দিয়ে কৃপাণজিতের গলায় জড়িয়ে টান দিচ্ছে। অন্যজন নরদানবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মহানন্দে বেঁটেদের সেনাপতি অনুচরদের সেখানেই বুঝিয়ে বলল, 'দেখ, খাড়াপাহাড়ের সমস্ত লোকজনকে শেষ করার এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ। আর এক মুহূর্ত এখানে অপেক্ষা

করব না। যাই, তাড়াতাড়ি আমাদের রানিকে বলে। আসি। শুধু রানিকে জানালেই হবে না, জয়শীল ও সিদ্ধ সাধককে জানিয়ে আসতে হবে। তোমরা এখান থেকে নড়বে না। লক্ষ রাখবে ওদের উপর।' বলে বেঁটেদের সেনাপতি ছুটে বেরিয়ে গেল।

ওই সেনাপতির মুখে ঘটনার বিবরণ শুনে জয়শীল খুশি হল। আর সিদ্ধ সাধক মহানন্দে লাফিয়ে উঠে বলল, 'জয় মহাকাল! জয়শীল, আর আমাদের কোনো ভয় নেই। ঘোড়াগুলো যখন বিচিত্র ধরনের তখন লোকগুলো নিশ্চয়ই মকরকেতুর লোক। মকরকেতুকে আমরা হাতে পেয়েও হারিয়েছি। এদের হারাব না। এদের ধরেই আমরা মায়া সরোবরেশ্বরের সন্ধান পাব। তারপর কনকাক্ষ রাজার ছেলে-মেয়ে— কাঞ্চনবর্মা ও কাঞ্চনমালার খোঁজ পেতে আমাদের একটুও দেরি হবে না। আমরা সহজেই উদ্ধার করে রাজার কাছে ওদের নিয়ে যেতে পারব।'

উৎসাহের সঙ্গে এতগুলো কথা বললেও জয়শীল কোনো কথা না বলায় সিদ্ধ সাধক কিছুটা বিরক্ত হয়ে তাকে বলল, 'কী হল জয়শীল, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?'
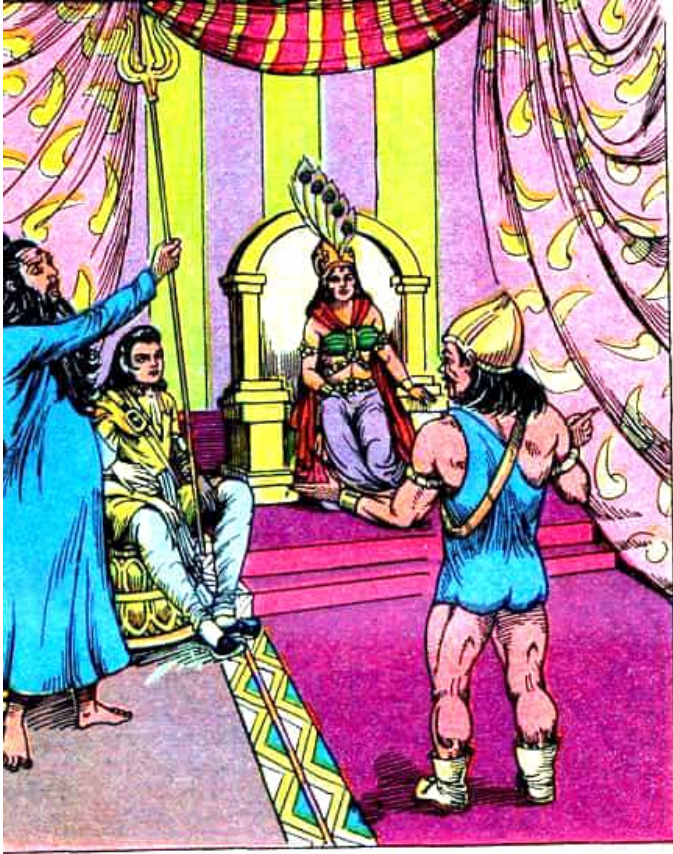
জয়শীল মুখ টিপে হেসে বলল, 'শুনব না কেন। ক-দিন ধরে তুমি যা পড়াচ্ছ তাই তো পড়ছি। আমি অবাক হচ্ছি একটি কথা ভেবে। কারা দুজন এসেছে শুনেই তুমি ভাবছ কী করে যে ওরাই কনকাক্ষ রাজার ছেলে-মেয়ের সন্ধান দেবে? গণনা করছ নাকি?'

এই প্রশ্ন শুনে সিদ্ধ সাধকের উৎসাহের আগুনে যেন ছাই পড়ল। সে বিড়বিড় করে বলল, 'দেখ জয়শীল, প্রত্যেকটা ব্যাপারে তুমি গোড়াতেই যদি এই ধরনের প্রশ্ন কর তাহলে আমাদের সারাজীবন এই বনে ঘুরে বেড়াতে হবে। এখানেই আমরা বুড়ো হয়ে যাব।'

'না না, অত ভেঙে পড়ছ কেন? বুড়ো বয়েসে তুমি শহরের বিরাট ভবনে থাকতে পারবে। আমি ভাবছি, ওই দু-জনকে ধরা যাবে কী করে? ওরা যদি মকরকেতুর লোক হয় তাহলে কি ওদের ধরা অত সহজ হবে?' জয়শীল বলল।

তার কথা শুনে সিদ্ধ সাধক ত্রিশূলটাকে মাটিতে খপ করে গেথে বলল, 'দেখ, জয়শীল ওদের কীভাবে ধরা যাবে তা আমি ভেবে ঠিক করতে পারব না। সে ভাবনা তোমার।'

জবাবে জয়শীল বলল, 'ঠিক আছে, সে না হয় আমি ভাবব। কিন্তু তুমি তোমার ত্রিশূলটাকে মাটিতে গেঁথে ফেললে কেন? তোমার মন্ত্রশক্তি কী কাজ করছে না?'

সিদ্ধ সাধক কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলল, 'জয়শীল, তুমি তো জানো। পুরোপুরি মন্ত্রশক্তি পাওয়ার আগেই বাধা পড়ল।'

'তা অবশ্য ঠিক।' বলে জয়শীল এদিক-ওদিক তাকিয়ে বেঁটেদের সেনাপতিকে বলল, 'সেনাপতি, কয়েক জনকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে আসতে পারবে?'

'আমি তো আপনার হুকুম পালন করার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি। ওই দেখুন লোকজন আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে।' বলে সেনাপতি কয়েক জনকে ইশারা করল।

জয়শীল ও সিদ্ধ সাধক এগিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে রইল সেনাপতি এবং তাদের লোকজন। হঠাৎ ওদের কানে গেল নরদানবের ভয়ংকর আর্তনাদ। যেদিক থেকে আওয়াজ এসেছিল সেদিকে জয়শীল সহ সবাই তাকাল। নরদানব লাফাতে লাফাতে কাঁধে একজনকে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল। কাঁধের লোকাট মৃত কি জীবিত বোঝা যাচ্ছিল না।

সিদ্ধ সাধক বলল, 'জয়শীল, আমার মনে হচ্ছে এই লোকটা ওদের একজন।'

জয়শীল বলল, 'তাহলে অন্যজন কৃপাণজিতের হাতে মরে গেছে।'

তাদের কথা শেষ হতে-না-হতেই সর্পনখাকে জোরে জোরে ডাকতে শোনা গেল, 'সর্পস্বরা! তুমি কোথায়? জয়শীল বলল, 'সবাই লুকিয়ে পড়। যেকোনোভাবে এই লোকটাকে ধরতে হবে।'

আঠারো

সর্পনখা একটি বড়ো গাছের নীচে এসে, তার ঘোড়াটিকে থামিয়ে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিল। যেদিকে তাকায় গাছ আর গাছ। তোর ছোটো ভাই যে কোথায় আছে, এই গাছের ঝোপে-ঝাড়ে যে কোথায় লুকিয়ে আছে তা সে বুঝে উঠতে পারল না। সর্পনখা এবারে আরও জোরে ডাকল, 'সর্পস্বরা।'

ডাক দিয়েও সে সাড়া পেল না। সর্পনখার মন ভেঙে গেল। ভীষণ রেগে গিয়ে তরবারি বের করে একটি গাছে গেঁথে চিৎকার করে বলল, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমার ছোটো ভাইকে খুঁজে পাচ্ছি না। তাকে যদি কেউ মেরে ফেলে থাকে, সেই হত্যাকারীকে আর তার মালিককে আমি খতম না করে এই অঞ্চল ছেড়ে যাব না।'

ওই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল জয়শীল। সর্পনখার শপথ শুনে সে খুশি হয়ে সিদ্ধ সাধককে বলল, 'সাধক, এই সর্পনখার প্রতিজ্ঞা শুনেছ তো? অরণ্যকে সাক্ষী রেখে সে প্রতিজ্ঞা করেছে। আমি নিশ্চিত, সে এই প্রতিজ্ঞা পালন করবে।'

'জয়শীল, ছোটো ভাইয়ের খোঁজ না পেয়ে সে যা মুখে আসছে তাই বলছে। যাই হোক, এখন তাহলে তাকে ধরার ব্যাপারটা কী হবে?' সিদ্ধ সাধক জিজ্ঞাসা করল।

সর্পনখার মন এখন ভেঙে গেছে। তাকে এখন বন্দি করা বৃথা। তার কোনো প্রাণের ভয় নেই। তাকে ধরতে হলে সতর্কতার সঙ্গে ধরতে হবে...'

জয়শীল এইসব কথা ভেবে সিদ্ধ সাধককে বলল, 'সাধক, এদের চেহারা আর চালচলন সাধারণ মানুষের মতন নয়। তাই একে ধরার কায়দাকানুন তুমিই ভালো জানো। জীবিত অবস্থায় একে ধরা নির্ভর করছে মায়া সরোবরে আমারা পৌঁছাতে পারব কি না তার উপর। এ যদি জীবিত অবস্থায় ধরা না পড়ে আমরা আদৌ মায়া সরোবরে পৌঁছাব কি না সন্দেহ আছে।'

'তা যা বলেছ। মকরকেতুকে ছেড়ে ভুল করেছি। সর্পনখাকে কিছুতেই ছাড়া যাবে না।' সাধক বলল।

'সেই কথাই বলছি, যেকোনো ভাবে ওর কাছে গিয়ে তার তরবারিটা নিয়ে নাও। তারপর ওকে বন্দি করে কীভাবে মায়া সরোবরে যাওয়া যায় তার ব্যবস্থা আমি করছি।' জয়শীল বলল।

তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ সাধক সেখান থেকে সরে গেল। তার চলে যাওয়ার পর জয়শীল বেঁটেদের সেনাপতিকে বলল, 'দেখ, সেনাপতি, ওই জল-ঘোড়ার আরোহীর ক্ষমতা যে কতখানি আছে তা আমরা জানি না, তবে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। যেকোনো মুহূর্তে সিদ্ধ সাধককে সাহায্য করার জন্য আমাদের ছুটে যেতে হবে। এখন আমাদের উচিত গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা।'

'ওকে ধরা এমনকী আর শক্ত কাজ ? ওকে আমি একাই ধরে গাছের ডালে। বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতে পারি।' বেঁটেদের সেনাপতি বলল।

কিছুক্ষণ পরে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে, ত্রিশূল উপরে তুলে চিৎকার করে উঠল, 'কে রে এটা, আমি যে গাছটাকে যত্ন করে বড়ো করেছি তাতে এভাবে কে তরবারি ঢুকিয়েছে? গাছের কান্না শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেছে। কে এই অপকর্ম করেছে?' সিদ্ধ সাধক বলল।

তার চিৎকার শুনেই সর্পনখা ঝট করে গাছে গেথে থাকা তরবারি বের করে সিদ্ধ সাধকের সামনে গেল। ততক্ষণে সাধকও তার সামনে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'হু!

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি মায়া সরোবরের সেবক।'

সেই গভীর অরণ্যে সিদ্ধ সাধকের কথা শুনে সর্পনখা ভাবল, 'এ নিশ্চয় সাধারণ মানুষ নয়। এক পলক দেখেই আমি যে কে যখন বলেছে এ নিশ্চয় কোনো সাধক।' এই কথা ভেবে ভয়ে সে কাদতে লাগল। সাধক তার অবস্থা দেখে। মনে মনে খুশি হল। সর্পনখাকে সাধক বলল, 'মায়া সরোবরেশ্বরের সেবক বলে তোমার এত অহংকার হয়েছে? আগে ঘোড়া থেকে নামো।' গর্জে উঠল সাধক।

সর্পনখা তৎক্ষণাৎ ঘোড়া থেকে নেমে সাধকের কাছে যেতেই সাধক বলল, 'কই দাও ওই তরবারিটা।'

চট করে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সর্পনখা সাধকের দিকে সন্দিহান দৃষ্টি হেনে বলল, 'আমার তরবারি দিয়ে তুমি কী করবে? আমাকে নিরস্ত্র করার পেছনে নিশ্চয় তোমার কোনো উদ্দেশ্য আছে! আমি যে কার সেবক তা তুমি জানলে কী করে? তুমি এত বড়ো সাধক যে গাছের কান্না শুনতে পাও?'

সিদ্ধ সাধক হো-হো করে হেসে বলল 'ওরে সর্পনখা, তোমার মতিভ্রম ঘটেছে। তা না হলে এই ধরনের প্রশ্ন তুমি করতে না। আমি তোমার বন্ধু মকরকেতুকে চিনি। ওই তরবারি যতক্ষণ তোমার হাতে আছে ততক্ষণ তোমার বিপদ।' বলে ত্রিশূল তুলে সাধক সর্পনখার দিকে এগিয়ে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে সর্পনখা কেমন যেন হয়ে গেল। কিন্তু পর মুহূর্তেই দৃঢ় কণ্ঠে সে বলল, 'এতক্ষণে বুঝতে পারলাম তুমি কে? নরদানবের মালিক কৃপাণজিৎ তোমাকে আর তোমার বন্ধুকে এই অরণ্যে দেখেছে। তুমি একটা কাপালিক, তাই না?'

তক্ষুনি সিদ্ধ সাধকের ইচ্ছে হল, ত্রিশূল দিয়ে তাকে আক্রমণ করতে। কিন্তু পরমুহূর্তে তার মনে পড়ল জয়শীলের নির্দেশ জ্যান্ত অবস্থায় তাকে ধরতে হবে। সর্পনখার আচরণ দেখে মনে হয় না যে সে অত সহজে ধরা দেবে। হঠাৎ সাধকের মাথায় এল একটি উপায়। ত্রিশুলটাকে মাটিতে গেথে সে বলল, 'ওহে সর্পনখা, তুমি আমাকে যা ভাবছ আমি তা নই। এক কাজ কর, আমি আমার ত্রিশূল দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি, তুমিও তোমার তরবারি দূরে ছুঁড়ে ফেল। তারপর দু-জনে বসে আলোচনা করব।'

'তুমি যে কী ধরনের আলোচনা করবে তা আমি জানি। তুমি চাও আমাকে নিরস্ত্র করে কোনো এক ছোটোখাটো দেবতার সামনে বলি দিতে। না, তোমাকে আর জ্যান্ত ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।' বলেই সর্পনখা তরবারি নিয়ে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল।

বিপদের আশঙ্কায় ত্রিশূলটা হাতে তুলতে না তুলতেই সর্পনখার তরবারি সাধকের বুকে ঠেকল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বেঁটেদের সেনাপতির বাহন এসে সর্পনখার পেছনে

গুঁতোল। সে চমকে উঠে পেছনের দিকে তাকাল। অদ্ভুত ধরনের ওই জীবটিকে দেখে সর্পনখার হাত থেকে তরবারি খসে পড়ল।

সঙ্গেসঙ্গে সাধক ওই তরবারি উপর পা চেপে হো-হো করে হেসে বলল, 'সেনাপতি, তোমার সময়ের জ্ঞানের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। জয় মহাকাল।'

ততক্ষণে জয়শীল সেখানে পৌঁছে গেল। সে সর্পনখাকে ধরে বলল, 'ওহে সর্পনখা তোমার নামটাই অদ্ভুত। তোমার আচার-আচরণ আরও অদ্ভুত। সাপের অনেক কিছু থাকে। কিন্তু নখ যে থাকে তা তো জানি না। তুমি কি ভেবেছ, মহান সিদ্ধ সাধক তোমাকে তোমার ওই ভোঁতা তরবারি দিয়ে আক্রমণ করতে যাবে?'

সর্পনখা চিৎকার করে উঠল, 'জয় মায়া সরোবরেশ্বর, তুমিই আমাকে রক্ষা কর।' তারপর ওদের দিকে ঘুরে তাকিয়ে সে বলল, তোমরা যেই হও আমাকে যে ছলচাতুরী করে নিরস্ত্র করেছ সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ওই তরবারিটা আমার হাতে থাকলে এতক্ষণে তোমাদের আমি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতাম।'

তৎক্ষণাৎ জয়শীল সাধকের কাছে গিয়ে বলল, 'দেখি সাধক, পা-টা সরাও তো। তরবারিটা ছাড়।'

সাধক পায়ের তলার তরবারি তুলে জয়শীলের হাতে দিল। জয়শীল সেটা সর্পনখাকে দিতে দিতে বলল, 'ওহে সর্পনখা, তোমার মায়া সরোবরেশ্বর, হিরণ্যপুরের রাজকুমার ও রাজকুমারীকে চুরি করে নিয়ে গেছে। সেদিক থেকে তুমি একটি চোরের সেবক। অনেক

বড়ো বড়ো কথা বলছ। তোমার যদি ক্ষমতা থাকে তো এসে আমার সঙ্গে তরবারিতে লড়ো। একটি কথা মনে রেখো, যাই ঘটুক, আমি কিন্তু তোমাকে প্রাণে মারব না। শুধু আমার একটা কাজ করিয়ে নেবো তোমাকে দিয়ে।'

তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সর্পনখা বলল, 'আমি জানি তুমি কোন কাজের কথা বলছ। নাও, এবার সামলাও।' বলে জয়শীলের গলা লক্ষ করে সর্পনখা তরবারি চালাল।

জয়শীল নিজের তরবারি দিয়ে তার তরবারি সরিয়ে বাঁ-পা দিয়ে মুখের উপর খপ করে মারল। সর্পনখা ধপাস করে নীচে পড়ে গিয়ে পরক্ষণেই উঠে বলল, 'এটা অন্যায়, তরবারিতে লড়তে লড়তে কেউ লাথি চালায় না।' বলে সে জয়শীলকে আক্রমণ করল।

'আমি তো আগেই বলেছি, তোমাকে মেরে ফেলব না। মকরকেতুকে দিয়ে যে কাজ করাতাম তা তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেব।' জয়শীলের কথা শেষ হতে-না-হতেই সর্পনখা তার বুকে তরবারি ঢুকিয়ে দিতে গেল। জয়শীল তরবারির আঘাতে ওই তরবারিটা নীচে ফেলে দিয়ে সর্পনখার তলপেটে ডান-পা দিয়ে সজোরে মারল।

ওই লাথি খেয়ে আর্তনাদ করে উঠল সর্পনখা। তার হাতের তরবারিটা অনেক দূরে ছিটকে পড়ল। ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলল, 'ছিঃ ছিঃ তরবারি যুদ্ধ কাকে বলে তা তুমি জানো না কি?' বলতে বলেতে সর্পনখা আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে তুমি তরবারি চালানোর চেয়ে মল্লযুদ্ধ বেশি পছন্দ কর। তবে মনে রেখ, আমিও মল্লযুদ্ধে দক্ষ।'

তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই মল্লযুদ্ধ করতে গিয়ে সর্পনখা বলল, দোহাই আপনাদের আমাকে মেরে ফেলবেন না। আমার ভাই, সর্পস্বরাকে নিয়ে মকরকেতুকে খুঁজতে আমি এসেছিলাম।'

'সর্পনখা, এবার পথে এসো' বলে জয়শীল সিদ্ধ সাধককে বলল, 'সাধক, এক্ষুনি একে বলি দিতে যেও না। একটু অপেক্ষা কর।' বলে জয়শীল সর্পনখাকে বলল, ওহে সর্পনখা, শোনো, তোমার ছোটোভাইকে যে নরদানব নিয়ে গেছে তার মালিক কৃপাণজিৎ এখনও বেঁচে আছে। সে আমার শত্রু। তোমার ভাইকে খোঁজার ব্যাপারে তোমাকে আমি সাহায্য করব। তবে একটি শর্তে। তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, ছোটো ভাইকে খুঁজে পাওয়ার পর তুমি আমাকে মায়া সরোবরেশ্বরের কাছে নিয়ে যাবে।'

'অনুমতি ছাড়া কোনো মানুষকে নিয়ে যাওয়া যায় না।' সর্পনখা বলল।

'ঠিক আছে, সেটা কোথায় আছে আমাদের জানিয়ে দাও। আমরা নিজেদের চেষ্টায় যাব।' জয়শীল বলল।

অবাক হয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে সর্পনখা বলল, 'সেই জায়গার সন্ধান দিলে আমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জয়শীল বলল, 'তাহলে, আমি আমার তরবারি দিয়ে তোমার মাথা কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলি?' এমন সময় দূর থেকে শোনা গেল, 'কোথায় জয়শীল? কোথায় সেই কাপালিক?' চিৎকার করে এই কথাগুলো বলতে বলতে জল-ঘোড়ায় চড়ে কৃপাণজিৎ সেদিকে তীব্রবেগে আসছিল।

উনিশ

সর্পনখার ঘাড়ে জয়শীলের তরবারি পড়তে যাবে এমন সময় সে কৃপাণজিতের চিৎকার শুনতে পেল। শুনে মাথা ঘুরিয়ে জয়শীল দেখতে পেল জল-ঘোড়ায় চড়ে কৃপাণজিৎ তার দিকে এগিয়ে আসছে। সিদ্ধ সাধক কৃপাণজিতকে দেখে মহানন্দে বলে উঠল, 'অনেক দিন পরে ওকে আজকে মুঠোর মধ্যে পাচ্ছি। আজ আমি ওকে আমার ত্রিশূলের খোরাক করবই।'

সর্পনখা ঝট করে সিদ্ধ সাধকের হাত চেপে ধরে বলল, 'আপনার কাছে অনুরোধ, দয়া করে বলুন, এই কৃপাণজিৎ কি একটি নরদানবের মালিক?'

'হ্যাঁ । এই নরদানবটাই তো তোমার ভাইকে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে।' সিদ্ধ সাধক বলল।

'তাই যদি হয়, তাহলে একে মেরে ফেলার আগে আমাকে জেনে নিতে দিন আমার ছোটো ভাইকে তুলে নরদানব কোথায় নিয়ে গেছে।' সর্পনখা বলল।

'ছাড়, হাত ছাড়। তোমার ভাই বাঁচুক, মরুক তাতে আমার কী? তুমি জানো, এই লোকটা আমার এবং জয়শীলের কত বড়ো শত্রু। একে যতক্ষণ না পরলোকে পাঠাচ্ছি ততক্ষণ আমার শান্তি নেই। আগে একে মেরে ফেলি। তারপর তোমার কথা শুনব।' দাঁত কটমট করতে করতে সাধক তাকে বলল।

ওদের কথা শুনতে শুনতে জয়শীলের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তার মনে হল, সর্পনখাকে হাত করার এটাই হল সুবর্ণ সুযোগ।

'সর্পনখা, মায়া সরোবর যে কোথায় আছে তা জানাতে তুমি রাজি না হলেও আমরা কিন্তু তোমার ভাইকে খুঁজে বের করার কথা দিয়েছিলাম। এখন এক কাজ করি, আমি এবং সিদ্ধ সাধক গাছের আড়ালে চলে যাই। তুমি কৃপাণজিতের সঙ্গে কথা বল। নরদানব যে তোমার ভাইকে কোথায় নিয়ে গেছে তা যদি তুমি। জানতে পার তাহলে তোমার খুব ভালো হবে।' জয়শীল বলল।

‘যেতে বলছেন বলুন, কিন্তু এই খালি হাতে আমি যাব কী করে? আমার তরবারি তো আপনি কেড়ে রেখেছেন।' সর্পনখা সবিনয়ে বলল।

জয়শীল তাকে তরবারি দিয়ে বলল, ‘মনে রেখ, কৃপাণজিৎ খুব ভালো তরবারি চালাতে পারে। যা করবে সাবধানে করবে, যাও।' তারপর সাধকের দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে বলল, ‘চল সাধক অনেকক্ষণ আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি, চল গাছের ছায়ায় দাঁড়াই।' বলতে বলতে সে তাকে নিয়ে গাছের ছায়ায় চলে গেল।

সর্পনখা নিজের জল ঘোড়ায় উঠে বসে কৃপাণজিতের দিকে এগোল। কিছু দূর যেতে-না-যেতেই তার পিঠে কী যেন ঢুকে যাওয়ার মতো মনে হল। পিছন ফিরে সে দেখল ওই ভেড়ার মতো একটা জন্তুর উপর বসে বেঁটেদের বাহিনী তার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। ওদের হাতে বল্লম আছে।

‘ওহে, তোমরাই আমার পিঠে বল্লম মারলে? তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? মিছিমিছি আমাকে মারলে কেন?’ সর্পনখা জিজ্ঞেস করল।

ওই প্রশ্ন শুনে ওদের সেনাপতি হেসে বলল, 'শোন হে, জল ঘোড়ার আরোহী, আমি যদি সত্যি বল্লম দিয়ে মারতাম তাহলে এতক্ষণে তুমি পটল তুলতে। ছোট্ট খোঁচা দিয়েছি। তাতেই তুমি এত অস্থির হয়ে উঠেছ। আসলে আমি তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চেয়েছি মাত্র।'

‘এই কি তোমার আলাপ করার কায়দা? আমার সঙ্গে তোমার কী কাজ যে আলাপ করবে? আমি হলাম গিয়ে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন মায়া সরোবরেশ্বরের লোক আর তুমি হলে এই অরণ্যের একটা সাধারণ অধিবাসী।' সর্পনখা বলল।

এমন সময় কৃপাণজিৎ জল-ঘোড়ায় চেপে সর্পনখার কাছে এসে বলল, 'কে তুমি? পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে তুমিই কি আমার গলায় দড়ির ফাঁস দিয়ে টানছিলে?’

হ্যাঁ, আমি। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি তুমি ওই ফাঁস ছাড়িয়ে পালালে কী করে? তুমি যে ঘোড়ার উপরে বসে আছ সেটা আমার ছোটো ভাইয়ের। তাকে কোথায় রেখেছ?' বলতে বলতে সর্পনখা নিজের ঘোড়াটিকে আস্তে আস্তে তার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ হাত তুলে কৃপাণজিৎ বলল, 'তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাক। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।' কৃপাণজিৎ বলল।

'কীসের কথা? আগে জানতে চাই আমার ভাই কোথায়?’ সে জিজ্ঞেস করল।

'নরদানব হঠাৎ তোমার ভাইয়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাকে নিয়ে যাওয়ার সময় বার বার সে চিৎকার করে উঠেছে, ‘দাদা, সর্পনখা, তুমি কোথায়?' বলে।

তুমি ঠিকই বলেছ, এই ঘোড়াটা তোমার ছোটো ভাইয়ের।' কৃপাণজিৎ বলল।

‘এখনও আমি আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি। আমি জানতে চাই, আমার ভাই কোথায়?’ 'সর্পনখা তরবারি নাড়তে নাড়তে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

‘সর্পনখা, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তোমার ভাইয়ের কপালে যদি মৃত্যু থাকে তাহলে এতক্ষণে সে নরদানবের হাতে মরেছে। তার সম্পর্কে পরে কথা বলা যাবে। আগে আমাদের দুজনের শত্রু জয়শীল ও সিদ্ধ সাধককে কীভাবে খতম করা যাবে তা ঠিক করতে হবে। তুমি হয়তো জানো না, ওরা তোমাদের মকরকেতুকে ভীষণভাবে জ্বালিয়েছে। তার উপরে অনেক রকমের অত্যাচার করেছে। আমি সমস্ত খবর পেয়েছি।'

কৃপাণজিতের কথা শেষ হওয়ার আগেই অস্থির হয়ে উঠে সর্পনখা বলল, 'ওহে দুরাত্মা, আজেবাজে কথা বলে তুমি আমার ভাইয়ের প্রসঙ্গ চাপা দিতে চাইছ? অন্য শত্রুদের কথা পরে হবে। আমার কাছে তুমি প্রধান শত্রু। তুমিই আমার ভাইকে মেরে ফেলেছ। আগে তোমাকে মেরে ফেলে আমার ছোটো ভাইয়ের আত্মাকে শান্ত করি।' বলে নিজের ঘোড়াটাকে দ্রুত তার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ কৃপাণজিৎ পেছিয়ে গিয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, আমার আজন্ম শত্রু জয়শীলকে যতক্ষণ না মেরে ফেলছি ততক্ষণ আমি শান্তি পাব না। তাই এখন আমি তোমার বিরুদ্ধে তরবারি হাতে লড়তে চাই না। কারণ লড়াইয়ে কে জিতবে তা কেউ বলতে পারে না।' বলতে বলতে কৃপাণজিৎ ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল।

সর্পনখা তার পেছনে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে জয়শীল সাধককে বলল, ‘সাধক, এই দুজনের মধ্যে একজন আমাদের চরম শত্রু। অন্যজনকে মিত্র করে ফেলার এই হল সুবর্ণ সুযোগ। সর্পনখাকে হাত করতে পারলে আমরা অতি সহজেই মায়া সরোবরে পৌঁছতে পারব।'

‘খুব ভালো কথা বলেছ। কিন্তু এখন তো দু-জনেই আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। এখন ওদের ধরা যাবে কী করে?’ সাধক প্রশ্ন করল।

জয়শীল তার কথা শুনে চারদিকে তাকাতে লাগল। এমন সময় তাদের নজরে পড়ল বেঁটেদের সেনাপতিকে। সে ওই সেনাপতিকে বলল, 'ওহে, ওই দু-জনকে ধরে আনা যাবে?’

সে বলল, 'কেন আনা যাবে না?’

'কী করে? এতক্ষণে ওরা কোথায় চলে গেছে কে জানে? ওকে ধরবে কী করে?’ জয়শীল প্রশ্ন করল।

‘সহজেই ধরা যাবে। আমি এক্ষুনি গোটা বনে ঢাক বাজিয়ে সতর্ক করে দেব। ওরা আমাদের দেশের সীমার বাইরে যেতে পারবে না।' বলে সে নিজের বাহনে চড়ে দ্রুত চলে

গেল।

'সাধক, এক্ষুনি আমাদের তেমন কিছু করার নেই। তবে কী হচ্ছে না। হচ্ছে আমাদের নজর রাখতে হবে। চল ওই টিলার উপরে উঠে চারদিকে নজর রাখি।' বলে জয়শীল এগিয়ে গেল।

'জয় মহাকাল! আমার মনে হচ্ছে কি জানো জয়শীল, আমরা যে সময় বেরিয়েছি সেই সময়টা ভালো ছিল না। তা না হলে পদে পদে এত বাধা পড়ত না। আমার মনে হয় না যে ওই বেঁটে সেনাপতি ওদের ধরতে পারবে।' বলতে বলতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সাধক জয়শীলের পেছনে পেছনে যতে লাগল। ওরা টিলার উপরে উঠল। উঠে চারদিকে তাকাল। ততক্ষণে গোটা অরণ্যে বেঁটে লোকগুলো ছোটাছুটি করছিল। চারদিকে ঢাক বেজে উঠেছিল। ওই ঢাকের আওয়াজ যে শোনে সেই সতর্ক হয়ে যায়। অন্যদিকে ধাওয়া করতে করতে কাছাকাছি এসে সর্পনখা কৃপাণজিতকে বলল, 'ওহে, কৃপাণজিৎ, তোমার কথায় তো বোঝা গেল না আমার ভাই বেঁচে আছে কি না? যদি বেঁচে থাকে তাহলে তো তার ঘোড়ার দরকার হবেই। তুমি যাচ্ছ যখন যাও, তবে ঘোড়াটি রেখে যাও। ঘোড়া ছাড়া আমার ভাই এক-পা চলতে পারে না।'

'আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে যে আমি ঘোড়া ফেরত দেব? ঘোড়া ফেরত দিলেই তুমি আমার উপর আক্রমণ চালাবে। আবার তোমার বিরুদ্ধে আমাকে তরবারি চালানোর কথা ভাবতে হবে। আমি ওই জয়শীলকে মেরে ফেলার আগে অন্য কারও বিরুদ্ধে লড়ব না। আগে ওকে শেষ করব তারপর তোমাকে এক হাত দেখে নেব।' বলে সর্পনখা ঘোড়া ছুটিয়ে নদীর তীরে গেল।

সর্পনখা বুঝল, 'ভালো কথায় কৃপাণজিতের কাছ থেকে কাজ পাওয়া যাবে না । আর কথা নয়, এবার আক্রমণ। ওকে আক্রমণ না করলে ও আমার ভাইয়ের খবর কিছুতেই বলবে না।' ভাবতে ভাবতে সে নিজের ঘোড়া অত্যন্ত দ্রুত ছোটাল।

ইতিমধ্যে বেঁটে লোকগুলো কৃপাণজিৎ ও সর্পনখাকে ধরে ফেলার জন্য অস্ত্র ধারণ করে, সবাই তাদের পথ আগলে দাঁড়াল। দূর থেকে ওদের দেখতে পেয়েই কৃপাণজিৎ ভাবল, এখন আমি কী করব! সামনে গেলে ওরা আমাকে ধরে ফেলবে। ওদের উপর আমার নরদানব অনেক অত্যাচার চালিয়েছে। ওরা নিশ্চয়ই আমার উপর দিয়ে তার প্রতিশোধ নেবে। আর পেছনের দিকে ছুটলে সর্পনখা ধরে ফেলবে। সে নিশ্চয় ভাইয়ের খোঁজখবর নিতে চাইবে। কী করি?'

এই অবস্থায় সে হঠাৎ ঘোড়াটাকে জলের দিকে চালিয়ে দিল। ঘোড়ার পা জলে ঢুকতেই দুটো কুমির ঘোড়ার দিকে এগিয়ে এল। ওই দুটোকে দেখে কৃপাণজিতের বুক ভয়ে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। তার মাথা ঘুরতে লাগল।

ততক্ষণে সর্পনখা নদীর তীরে এসে গিয়ে বলল, 'ওহে ও বোকা কৃপাণজিৎ, তোমার বুদ্ধি কি লোপ পেয়েছে? তুমি যদি মায়া সরোবরে যেতে চাও তাহলে একমাত্র আমার ভাই তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারে। তুমি কি ভেবেছ। এই ঘোড়া থাকলে কুমিরগুলো তোমাকে কিছু বলবে না?' বলতে বলতে সে-ও জলে নেমে গেল। ইতিমধ্যে কুমির দুটো কৃপাণজিতকে ধাওয়া করল। তীর থেকে বেঁটে লোকগুলো পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারল কৃপাণজিতকে। সর্পনখা ওদের বারণ করল।

ইতিমধ্যে একটি কুমির কৃপাণজিতের কোমরে কামড়ে ধরল। তৎক্ষণাৎ সর্পনখা ওই কুমিরটাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করল। ওই আঘাতের ফলে কুমিরটা ঘায়েল হয়ে গেল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় কুমির বিরাট হাঁ করে কৃপাণজিতের দিকে এগিয়ে গেল। তা দেখে কৃপাণজিতের ঘোড়া ঘাবড়ে গেল। সে মুখ ঘুরিয়ে তীরে উঠে এল। ঘোড়াটা তীরে উঠে আসতেই বেঁটে লোকগুলো চিৎকার করে বলল, 'ওহে, ঘোড়াটাকে ওই গাছের কাছে নিয়ে যেও না। ওটা মৃত্যুবৃক্ষ। ওর কাছে যে যায় সে আর বাঁচে না। তৎক্ষণাৎ কৃপাণজিৎ ঘোড়াটাকে অন্যদিকে ঘোরাতে চাইল। কিন্তু ঘোড়াটা জিদ ধরে ওই গাছের দিকেই এগিয়ে গেল। ফলে ওই গাছের কাছে যেতেই গাছের ডাল কৃপাণজিতকে ধরে ফেলল।

কুড়ি

মৃত্যুবৃক্ষের একটি ডাল কৃপাণজিতের মুণ্ডু ধরে একটু উপরের দিকে তুলতেই অন্য দুটো ছোটো ছোটো ডাল কৃপাণজিতের দিকে এগিয়ে এল। একটি ধরল তার কাঁধ আর অন্যটি তার হাত। কৃপাণজিৎ আর্তনাদ করে উঠল, 'বাঁচান— বাঁচান!'

কিন্তু তার এই আর্তনাদ শুনেও কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। যেকোনো অবস্থায় মৃত্যুবৃক্ষের কাছাকাছি আসতে কেউ সাহস করে না। তা ছাড়া, এই কৃপাণজিতের জন্য অনেককেই অনেক বার বিপদে পড়তে হয়েছে। কিন্তু তাকে উদ্ধার করতে কেউ না এগোলেও তার সুন্দর জল-ঘোড়াটা ধরে ফেলল ওরা। অদূরেই পাথরের উপর দাঁড়িয়েছিল জয়শীল ও সিদ্ধ সাধক। সর্পনখা মৃত্যুবৃক্ষের কাছে এসে বলল, 'আমার ছোটো ভাই যে কোথায় আছে তার সন্ধান একমাত্র কৃপাণজিৎ দিতে পারে। তাই ও এখন মরে গেলে আমার ছোটো ভাইকে কোনোদিন খুঁজে পাব না।' বলে সে তরবারি দিয়ে সজোরে ওই ডালের উপর প্রচণ্ড এক কোপ মারল।

তৎক্ষণাৎ সমস্ত গাছটা থরথর করে কেঁপে উঠল। গাছের একটি সরু লিকলিকে ডাল সাপের মত সর্পনখার গলা জড়িয়ে ধরল। সর্পনখা আর্তনাদ করতে লাগল, ‘হে মায়া সরোবরেশ্বর আমাকে বাঁচাও বাঁচাও!’

জয়শীল ও সিদ্ধ সাধক দ্রুত সেখানে এসে গেল। সিদ্ধ সাধক সর্পনখার পা দুটো ধরে নীচের দিকে টানতে লাগল। আর জয়শীল চোখের পলকে সর্পনখার গলায় জড়ানো ডাল এক কোপে কেটে উড়িয়ে দিল।

তাকে উদ্ধার করে এনে শুইয়ে রেখে, উপরে তুলে, তার পা উপরের দিকে এবং মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে তাকে জয়শীল বলল, ‘মায়া সরোবরে আমাদের নিয়ে যাবার পথ দেখানোর একমাত্র ভরসা তুমি। আর সেই তুমি মরে গেলে আমাদের চলবে কেন?’

কিছুটা সুস্থ হয়ে নিজের গলায় হাত বুলাতে বুলোতে সর্পনখা বলল, ‘দেখ, আমি এ-কথা ঠিকই জানতাম, যে আমাদের মায়া সরোবরেশ্বর আমাকে এই বিপদ থেকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করবেন।'

তার কথা শুনে সিদ্ধ সাধক রেগে গিয়ে বলল, 'তাই নাকি? তাহলে আমরা কিছু করিনি? তোমাকে তাহলে মায়া সরোবরেশ্বরই উদ্ধার করেছে? আমরা করিনি?’

'সরাসরি উনি আমাকে উদ্ধার করেননি ঠিকই, তবে আপনাদের মাধ্যমে উনি নিজের কাজ করিয়ে নিয়েছেন।' বলে সে কৃপাণজিতের দিকে তাকাল। কৃপাণজিৎ তখনও মৃত্যুবৃক্ষের ডালে ঝুলছে। 'আমার ছোটো ভাইয়ের খবর যে জানে— হায় হায়! সে মরে যাচ্ছে! তাহলে আমার ভাইয়ের খবর আর পাব কোথায় কেমন করে?’ বলতে বলতে সর্পনখা ওইদিকে দ্রুত এগিয়ে গেল।

হঠাৎ জয়শীল তার হাত খপ করে ধরে, ধারে কাছে যে বেঁটে লোকগুলো ছিল তাদের বলল, 'একে কয়েক বার জলে চোবাও তো। ব্যাটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

ওরা তাকে ধরতে এলে সর্পনখা ধমক দিয়ে চিৎকার করে বলল, ‘মাথা আমার খারাপ হয়নি, মাথা খারাপ হয়েছে তোমাদের। যে-জলে তোমরা আমাকে চোবাতে চাইছ সেই জলে যে বড়ো বড়ো কুমির ভরতি!’

'জল-ঘোড়া নিয়ে ঘোরাঘুরি কর আর জলকে তোমার ভয়, কী বলছ হে? তোমাকে আমরা ওই কুমিরদের মধ্যেই ছেড়ে আসব।' বলে ওকে টানতে টানতে জলের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল বেঁটে লোকগুলো।

এমন সময় বেঁটেদের রানি রথে চড়ে সেখানে এল। রানিকে দেখে সবাই নমস্কার করল। জয়শীল রানিকে বলল 'তোমাদের মহা শৎৰু কৃপাণজিৎ এখন মৃত্যুবৃক্ষের ডালে ঝুলছে। এবার তোমাদের আর কোনো ভয় নেই। আর আমরাও আমাদের পথে চললাম। তবে যাওয়ার আগে ভাবছি ওই রাক্ষুসে মৃত্যুবৃক্ষে আগুন ধরিয়ে দেব। অনেকের প্রাণ নিয়েছে এই বৃক্ষ।'

'তাই করুন। আপনারা যে উপকার করলেন তা আমরা বামন জাতির লোকেরা এ জীবনে ভুলব না। নরদানবের মালিক মারা গেল বটে কিন্তু সেই ভয়ংকর নরদানবটি এখনও এই অরণ্যে ঘোরাঘুরি করছে। তাই আমাদের সবসময় নিশ্চয়ই সজাগ থাকতে হবে।' রানি বিনম্রভাবে ওদের বলল।

জয়শীল রানির কথা সহানুভূতির সঙ্গে শুনে বলল, 'দেখ, আমরা এখন সর্পনখাকে নিয়ে ব্যস্ত আছি। তার ছোটো ভাইকে নরদানব তুলে নিয়ে গেছে। তার সাহায্য পেতে হলে নরদানবকে ধরতে হবে। ওই নরদানবটাকে একবার যদি আমরা হাতের মুঠোয় পাই তাহলে ওকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলব।'

‘মেরে হয়তো না-ও ফেলতে পারি। আমার ভীষণ ইচ্ছে, ওটাকে আমার বাহন করা। কিন্তু কিন্তু এক্ষুনি তো আগুন একটু চাই। গাছটাকে পোড়াতে হবে যে—।' বলল সিদ্ধ সাধক।

কয়েক জন আগুন নিয়ে সিদ্ধ সাধকের কাছে এগিয়ে এল। সাধক আগুন হাতে নিয়ে বলল, ‘গাছটা অনেক মানুষ খেয়েছে। এত মানুষ যখন খেয়েছে তখন তার মধ্যে নিশ্চয়ই মাংস এবং চর্বি থাকতে পারে। থাকুক বা না থাকুক তার লক্ষণ নিশ্চয়ই থাকবে।'

গাছে আগুন লাগাতে যাবে এমন সময় সবাই শুনতে পেল কে কোথা থেকে যেন বলছে: 'থামো মুখ কোথাকার! পাপী! অমন সুন্দর মৃত্যুবৃক্ষকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে চাইছ? ভাবছ এ-কাজ তুমি পারবে?’

সাধক ও জয়শীল এদিক-ওদিক তাকাল। যে লোকটা এই কথাগুলো চিৎকার করে বলল চোহারায়, পোশাক-আশাকে তাকে সাধুর মতো দেখতে। বলতে বলতে লোকটা

জয়শীল ও সাধকের সামনে এসে দাঁড়াল। সাধক অস্থির হয়ে বলল, 'কে তুমি? আমি হলাম মহাকালের ভক্ত, আর তুমি আমাকেই পাপী বলছ? তোমার সাহস তো কম নয় হে!'

লোকটা নির্ভীকভাবে ধমক দিয়ে সাধককে বলল, 'শোনো—আমি হচ্ছি এই মৃত্যুবৃক্ষের পূজারি। কেন— তরবারি দিয়ে এই বৃক্ষের ডাল কেটে ফেলার সময় তোমরা কি কেউ শুনতে পাওনি বৃক্ষের সেই কাতর আর্তনাদ?'

তার কথা শুনে জয়শীল বলল, 'ওই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তুমিই তো আর্তনাদ করেছিলে। কি ঠিক কি না বল তাড়াতাড়ি?'

বেঁটে পূজারি একটুও না ঘাবড়ে বলল, 'হ্যাঁ, তা কী হয়েছে? ঠিকই ধরেছ, বৃক্ষদেবের নির্দেশে আমিই আর্তনাদ করেছিলাম।'

জয়শীল সাধকের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন সে প্রশ্ন করছে এখন কী করা যায়। তখন সাধক বেঁটে পূজারির কাঁধের উপর থেকে কুঠার তুলে নিয়ে বলল, 'চুল বাড়িয়ে ফোঁটা দিলেই পূজারি হয়ে যায়, না? যার জন্ম আছে তার মৃত্যুও আছে। আজকে মৃত্যুবৃক্ষের মৃত্যু। সঙ্গে সঙ্গে তোমার পূজারির চাকরিও গেল। কুঠার যখন আছে কাঠ কেটে পেট চালাও। তোমার বৃক্ষ আর কত প্রাণ নষ্ট করবে?'

এই বলে সিদ্ধ সাধক গাছের উপর আগুন ছুঁড়তে যাবে এমন সময় বেঁটে পূজারি লোকটা সাধকের হাত হঠাৎ চেপে ধরল।

'তোমার এত বড়ো সাহস? আমাকে বলছ মূখ, পাপী?' বলে এক ধাক্কা দিয়ে পূজারিকে সাধক সরিয়ে দিল। তারপর সাধক বেঁটে পূজারিকে মুখ ভেংচে বলল, 'তুমি পূজারি— না? এতদিন কত লোককে ঠকিয়েছ হে?'

এমন সময় জয়শীল পূজারিকে ধরে মৃত্যুবৃক্ষের দিকে ছুড়তে যেতেই সে কঁদতে কাঁদতে বলল, 'ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন।'

তখন জয়শীল হাসতে হাসতে তাকে মাটিতে দাঁড় করিয়ে বলল, 'সাধক, এখানে আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। গাছে আগুন ধরিয়ে দাও।'

তৎক্ষণাৎ সাধক মৃত্যুবৃক্ষের উপর আগুন ছুঁড়ে দিল এবং এক মুহূর্তে সারা গাছে দাউদাউ করে আগুন ধরে গেল। ঘিয়ে আগুন লাগার মতো, গোটা গাছটা দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল।

জয়শীল জ্বলন্ত মৃত্যুবৃক্ষে ঝুলন্ত কৃপাণজিৎকে দেখে বলল, 'এই লোকটা অমরাবতীর নগরের রাজার অশ্ববাহিনীর সেনানায়ক। একটা জুয়াখেলার ঘরে এর সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধে। এর জন্যই আমাকে সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। শুধু তাই নয়— এর জন্যই

আমার এক বন্ধু দেবশর্মাকে ঘরবাড়ি পরিবার-পরিজন সব কিছু ছেড়ে পালাতে হয়েছে। আমার ওই পরম বন্ধু যে কোথায় আছে কে জানে।'

'মায়া সরোবর থেকে হিরণ্যপুরের রাজকুমার ও রাজকুমারীকে উদ্ধার করার পর, আমার মন বলছে— তোমার বন্ধুর খোঁজ পাওয়া যাবে।' সাধক দৃঢ়কণ্ঠে বলল।

'কেন জানি না— মাঝে মাঝে আমারও মনে হয় যে আমি তাকে খুঁজে পাব। যাহোক আর দেরি নয়, চল।' জয়শীল ব্যস্ত হয়ে সিদ্ধ সাধককে বলল।

সর্পনখা জল-ঘোড়ার পিঠে চড়ে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিল। জয়শীলের সেখানে যে অন্য একটা জল-ঘোড়া ছিল সেটাকে দেখিয়ে বলল, 'সাধক, এই ঘোড়াটাকে এখানে ছেড়ে যাওয়ার কোনো মানে হয়? আমাদের দুজনের মধ্যে যেকোনো একজনের কাজে লাগতে পারে এই ঘোড়াটা।'

'জয়শীল, ওই জল-ঘোড়ার উপর তুমিই চেপে বস। আমি তোমার সঙ্গে পায়ে হেঁটে যেতে পারব। একদিন-না-একদিন ওই নরদানবকে পেলে তাকেই আমি আমার যোগ্য বাহন করে তুলবো।' সাধক অতি আনন্দের সঙ্গে জয়শীলকে বলল।

'সাধক, তোমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হোক— এটাই আমি চাই।' বলে জয়শীল রানিসহ সেখানে যারা ছিল তাদের সকলের উদ্দেশ্যে বলল, 'তোমাদের চিরশত্রু কৃপাণজিৎ পুড়ছে! তোমাদের আর কোনো ভয় নেই, আশা করি এখন থেকে তোমারা তোমাদের দেশে সুখে শান্তিতে থাকবে। আমরা এখন তাহলে চললাম। বিদায়!'

জয়শীল ও সিদ্ধ সাধকের মতো সৎ, সাহসী আর বিপদ কালের পরম। বন্ধু দু-জন তাদের রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে শুনে বামনদের মধ্যে হাহাকার উঠল। এতদিন ধরে ওরা এই দু-জন নির্ভীক মানুষের আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে ছিল। তা ছাড়া জয়শীল ও সিদ্ধ সাধক যেন তাদেরই লোকের মতো হয়ে উঠেছিল। তাই ওরা দু-জন যাতে এ-রাজ্য ছেড়ে চলে না যায় তারজন্য বেঁটেরা বিভিন্নভাবে ওদের অনুরোধ করতে লাগল। ওরা দুজন চলে যাবে শুনে বেঁটেদের কেউ কেউ আবর কেঁদেও ফেলল।

কিন্তু, কর্তব্য বড়ো কঠিন জিনিস। কর্তব্যের ডাকে মানুষকে দয়া-মায়া বিসর্জন দিয়েও ছুটে যেতে হয়। তাই যদিও জয়শীল এবং সিদ্ধ সাধকের চলে যেতে খারাপ লাগছিল, তবু তাদের না গিয়ে উপায় ছিল না।

ওদের রওনা হওয়ার সময় সেখানকার রানি এবং প্রজাদের খুব দুঃখ হয়েছিল। ওরা আবেগের সঙ্গে জয়শীল ও সাধককে বিদায় দিল। ওদের রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্পনখা তাদের অনুসরণ করতে করতে বলল, 'ওহে— জয়শীল, সাধক, আমাকে না নিয়েই

তোমরা চলে যাবে নাকি? আমার সেই ছোটো ভাইকে সর্পস্বরাকে উদ্ধার করার কথা তোমাদের মনে আছে তো?'

জয়শীল একবার তার দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, 'নদীর জলে কয়েক বার ভালো করে চোবানোর ফলে তোমার মনমেজাজ বেশ ভালো হয়েছে দেখছি। এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। আমরা পথ খুঁজে খুঁজে মায়া সরোবরে ঠিকই পৌঁছে যাব। আর তোমাদের মায়া সরোবরের কর্তাকে ধরে টুকরো টুকরো করে কেটে জলপাখি আর জলজন্তুদের খেতে দেব।'

এই কথা শুনে সর্পনখার মুখ ঝুলে গেল। জয়শীল আর সিদ্ধ সাধক নামের লোক দু-জন যে সাধারণ লোক নয়, সে-কথা সর্পনখা এর আগেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। ওরা যে মায়া সরোবর খুঁজে বার করতে পারবে সে-বিষয়েও তার আর কোনো সন্দেহ নেই।

ঠিক সেইসময় একটি পাহাড়ের গুহার মুখে কী যেন দেখতে পেয়ে সর্পনখা জয়শীলকে বলল, 'দ্যাখ তো দ্যাখ তো জয়শীল—ওই গুহার মুখে কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে—দেখ তো। এটাই কী সেই নরদানব?'

'হুঁ! ঠিকই, এই সেই নরদানব!' জয়শীল গুহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে বলল।

ওদিকে নরদানবও ওদের দেখে গর্জন করতে করতে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে যেন মকরকেতুর বাহন জলগ্রহ হাতি হঠাৎ গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ভয়ংকর নরদানবকে তার লম্বা শুঁড় দিয়ে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল।

একুশ

জলগ্রহকে দেখেই জয়শীল সিদ্ধ সাধক ও সর্পনখা অবাক হয়ে গেল। সর্পনখা বলল, 'ওহে জয়শীল— ওহে সিদ্ধ সাধক ওই জল-হাতি জলগ্রহটাই মহাশক্তিমান মকরকেতুর

বাহন। এই মহাশক্তিমান মকরকেতুই হল মায়া সরোবরেশ্বরের সেবকোত্তম। ওই দেখ—মকরকেতু!'

সর্পনখার কথা শুনে সাধক তার ত্রিশূল উপরে তুলে জোরে জোরে বলল, 'জয় মহাকাল! ওহে জলমানব, তোমার মহাশক্তিমান মকরকেতুর যে কতখানি শক্তি আছে তা আমরা ভালোভাবেই জানি। আমরা কাউকে বাদ দেব না। ওই জল-হাতি এবং মকরকেতু, আর তোমাদের দুজনকেই মহাকালের কাছে বলি দেব।' বলতে বলতে সিদ্ধ সাধক সেই গুহার দিকে ছুটে যেতে চাইল।

তৎক্ষণাৎ তাকে থামিয়ে, বুঝিয়ে জয়শীল বলল, 'ওহে সাধক, অত তাড়াহুড়ো করো না। মায়া সরোবরে পৌঁছানোর আমরা সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি। এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মকরকেতুর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে মায়া সরোবরে পৌঁছানো, কনকাক্ষ রাজার রাজকুমার ও রাজকুমারীকে উদ্ধার করা। সুতরাং এক্ষনি তুমি কোনোরকম চাঞ্চল্য দেখাবে না। আমাদের এখন খুবই ধৈর্য ধরে সব কাজ করতে হবে।'

হইহই করে সাধক যে ত্রিশূল উপরের দিকে তুলেছিল সেটা নামিয়ে বলল, 'ওই মকরকেতু এখনও বেঁচে আছে! এটাই তো ভাবতে আমার আশ্চর্য লাগে। ওর পেটে ছোরা ঢুকে গেল, কাঁধে তির বিদ্ধ হয়ে গেল, ওর তো কবেই মরে যাওয়ার কথা। আমার কী মনে হয় জানো জয়শীল, হাতির পিঠে যাকে দেখছি, সে হয় আসলে মকরকেতু নয়, আর না-হয় নিশ্চয়ই মকরকেতুর মৃতদেহ ওটা।'

জয়শীল ও সিদ্ধ সাধকের মধ্যে যখন এই ধরনের কথাবার্তা চলছিল তখন জলগ্রহ হাতি ও নরদানবের মধ্যে শক্তির পরীক্ষা চলছিল দুরের পাহাড়ের উপরে। দু-একবার জলগ্রহের শুঁড় থেকে ছাড়া পেয়ে নরদানব হাতিকে জব্দ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হাতি তাকে শুঁড় দিয়ে ধরে পায়ের তলায় ফেলে রগড়ে পিষে মেরে ফেলার চেষ্টা করল।

'সাধক, দেখছ তো, দুই জন্তুর লড়াই? তুমি বললে মকরকেতু মরে গেছে। আর ওই দেখ— একজন নয়, দু-জন নয়, চার চারজন লোক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে ওই জলগ্রহ আর নরদানবের মরণপণ লড়াইয়ের ভয়ংকর দৃশ্য দেখছে।' জয়শীল পাহাড়ের চূড়া দেখিয়ে বলল।

জয়শীল সাধককে যেদিকে তাকাতে বলল সেদিকেই তাকিয়ে পাহাড়ের উপর চার জনকে দেখে সাধক অবাক হয়ে গেল। ওই চার জনের মধ্যে পোশাক দেখে একজনকে মনে হল মকরকেতু। সেই চার জনের মধ্যে দু-জন লোক জয়শীল ও সিদ্ধ সাধক বিশেষ করে জয়শীলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

পাহাড়ের ওপরে যে দু-জন লোক জয়শীলের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে ছিল— জয়শীলও তাদের লক্ষ করছিল কিন্তু ওরা যে ঠিক কারা সে-কথা কিছুতেই সে মনে করতে পারছিল না।

মকরকেতু জয়শীল ও সিদ্ধ সাধককে দেখে তার পাশের একজনকে বলল, 'বৈদ্যদেব, ওই সুন্দর জল ঘোড়ার পিঠে যে যুবককে দেখা যাচ্ছে সে হল জয়শীল। আর ওই ত্রিশূল হাতে সাধুর মতো দাড়িওয়ালা যাকে দেখাচ্ছে। সে-ই হল সিদ্ধ সাধক। আর তৃতীয়জনকে তো সহজেই চেনা যাচ্ছে ও হল আমাদের সহযোগী সর্পনখা।' 'আমার দাদা এখনও বেঁচে আছে! এ তো আমি ভাবতেই পারছি না!' সাগ্রহে ভাইয়ের কাছে যাওয়ার জন্য এগোতেই মকরকেতু তার হাত ধরে রেগে গিয়ে বলল, 'ওহে, সর্পস্বরা মনে রেখ ওই জয়শীল ও সিদ্ধ সাধক আমাদের মহাশত্রু। তবু মায়া সরোবরেশ্বরের নির্দেশ অনুসারে তাদের প্রতি আমাদের ভদ্র নম্র ব্যবহার করতে হবে। কীভাবে যে ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায় তা এখন আমাকে বিশেষভাবে ভাবতে হবে।'

তারপর মকরকেতু হাতছড়িধারী দাড়িওয়ালাকে আবার বলল, 'বৈদ্যদেব, আমরা কি এখন আপনার কাছ থেকে কিছু উপদেশ পাব?'

ওই বৈদ্যদেব নামধারী লোকটা হাতি ও নরদানবের যুদ্ধ দেখে বলল, 'মকরকেতু, ওখানে কি ঘটছে দেখছ। জয়শীল আপ্রাণ চেষ্টা করছে তোমার পরমপ্রিয় আর বিশ্বস্ত জলগ্রহ হাতিকে বাঁচানোর।'

বৈদ্যদেবের কথাটা মকরকেতু উড়িয়ে দিতে পারল না। বৈদ্যদেব মিথ্যা বলেনি। কিন্তু মহাশত্রু জয়শীলের তো জলগ্রহকে মেরে ফেলবারই কথা, তা না করে সে কেন জলগ্রহের প্রাণরক্ষায় ব্যস্ত?

মকরকেতু ওই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে বলল, 'সবই মায়া সরোবরেশ্বরের ইচ্ছা।' তারপর সে দ্রুত পাহাড় থেকে নীচে নামল। তার সঙ্গী সাথীরাও একে একে নীচে নামল। ওদের মধ্যে একজন ছিল একটু খোঁড়া। সে একটু আস্তে আস্তে পাহাড় থেকে নামছিল।

সাধক কাছাকাছি দাঁড়িয়ে লক্ষ করল, জলগ্রহ কোনোরকমে নিজেকে মুক্ত করে পালানোর চেষ্টা করছে। ওদিকে মকরকেতু ও তার সঙ্গীদের আসতে দেখে জয়শীল বলল, 'সাধক, দেখতে পাচ্ছ, মকরকেতু এদিকে আসছে। সবদিক থেকে প্রস্তুত থেকো। হয়তো ওদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে।'

সাধক গা-ঝাড়া দিয়ে বলল, 'জয়শীল, এখন পর্যন্ত আমরা কাউকে তো ভয় পাইনি। ভয়ের অবশ্য কোনো কারণও ঘটেনি। তোমার হাতে আছে সাক্ষাৎ মহাকালের দেওয়া

অপরাজেয় তরবারি আর আমার ত্রিশূলের ক্ষমতা যে কতখানি তা তো তুমি ভালোভাবেই জানো ।'

জল-ঘোড়ায় চেপে ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে সর্পনখা জয়শীল ও সিদ্ধ সাধককে বলল, 'শুনুন, আপনারা ওই নরদানবকে মারতে পারেন। কিন্তু দয়া করে জলগ্রহকে মেরে ফেলবেন না। যিনি এই জল-হাতি জলগ্রহের মালিক সেই মকরকেতু কিন্তু মহাশক্তিমান। তার ক্ষমতা অসীম।'

'তোমার ওই শক্তিমানের চামড়া ছাড়িয়ে নেবো এই ত্রিশূল দিয়ে, বুঝতে পেরেছ? তুমি একদম চুপচাপ থাকবে বলে দিচ্ছি।' বলে সিদ্ধ সাধক রক্তচোখে তাকিয়ে দাঁত কটমট করতে লাগল।

জয়শীলের তরবারির আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে রেগে গিয়ে জলগ্রহ জয়শীলকে আক্রমণ করতে গেল। তখন সে ঝট করে জল-ঘোড়ার পিঠে চড়ে জলগ্রহকে আঘাত করার চেষ্টা করল। জলগ্রহ জয়শীলকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ফেলতে চাইল। তখন নিরুপায় হয়ে জয়শীল তরবারি দিয়ে হাতির মাথায় আঘাত করল। ততক্ষণে হাঁপাতে হাঁপাতে মকরকেতু সেখানে পৌঁছে গেল। তাকে দেখেই জয়শীল বলল, 'কেতু, তোমার এই হাতিটাকে একটু সামলাও তো। এই তোমার জন্যে আমাকে আর সাধককে বনে-জঙ্গলে খামোখা এত কষ্ট পেতে হচ্ছে। দেখছ দেখছ, তোমার জলগ্রহের কাণ্ড দেখছ। আমাকে না মেরে ফেলে ওর যেন কিছুতেই শান্তি হচ্ছে না।'

'জয়শীল, দোহাই তোমারা আমার জলগ্রহকে মেরে ফেল না। মনে রেখ, এই মুহূর্ত থেকে তোমরা এবং আমরা পরস্পরের বন্ধু। তুমি তো কতদিন থেকে মায়া সরোবরে যাওয়ার জন্য আগ্রহী। তোমার সেই আগ্রহ আজ আমি মেটাব। আমিই তোমাকে সেই আশ্চর্য দেশ মায়া সরোবরের রাস্তা দেখিয়ে দেব।' মকরকেতু জয়শীলকে অনুনয়ের সুরে ও স্থির কণ্ঠে বলল।

শত্রু মকরকেতুর এই আশ্চর্য নরম সুর ও পরিবর্তনে জয়শীল সত্যই আশ্চর্য হল। এসব মকরকেতুর কোনো নতুন ফন্দি নয় তো? জয়শীল খারাপ দিকটাও ভাবল। কিন্তু এখন বড়োই বিপদের সময় ভাবাভাবির সময় নয়। তাই তৎক্ষণাৎ জয়শীল মকরকেতুকে সাগ্রহে বলল, 'কেতু, আমি কিন্তু মায়া সরোবরে যাওয়ার জন্যই যে আগ্রহী তা ঠিক নয়, আসলে আমার আগ্রহ মায়া সরোবরে কনকাক্ষ রাজার যে রাজকুমার ও রাজকুমারী বন্দি আছে তাদের উদ্ধার করা। যেকোনোভাবে আমার এই অনুরোধ যদি তোমার মায়া সরোবরেশ্বরের কাছে পৌছানো যায়, তোমার মায়া সরোবরেশ্বর যদি ওদের মুক্ত করেন তাহলেই আমি খুশি। এখন আমি কী করব তুমিই বল।'
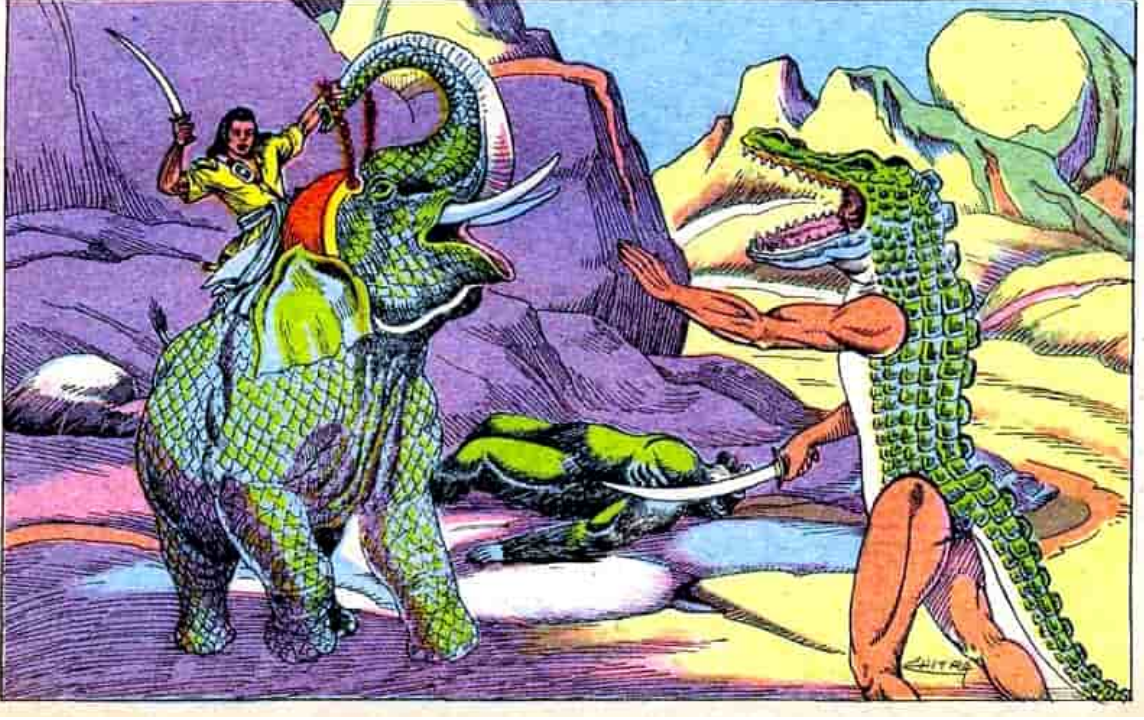
সাধক আর ধৈর্য ধরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সে তাড়াতাড়ি জয়শীলের কাছে এসে তাকে ফিসফিস করে বলল, 'জয়শীল, ওকে অত অনুরোধ করছ। কেন? ওকে অনুরোধ করার চাইতে বরঞ্চ ওকে আর ওই ওই সঙ্গীদের মেরে বেঁধে গুহার মধ্যে ফেলে রেখে চল আমরা মায়া সরোবরের পথে এগিয়ে যাই।'

তারপর সাধক নরদানবের দিকে তাকাল। সেটা চিতপাত হয়ে পড়েছিল। তার বুকে কান রেখে সাধক বলল, 'না, একেবারে মরে যায়নি। তবে উঠতে সময় লাগবে। ওহে সর্পনখা, ঝট করে নদীর জলে একটু কাপড় ভিজিয়ে নিয়ে এসো তো।' সাধক তাকে এমনভাবে বলল যেন সে তার চাকর।

এভাবে নির্দেশ দেওয়ায় সর্পনখা রেগে গিয়ে মকরকেতুর দিকে তাকাল। সর্পনখা যেন মকরকেতুর কাছ থেকে কিছু একটা আদেশের অপেক্ষায় আছে। মকরকেতুও সর্পনখার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলল না। তা লক্ষ করে সাধক সর্পনখার কাছে এসে বলল, 'মনে রেখ— ওই মকরকেতু এখনও তোমার প্রভু নয়। আমি যা বলেছি তা তাড়াতাড়ি পালন করো।'

সর্পনখা আবার মকরকেতুর পানে কিছু একটা নিদের্শ পাওয়ার আশায় তাকাল। কিন্তু মকরকেতুর কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়া তো দূরের কথা সে এমনভাবে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে রইল যেন সে সর্পনখার কথা শোনেনি, যেন সে তাকে চেনেই না। এই লুকোচুরি খেলাটা ভালো করে লক্ষ করে সাধক মকরকেতুকে পরিহাসের সুরে বলল,

'ওহে কেতু, তুমি তোমার সঙ্গে আবার তিন জনকে আনলে তার মধ্যে একজন আবার খোঁড়া। কী ব্যাপার সত্যি করে বল তো?

'সাধক, এই খোঁড়া লোকটাও তোমাদের রাজকুমার ও রাজকুমারীকে খুঁজতে এসেছিল। এর নাম নাকি মঙ্গলবৰ্মা' মকরকেতু বলল।

জয়শীল মনে মনে ভাবল: এই সেই মঙ্গলবৰ্মা! এই মঙ্গলবৰ্মাই কি আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে বাঘের ভয়ে পালিয়েছিল। ততক্ষণে সাধক জয়শীলের কাছে এসে চুপি চুপি বলল, 'জয়শীল মঙ্গলবর্মাকে চিনতে পেরেছ?'

জয়শীল চোখের ইশারায় জানিয়ে দিল যে সে চিনতে পেরেছে। এদিকে মকরকেতু যাকে বৈদ্যদেব নামে ডাকছিল সে জয়শীলের কাছে এসে এমনভাবে ইশারা করল যাতে তাকে যেন দেবশর্মা নামে ডাকা না হয়।

প্রথমে রাগ হলেও পরে সর্পনখা মহাশক্তিমান মকরকেতুর এই নিস্পৃহ আচরণের কথা একটু একটু করে বুঝতে পারল। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বুঝতে পারল যে তারা যত শক্তিধরই হোক— এখন তারাই বিপদগ্রস্ত।

সুতরাং নদীর জলে কাপড় ভিজিয়ে সর্পনখা ফিরে এল সাধকের কাছে। সাধক নরদানবের মুখে কাপড় নিংড়ে জল ঢেলে তার কপালে ভিজে ন্যাকড়া ছপ ছপ করে মেরে বলল, নরদানব, তুমি যে বেঁচে আছ তা আমি জানি।

আমি যাকে বাঁচাতে চাই সে বেঁচে ওঠে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই নরদানব পিট পিট করে চোখ খুলল। চোখ খুলেই অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা জলগ্রহকে দেখে সে খুবই ভয় পেয়ে গেল।

তা লক্ষ করে সাধক তার পিঠ চাপড়ে বলল, 'নরদানব, তোমার কোনো ভয় নেই। আমি আছি। এবার তুমিই হবে আমার বাহন।' এই বলে সাধক তার পিঠে ত্রিশূল চেপে ধরল।

নরদানব দাঁত কটমট করতে করতে সাধকের দিকে তাকাল। তার ওই ভাব লক্ষ করে সাধক তার পিঠে সপাং করে মারল। ওই আঘাত খেয়ে গোঁ গোঁ করতে করতে নরদানব দমে গিয়ে সাধকের পায়ের কাছে প্রণাম করার ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তার ওই ভঙ্গি দেখে সিদ্ধ সাধক মহানন্দে হো-হো করে হাসতে লাগল।

বাইশ

মকরকেতু এবং সেখানকার অন্যলোকেরা যখন দেখল যে নরদানব সিদ্ধ সাধকের বশ হয়ে গেছে, তারা অবাক হয়ে যায়। জয়শীল খুশি হয় খুব, 'দীর্ঘকাল পরে সিদ্ধ সাধক তাহলে নিজের জন্য এক বাহন পেয়ে গেল। কিন্তু এটা খুব বিপজ্জনক এক বাহন। বলা

যায়, কৃপাণজিৎকে সেই বধ করে। সর্পস্বরাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। জানি না, কীভাবে সেটার কবল হতে বেঁচে এসেছে।'

'আমিই সর্পস্বরাকে নরদানবের হাত থেকে বাঁচিয়েছি। তার কাছ থেকেই জেনেছি তুমি এখানে কোথাও আছ।' মকরকেতু বলল।

জয়শীল মকরকেতুর মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে তারপর বলল, 'তোমার সেই ক্ষতের কী হল? এত তাড়াতাড়ি তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছ, খুবই আশ্চর্য লাগছে।'

দেবশর্মাকে দেখিয়ে মকরকেতু বলল, 'পাহাড়ের উপরে অচৈতন্য হয়ে। পড়েছিলাম। আমার বেঁচে ওঠার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ইনি আমার চিকিৎসা করে আমায় বাঁচিয়ে তুলেছেন। সকল বৈদ্যকে ভগবান বলা হয়, তাই আমিও এনাকে বৈদ্যদেব নামে ডাকছি। এরমধ্যে এনাকে নিয়ে আমি একবার মায়া সরোবরেও গেছি, তোমাকে সন্ধান করার জন্যই আবার এখানে আসি।'

অমরাবতী নগরে দেবশর্মা জয়শীলের বাল্যবন্ধু ছিল। এভিন্ন সে ছিল এক জুয়াড়ি। বহু বৎসর পর তাদের দুজনের সেই ভগ্ন পরিত্যক্ত গৃহে সাক্ষাৎ হয়। জয়শীল বুঝতে পারে না, দেবশর্মা কীভাবে কখন এই বৈদ্য শিক্ষা লাভ করে। কোথা থেকেই বা শেখে। সে দেবশর্মাকে নমস্কার জানাবার ভান করে। বলল, 'বৈদ্যদেবজি, এই মঙ্গলবর্মা কি আপনার অনুচর?'

প্রশ্ন শুনে দেবশর্মা হসে বলল, মঙ্গলবৰ্মা আমার শিষ্য। এই বিদ্যা আমার কাছে শিখছে। মায়া সরোবরে যাওয়ার তার তীব্র ইচ্ছা ছিল। বর্মা, আমি সঠিক বলেছি তো?'

মঙ্গলবৰ্মা এক কাতরধ্বনি করে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে, তারপর নিজের কাঠের পাটা দেখিয়ে কিছু বলতে যাবে তখনই আকাশে পাখার ঝাপটের বেশ জোর শব্দ শোনা যায়। সকলে মাথা উঁচু করে দেখে।

তারা দেখল, বিরাটাকায় হাঁসের এক দল উড়ে চলেছে, আর সেই সাথে আকাশ পথ দিয়ে একটা রথ টেনে নিয়ে চলেছে। ওই দৃশ্য দেখামাত্র মকরকেতু, সর্পনখা এবং সর্পস্বরা দুই হাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গি করে চিৎকার করতে থাকে, 'জয়, মায়া সরোবরেশ্বরের জয়!'

রথের আরোহীরা এই চিৎকার শুনতে পায়। রথ আকাশের শূন্যে পলকের জন্য থেমে যায়, তারপর দ্রুতগতিতে জয়শীল এবং অন্যদের দিকে দ্রুত নেমে আসতে থাকে। পাশের বয়ে যাওয়া নদীতে নামে।

নদীর কিনারায় দাঁড়িয়েছিল মকরকেতু, সর্পনখ ও সর্পরা। জলের উপর রথ নেমে আসামাত্র তারা আশ্চর্য হয়ে যায়, একজন অপরজনকে বলে, 'অঙ্গরক্ষক একা রথে করে

কেন এখানে এল?' তারপর তিন জন সময় অপচয় না করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে রথের দিকে এগিয়ে যায়।

নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে রইল জয়শীল, সিদ্ধ সাধক, বৈদ্যদেব নামে পরিচিত দেবশর্মা এবং সেনাধিপতির পুত্র মঙ্গলবর্মা। জয়শীল ইশারায় দেবশর্মাকে কিছু বলে তারপর মঙ্গলবর্মাকে বলল, 'বর্মা, আমরা মোটেই চিরকালের জন্য পরস্পর শত্রু নই, আবার বন্ধুও নই। তোমাকে দেখে বোধ হচ্ছে, তুমি মায়া সরোবর ঘুরে এসেছ। আমি যা মনে করেছি, সেটা কি সত্য নয়? সেখানে কি তুমি রাজা কনকাক্ষর সন্তান কাঞ্চনমালা এবং কাঞ্চনবর্মাকে দেখেছ? তারা কেমন আছে?'

মঙ্গলবর্মা কোনো উত্তর দেওয়ার পূর্বে তার কাঠের পায়ের দিকে দেখে, তারপর দেবশর্মার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এরকম প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বৈদ্যদেবের অনুমতি চাই।'

জয়শীল তার প্রশংসা করে বলল, 'তোমার গুরুভক্তি প্রকৃতই প্রশংসনীয়। ঠিক আছে, এই প্রশ্ন তোমার গুরুকেই আমি জিজ্ঞাসা করছি।'

এরমধ্যে 'জয় মহাকাল' হুংকার দিয়ে সিদ্ধ সাধক তার বাহন নরদানবের কাঁধের উপর থেকে নেমে আসে। 'জয়শীল, এরা তো জলের পাখি। এদের সাথে কথা বলে কেন অযথা সময় নষ্ট করছ। ওখানে ওই কুমিরের মুখ-ওয়ালা, তার অনুচররা তো ওই পক্ষীরথে করে পালিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।'

'সাধক, যদি সত্যি তারা পালিয়ে যেতে চায় তবে পালাবেই। আমরা তাদের বাধা দিয়ে ধরে রাখতে পারব না। আমাদের সাথে তো তাদের দুই অনুচর থাকছে।' জয়শীল বলল।

সিদ্ধ সাধক চোখ গোল গোল করে মঙ্গলবর্মা ও দেবশর্মাকে দেখে কয়েক বার ঘাড় ঘুরিয়ে, তারপর বলে, 'এই মঙ্গলবর্মাকে পূর্ব হতেই জানি। অন্যজনকে জলমানব বলে তো মনে হচ্ছে না। মায়া সরোবরে যাওয়ার জন্য যাদের কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারি তারা ওখানে নদীতে। যদি ওরা পালিয়ে যায় রথে করে তবে মায়া সরোবর পৌঁছতে আমাদের পক্ষে বড্ড অসুবিধা হয়ে উঠবে।'

তার কথা শুনে দেবশর্মা রেগে যায়, 'সাধক, তুমি কথা বলো বেশি আর রাগ কর বেশি, কিন্তু চিন্তাভাবনা খুবই কম। একবারও কি ভেবে দেখেছ, মকরকেতু কেন এই পর্বতপ্রান্তে এসেছে? তোমাকে আর তোমার বন্ধুকে মায়া সরোবরে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এসেছে। সেখানে তোমাদের দুজনকে ভয়ংকর জলবৃক্ষ রাক্ষসদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে, তাদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে হবে।'

‘জল রাক্ষস! মহকালের সহায়তায় তাদের এই শূলের দ্বারা বধ করে জল থেকে তুলে কিনারায় ছুঁড়ে দেব। আর, জয়শীলের কাছে রয়েছে মহাকালের সেবক কালাকাল প্রদত্ত তরবারি।' সিদ্ধ সাধক বলল।

জয়শীল বোঝে যে, ওভাবে চললে কথায় কথা বাড়তে থাকবে, ঝগড়া সৃষ্টি হবে, বিপদ হতে পারে তা থেকে। সাধক জানে না যে দেবশর্মা তার বাল্যবন্ধু। তাই সে কথায় বাধা দিয়ে দেবশর্মাকে বলল, 'বৈদ্যদেবজি, আপনি কি আপনার শিষ্য মঙ্গলবর্মাকে ওই রথের কাছে পাঠাতে পারবেন, তাহলে জানতে পারবে কি আলাপাদি হচ্ছে তাদের মধ্যে?’

দেবশর্মা বুঝতে পারে জয়শীল কেন বলল। সে মঙ্গলবর্মাকে বলল, ‘শিষ্য মঙ্গল, তুমি ওই রথের কাছে যাও এবং জানার চেষ্টা কর ওই হাঁস-রথে মায়া সরোবরেশ্বর কেন নেই, পরিবর্তে তার দেহরক্ষী কেন এসেছে?’

মঙ্গলবর্‌মা মাথা নীচু করে দেবশর্মাকে প্রণাম করে জলের দিকে যায়। জলে নেমে রথের দিকে এগোতে থাকে। সে চলে গেলে জয়শীল দেবশর্মাকে জিজ্ঞাসা করে, 'শর্মা, এবার বলো, মায়া সরোবরেশ্বরের ওখানে হিরণ্যপুর হতে অপহরণ করে আনা রাজকুমার এবং রাজকুমারী কুশলে আছে তো?’

‘দু-জনেই কুশলে আছে। তারা অপহৃত হওয়ার পরে ওখানে তাদের পিতা হিরণ্যপুরের রাজা দুঃখে হতাশায় রয়েছে, আর এখানে মায়া সরোবরেশ্বর নিজেও তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত, দুঃখ বোধ করছে' দেবশর্মা বলল।

তাদের দুজনের মাঝে দাঁড়িয়েছিল সাধক। উভয়ের মধ্যে আলাপ শুনে জোরে চেঁচিয়ে ওঠে ‘জয় মহাকাল’ চিৎকারে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'জয়শীল, তোমরা কি প্রথম হতে দু-জন দুজনকে চেন? এতক্ষণ তুমি এ-কথা আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিলে কেন?’

জয়শীল তাকে খুব ধীর গলায় বলল, ‘সাধক, একটু শান্ত হও। দেবশর্মা আমার বাল্যবন্ধু। ওই নগরে ছিল, এক জুয়াড়ি। বিরাট বড়ো কাহিনি সেসব। কিন্তু, মকরকেতু যেন জানতে না পারে আমরা দু-জন বন্ধু। যদি এ-কথা সে জানতে পারে তাহলে এই মায়া সরোবরেশ্বরকে আমরা বন্দি করতে পারব না। সেই সাথে কাঞ্চনমালা ও কাঞ্চনবর্মাকেও আমরা মুক্ত করতে পারব না।'

‘সঠিক বলেছ তুমি। এবারে আমার মাথায় ঢুকল সমস্ত। সাবধানে থাকতে হবে। কিন্তু হাঁসে টানা রথ এখানে এসে নামল কেন? এ তো আমাদের কাছে একটা প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়াল। আমরা জানি না এর পিছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে। হয়তো, আমাদের দুজনের বন্ধু দেবশর্মা এই রহস্য জানবে,’ বলে সাধক অত্যন্ত খুশিমনে তাকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল।

দেবশর্মার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সেও সাধকের আন্তরিকতাকে গ্রহণ করে বলল, 'মায়া সরোবরের জলবৃক্ষ রাক্ষসদের তুমি যদি বধ করতে পার তবে মহাকালের সকল শক্তিসামর্থ্য তুমি লাভ করবে। ওই জলবৃক্ষ রাক্ষসরা তোমার আরাধ্য মহাকালের পরমশত্রু।'

'ও তাই নাকি! তাদের ধরব, ধরে এই নরদানবের খাদ্য তৈরি করব। নরদানব তুমি খেতে পারবে তো?' বলে সাধক নরদানবের কাঁধে তার শূল দিয়ে সামান্য খোঁচা দেয়।

ব্যাস, নবদানব যেন প্রাণ পায়, নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিল জলগ্রহ হাতি, তার দিকে এগিয়ে যায়। সাধক তাড়াতাড়ি সেটার হাত ধরে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও নরদানব, দাঁড়াও। আমরা এখন মকরকেতু ও তার প্রভু মায়া সরোবরেশ্বরের মিত্র। এই জল-হাতিকে তুমি তোমার বড়ো ভাইয়ের মতো মনে করো।'

সাধকের কথা শুনে দেবশর্মা হো হো করে হেসে ওঠে। তারপর তার রত্নখচিত লাঠিটি তুলে নিয়ে নদীর দিকে নিশানা করে বলল, 'মনে হচ্ছে, মায়া সরোবরের কোনো বিষয় নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদি তা না হত, তবে সরোবরেশ্বরের ওই রথ এই নদীতে নেমে আসত না।'

ওই বিষয়ে দেবশর্মা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হয় না। মকরকেতু এবং মঙ্গলবৰ্মা সেখানে আসে। দু-জনের চোখে-মুখে উদবিগ্ন ভাব। তাদের চোখে-মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কোনো অপ্রিয় ঘটনা ঘটেছে। কান্নাভরা গলায় মকরকেতু বলল, 'বৈদ্যদেব, এক ঘণ্টা পূর্বে যখন মায়া সরোবরেশ্বর তার হাঁসের রথে জলবিহার করছিলেন তাঁর সাথে ছিল কাঞ্চনমালা, তখন জলবৃক্ষ রাক্ষসেরা জলের গভীর হতে অকস্মাৎ উপরে উঠে এসে রথ আক্রমণ করে কাঞ্চনমালাকে ধরতে চায়। রথ চালক এবং অঙ্গরক্ষক ওই ভয়ানক বিপদ হতে বাঁচার জন্য রথ নিয়ে আকাশে উড়ে যায়, কিন্তু...' আর বলতে পারে না, দু-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। চোখে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

দেবশর্মা উৎকণ্ঠাভরা স্বরে জিজ্ঞাসা করে 'রথের মধ্যে বসেছিল সরোবরেশ্বর এবং কাঞ্চনমালা, তাদের কী হল?'

মকরকেতু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'খুবই অনর্থ হয়ে গেছে। হাঁসরা রথ নিয়ে যখন আকাশে উড়ছিল তখন শকুনির এক বিরাট দল ওদের উপর এসে পড়ে। হাঁসরা ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক পালাবার চেষ্টা করে, তখন রথ উলটে যায়। সরোবরেশ্বর এবং রথের চালক, রাজকুমারী নীচের মহারণ্যে কোথাও গিয়ে পড়ে।'

এ-খবর শুনে দেবশর্মা, জয়শীল, সিদ্ধ সাধক— সকলেই স্তম্ভিত হয়ে যায়। 'রাজকুমারী কাঞ্চনমালা যখন এত উঁচু থেকে পড়েছে তখন তার বেঁচে থাকার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। সাধক, এতদিন আমরা যত পরিশ্রম করেছি, সমস্ত ব্যর্থ হয়ে গেল। আমরা যে কথা দিয়েছিলাম তা রক্ষা করতে পারলাম না।' জয়শীল কোমরে ঝুলন্ত খাপ হতে তরবারি খুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে।

'তার পিতার উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেল, তা জানতে পারলে পদ্মমুখী যা কিছু করে বসতে পারে,' একথা বলে দেবশর্মা তার হাতের লাঠি মাটিতে রেখে বসে পড়ে।

সকলের উদাস চেহারা দেখে সিদ্ধ সাধক বলল তখন, 'নিরাশ হয়ে কী লাভ! হতে পারে, রথ থেকে তারা কোনো সরোবরের জলে গিয়ে পড়েছে, অথবা কোনো গাছের উপরে। তাদের অনুসন্ধানে কিছু লোককে পাঠানো হোক, আর আমি জলরাক্ষসদের বধ করে মহাকালের কাছে বলি দেবার জন্য বেরিয়ে পড়ি। মায়া সরোবর এখান থেকে কতদূর?'

সিদ্ধ সাধক তার কথা শেষ করতে পারেনি, তার মধ্যেই নদী থেকে জোর চিৎকার শোনা যায়, 'জলরাক্ষস, জলরাক্ষস।'

জয়শীল সহ সকলে সেদিকে ফিরে তাকায়। নেকড়ের মুখ-ওয়ালা কিছু রাক্ষস পাথর দিয়ে তৈরি গদা উঁচিয়ে হাঁসের রথকে ঘিরে ফেলার জন্য দ্রুত সেদিক এগিয়ে যাচ্ছে।

তেইশ

জলরাক্ষসগুলো চারদিক থেকে এসে রথটাকে ঘিরে ফেলেছে দেখে জয়শীল সতর্ক হল। সে যে তরবারিটা ফেলে দিয়েছিল সেটা কুড়িয়ে হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'এরাই কি সেই জলরাক্ষস? এদের মুণ্ডুগুলোও দেখছি ভেড়ার মতো। অথচ কী আশ্চর্য শরীরটা মানুষের!'

মকরকেতু নিজের হাতে যে অস্ত্র ছিল সেই অস্ত্র শক্ত করে ধরে নদীর দিকে দু-পা গিয়ে থেমে ডাকল, 'জয়শীল, এই জলরাক্ষসগুলো হংসরথকে ঘিরে ফেলবে। এদের এখান থেকে এক্ষুনি তাড়াতে হবে। তুমি কি আমাদের সাহায্য করবে?'

জয়শীল তরবারিটাকে খাপে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, 'আমাদের রাজা কনকাক্ষ মহারাজের ছেলে-মেয়েকে মায়া সরোবরের রাজা অপহরণ করেছে। এখন আমাকে যেকোনো ভাবে রাজার ছেলে-মেয়েকে উদ্ধার করতে হবে। তারপর তোমাদের রাজাকে একহাত দেখে নেবো। তোমাদের রাজার কপাল ভালো যে সে এই মুহূর্তে রথে নেই। আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ?'

তার এই কথা শুনে অবাক হয়ে দেবশর্মাকে বলল, 'বৈদ্যদেব, জয়শীল যে আমাদের বিরুদ্ধে এতটা শত্রুভাবাপন্ন তা আমি ভাবতে পারিনি। আপনি তো নিজের চোখে দেখলেন কনকাক্ষ রাজার ছেলে-মেয়েকে আমাদের মহান মায়া সরোবরেশ্বর কত সুখে রেখেছেন।'

দেবশর্মা বলল, 'জয়শীল, তোমাকে আমার বিশেষ অনুরোধ, খাপ থেকে আগে তরবারি বের করো। এটা মায়া সরোবরেশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার সময় নয়।' জয়শীল তৎক্ষণাৎ খাপ থেকে তরবারি বের করল। এমন সময় সিদ্ধ সাধক 'জয় মহাকাল' বলে প্রচণ্ড এক চিৎকার করে একলাফে গিয়ে নরদানবের পিঠে চেপে বসল। আর চোখের পলকে সবাইমিলে ছুটে গিয়ে জলরাক্ষসদের মোকাবিলা করল।

এতক্ষণ হংসরথের ভেতরে বসে মায়া সরোবরেশ্বরের অঙ্গরক্ষক আপ্রাণ চেষ্টা করছিল যাতে রথটা রাক্ষসদের হাতে না পড়ে। জলগ্রহের পিঠে চেপে মকরকেতুকে আসতে দেখে জলরাক্ষসগুলো ভয় পেল। ওরা যেই ভয় পেল সঙ্গেসঙ্গে জলগ্রহ ওদের এক-একটাকে শুঁড় দিয়ে ধরে তীরে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। ওদিকে জয়শীল সেই নদীর জলে সাঁতার কাটতে কাটতে সুকৌশলে তরবারির আঘাতে ওদের এক-একটাকে কচুকাটা করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল বেশ কিছু রাক্ষস মারা গেছে, অনেকগুলো আহত হয়েছে। যে রাক্ষসগুলো আহত হয়েছে ওরা না পারছে ডুবতে না পারছে ভাসতে। জলগ্রহ যাদের তীরে ছুঁড়ে ফেলেছিল তাদের প্রত্যেকটি আহত হয়েছে। মাটি থেকে ওঠার চেষ্টা করেও তারা উঠতে পারেনি। ওরা তীরেই কাতরাতে কাতরাতে আর্তনাদ করছিল।

সিদ্ধ সাধক নরদানবের পিঠে চেপে জলরাক্ষসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। নরদানব অনেক্ষণ পরে একটি জলরাক্ষসকে ধরে তীরে উঠে এল। তার পেছন পেছন মকরকেতু, সর্পনখা আর সর্পাঁরাও তীরে উঠে এল। জয়শীল কিন্তু তখনও জলেই ছিল। ওদের তীরে উঠে আসতে দেখে সে রথের ভেতর ঢুকে চিৎকার করে বলল, 'ওহে সরোবরেশ্বরের অঙ্গরক্ষক, রথটাকে তীরে নিয়ে যাও। তুমি যদি এখন তোমার রথটাকে নিয়ে নদী থেকে আকাশে ভোঁ করে উড়ে পালানোর তাল করো তাহলে কিন্তু তুমি বাঁচতে পারবে না। অতএব যা বলছি তাই করো। '
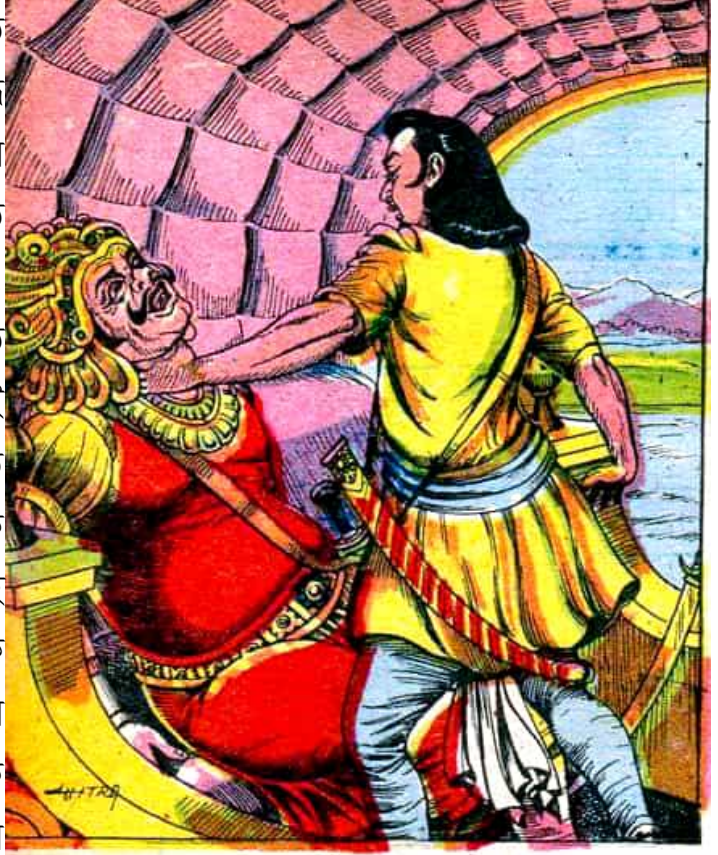
তার কথা শুনে অঙ্গরক্ষক চোখ লাল করে বলল, 'দেখ— মহাশক্তিসম্পন্ন মায়া সরোবরেশ্বরের অঙ্গরক্ষক আমি। আজ পর্যন্ত আমাকে এই ধরনের অপমানজনক কথা বলার সাহস কেউ পায়নি।'

'তাই নাকি! বেশ আমি তাহলে তোমাকে অপমান করছি। ঠিক আছে, তোমার ওপর এখন তরবারি চালাব না।' এই বলে তরবারি রেখে দিয়ে জয়শীল অঙ্গরক্ষকের গলা চেপে ধরল।

অঙ্গরক্ষক কোঁ কোঁ করে অনেক কষ্টে বলল, 'তুমি কে? তোমাকে আমি চিনি না। তবে মনে হচ্ছে তুমি খুব শক্তিশালী। আমার গলা ছেড়ে দাও।'

জয়শীল গলা ছেড়ে দিয়ে বলল, 'এখন বুঝতে পারলে তো। রথটাকে ভালোয় ভালোয় তীরে নিয়ে চল। তোমার রাজার সম্পর্কে তোমার কাছে আমাকে অনেক কিছু জানতে হবে।'

অঙ্গরক্ষক আর একটিও কথা বলল না। সে রথটাকে নদীর তীরের দিকে চালিত করল। রথটা তীরে আসার সঙ্গেসঙ্গে মহা উৎসাহে সিদ্ধ সাধক নরদানবের পিঠ থেকে নেমে দানবটি যে রাক্ষসকে ধরেছিল তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ওহে, আমার নরদানবের হাত থেকে তোমার মুক্তি নেই। পালানোর চেষ্টা করলে কোনো লাভ হবে না।' তারপর সে রথের

কাছে গিয়ে বলল, ‘জয়শীল, নরদানবকে নিয়ে। এই রথে চেপে হিমালয়ের শিখরে গিয়ে তপস্যা করার ইচ্ছা আছে। রথটা তো তেমন বড়ো নয়, আমাকে আর এই নরদানবকে বইতে পারবে তো?’ এই প্রশ্ন শুনে হেসে জয়শীল রথের ভেতরের অঙ্গরক্ষককে দেখিয়ে দিল। অঙ্গরক্ষক বলল, 'এই রথ সম্পর্কে দেখছি যে তোমাদের কোনো ধারণাই নেই। লোক ভাবে, রথটাকে বুঝি হাঁসগুলোই টানে। তা নয়। এই হাঁসগুলো বলা চলে রথের অলংকার। এই রথ স্বয়ং মায়া সরোবরেশ্বরের সৃষ্টি। এই রথ ইচ্ছা করলে যখন-তখন সাত দুগুণে চোদ্দোটা লোক নিয়ে ঘুরে আসতে পারে।'

‘সে কি! এরকম একটা রথ থেকে তোমাদের রাজা পড়ে গেল? তুমি কি তখন ঘুমোচ্ছিলে? আর আজেবাজে কথা বল না। অনেক হয়েছে। আর একটি কথা বলেছ কি এই ত্রিশূল দিয়ে তোমাকে শেষ করে ফেলব।' বলে তার দিকে তার ত্রিশূল তুলে ধরল।

জয়শীল সাধককে থামিয়ে বলল, 'সাধক, রথ থেকে শুধু সরোবরেশ্বর পড়ে যায়নি। হিরণ্যপুরের রাজা কনকাক্ষের মেয়ে কাঞ্চনমালাও পড়ে গেছে।'

মকরকেতুর চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ভাব ফুটে উঠেছে। সে বলল, জয়শীল আমরা এই রথে চড়ে আমাদের রাজাকে একটু খুঁজতে চাই। জানি না, এখন তিনি কোথায় কীভাবে আছেন।' বলে সে জয়শীলের জবাবের অপেক্ষায় রইল।

জয়শীল তার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, ‘মকরকেতু, আমাদেরও বেরুতে হবে। রাজকুমারী কাঞ্চনমালার যে কী অবস্থা হয়েছে কে জানে! তার যদি কোনো বিপদ হয়ে থাকে তাহলে সমস্ত দায়িত্ব তোমার রাজার উপর বর্তাবে। আমরা অবশ্যই বাধ্য হব, তোমাদের রাজার মুণ্ডুটা নিয়ে গিয়ে যথাযথভাবে কনকাক্ষ রাজাকে উপহার দিতে।'

এতক্ষণ দেবশর্মা চুপচাপ সব কিছু দেখছিল এবং শুনছিল। সে হঠাৎ মাথা উপরের দিকে তুলে ঝট করে বলল, 'জয়শীল, এখন আর এখানে মিছিমিছি সময় নষ্ট না করে মায়া সরোবরেশ্বর ও কাঞ্চনমালার খোঁজে আমাদের বেরিয়ে পড়া কি উচিত নয়?’

‘তা অবশ্য ঠিক বলেছ। আমরা সরোবরেশ্বরের ব্যাপারে বড়ো একটা আগ্রহী নই। আমরা উদবিগ্ন কাঞ্চনমালার জন্যে। কি বল সাধক? তুমি যদি আমার সঙ্গে একমত হও— তাহলে চল এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি।' জয়শীল বলল।

সিদ্ধ সাধক চারদিকে একবার বিজ্ঞের মতো তাকিয়ে বলল, 'এই গভীর অরণ্যে কোথায় যে কে কীভাবে পড়ে আছে তা খুঁজে বের করা কি অত সহজ ব্যাপার?’

তখন সাধকের উদ্দেশে অঙ্গরক্ষক বলল, 'আজ্ঞে, কোথা যে রাজা এবং কাঞ্চনমালা পড়ে গেছে তা আমার মনে আছে। সেখানে একটি পাহাড় আছে। আর পাহাড়ের গা ঘেঁষে

রয়েছে আকাশছোঁয়া গাছ। তারই পাশে একটু আগুন জ্বলছে— তাও লক্ষ করেছি। হয়তো কেউ আছে সেখানে। অবশ্য আগুনের চেয়ে ধোঁয়াই আমার বেশি নজরে পড়েছে।'

চমকে উঠে চোখ উজ্জ্বল করে দেবশর্মা রথের দিকে যেতে যেতে বলল, 'তাহলে তো আর কোনো সমস্যাই নেই। আমরা সহজেই সেই জায়গায় পৌঁছে যেতে পারি। এবার সবাই রথে উঠে পড়ি।'

জয়শীল বলল, 'বৈদ্যদেব, ওই রথে সকলের কী জায়গা হবে? সাধক তুমি কি তোমার ওই বাহন নরদানবের সাহায্যে আর মকরকেতুর জলগ্রহ কি আমাদের রথ অনুসরণ করে যেতে পারবে না?'

দেবশর্মা সকলের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'যাদের বাহন আছে তারা অবশ্যই বাহনে যাবে। অন্যেরা রথে যাবে। কি বল সিদ্ধ সাধক, কি হে মকরকেতু, তোমরা রাজি তো?'

মকরকেতু সাধকের দিকে তাকাল। সাধক দাঁত কটমট করতে করতে মকরকেতুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি তোমাদের অনুসরণ করতে চেষ্টা করব। তবে একটি কথা আগে থেকেই বলে রাখি, এই মকরকেতু পথে যদি আমার কোনো ক্ষতি করতে চায় তাহলে কিন্তু একে আমি নরদানবের পেটে চালান করে দেব।'

'সাধক এখন কারও বিরুদ্ধে রাগ করার সময় নয়। এখন আমরা সবাই পরস্পরের বন্ধু।' মকরকেতু এমনভাবে কথাগুলো বলল যেন এই জীবনে সে কোনোরকম অপরাধ করেনি।

'ভালো ভালো কথা শুনতে ভালোই লাগে। যতদিন না আমরা কাঞ্চনমালা ও কাঞ্চনবর্মাকে জ্যান্ত অবস্থায় পাচ্ছি ততদিন আমরা কাউকে বিশ্বাস করতে পারব না। মুখে তুমি যতই বন্ধু বল না কেন মনে মনে আমি কিন্তু তোমাদের শত্রু হিসেবেই গণ্য করব।'

তারপর সাধক ও মকরকেতু বাদে সকলেই হংসরথে উঠল। শেষবারের মতো অঙ্গরক্ষক ওদের বলে দিল, 'তোমরা মনে রেখ বিরাট পাহাড়ের পাশে আকাশছোঁয়া বিরাট গাছ আছে আর তারই মাঝখানে এক জায়গায় ! মকরকেতু মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল যে সে সব কথাই বুঝতে পেরেছে।

নরদানব যে জলরাক্ষসকে ধরে রেখেছিল সেই রাক্ষস সাধককে বলল, 'হে মহাবীর, এবার থেকে আমি মনে-প্রাণে তোমাদের সেবা করতে চাই। হে সাধক, আমাকে তোমার সেবা করার সুযোগ দিয়ে এ জীবন ধন্য কর। সাধক তার কথা শুনে খুশি হয়ে বলল, 'ওহে জলরাক্ষস, এখন আমরা একজায়গায় যাচ্ছি। নরদানবের গতি বড়ো তীব্র। তুমি কি পারবে এই নরদানবকে অনুসরণ করতে?'

'আজ্ঞে আমার পাখির মতো ডানা নেই বটে, তবে আমি মাটির ওপর অতি দ্রুত হাঁটতে পারি। আকাশে পাখির গতি যত মাটিতে আমার গতিও প্রায় তত।' নম্রভাবে বলল জলরাক্ষস।

'বা বা! দারুণ কথা বলেছ তো।' বলে সাধক জলরাক্ষসের পিঠ চাপড়াল।

নরদানবের ঘাড়ে চেপে সাধক বেরোতে যাবে এমন সময় বেঁটেদের সেনাবাহিনীর লোকজন এল। ওদের দেখে চমকে উঠে, সাধক বলল, 'আরে, তোমরা এখানে চলে এসেছ, কী ব্যাপার?'

বেঁটেদের সেনানায়ক বলল, 'হে সাধক, এখানে যা ঘটেছে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমরা তা লক্ষ করেছি। যেসব জলরাক্ষস আহত হয়ে পড়ে আছে তাদের কি ওইভাবে ফেলে রেখে যাওয়া উচিত হবে? অনুমতি পেলে ওদের আমরা সারিয়ে তুলতে পারি।'

'ভালো ভালো—খুব ভালো কথাই বলেছ। তবে সেরে উঠে ওরা যদি তোমাদের আক্রমণ করে তখন কী করবে?' বলল সাধক।

সাধকের কথা শেষ হতে-না-হতেই বেঁটেদের সেনাপতি অরণ্যের এক কোণের দিকে দেখিয়ে বলল, 'কী হচ্ছে ওখানে? অত সাদা ধোঁয়া উঠছে কোত্থেকে? অরণ্যে কি আগুন ধরে গেছে? এবার কি অরণ্য পুড়ে ছাই হয়ে যাবে?'

'না, না— অরণ্যে আগুন ধরেনি। মায়া সরোবরেশ্বর নামে এক দুরাত্মার শরীর পড়ছে। নরদানব, ওই যেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে সেখানে ঝড়ের বেগে চল।' লাফ মেরে নরদানবের পিঠে বসতে বসতে ব্যস্তভাবে সাধক বলল।

নরদানব প্রচণ্ড গতিতে যেখানে ধোঁয়া উঠছিল সেদিকে গেল। তাকে অনুসরণ করল জলরাক্ষস এবং জলগ্রহের পিঠে চেপে মকরকেতু।

চব্বিশ

হংসরথের মুখটা যখন নীচের দিকে টলে গেল তখন তার ভেতর থেকে মায়া সরোবরেশ্বর ও কাঞ্চনমালা সহ রথের চালক অরণ্যের এক-এক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে গেল। ওভাবে পড়ে যাওয়ায় মায়া সরোবরেশ্বর খুবই অবাক হয়ে গেল। তার এ ধরণের অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

মায়া সরোবরেশ্বর হংসরথ থেকে যেখানে পড়ল ঠিক সেখানেই দল বেঁধে থাকত মানুষখেকো একধরণের মানুষ। টানা এক হপ্তা ওরা কোনো জন্তু শিকার করতে পারেনি। কয়েক দিন আগে একদল বাঘ কোত্থেকে এসে ওই অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে অনেকগুলো পশু খেয়ে চলে গিয়েছিল। বিশেষ করে একটা হরিণও ওরা জ্যান্ত রাখেনি। ওদের গর্জন শুনে

অরণ্যের জন্তুগুলো প্রাণপণে ছুটে পালাল। সেই যে পালাল আর তারা ফিরল না। ফলে অরণ্যের ওই প্রান্ত জন্তুদের অভাবে যেন খাঁ-খাঁ করছিল।

মানুষখেকোদের নেতার নাম ছিল বেব্বো। না খেতে পেয়ে কয়েক জন পালানোর তাল করছে বলে তার কানে গেল। খেতে না পাওয়ায় তারও যে খুব একটা ভালো লাগছিল তা নয়, তবু পূর্বপুরুষরা তার ঘাড়ে যে দায়িত্ব চাপিয়ে গেছে তা সে পালন করতে চায়। সে যদি সেখান থেকে চলে যায়, সেখানে পাথরের তৈরি মন্দিরের ভেতরে যে অরণ্যদেবতা আছে সেই দেবতার সামনে বছরে একবার অন্তত নরবলি না দেওয়া হয় তাহলে তো পাপ হবে। সে চলে গেলে কে এসব করবে?

বেব্বো এই ধরনের কথা ভাবতে ভাবতে ঠিক করল যেকোনোভাবে এমন একটা ব্যবস্থা করবে যাতে তার জাতভাইরা কেউ সেখান থেকে পালাতে না পারে। সে সোজা ওই মন্দিরের দিকে গেল।

মন্দিরের অবস্থা শোচনীয় ছিল। মন্দিরের দরজা জানালা ছিল না। ফলে প্রচণ্ড গরমে, বৃষ্টির সময় এবং ভয়ংকর শীতের সময় জন্তুজানোয়ার ওই মন্দিরের ভেতরে আশ্রয় নিত। দিনে না হোক রাত্রে তো জন্তুজানোয়ার থাকবেই।

সেদিন সূর্যোদয়ের সময় বেব্বো মন্দিরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। একটা মস্তবড়ো পাহাড়ি পাখি, অরণ্যদেবতার সামনে একটি হরিণকে ধরে বসে আছে। তার গলায় জড়িয়ে রয়েছে হরিণের শিং। একে অন্যের কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য, অথবা একে অন্যকে শেষ করার জন্য ভীষণ চেষ্টা করছে যেন।

এই দৃশ্য দেখে বেব্বো ভয়ে পালাতে গিয়েও হঠাৎ কী যেন ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল। অরণ্যদেবতাকে উদ্দেশ্য করে সে ওই দেববিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'হে অরণ্যদেবতা, তুমি মহান! আমার গ্রামবাসী, তোমার ভক্তেরা আজ এক হপ্তা উপোস করে বসে আছে। অথচ তোমার সামনে এত খাদ্য। তুমি আমাকে নির্দেশ কর, আমি এখন কী করব?'

এমন সময় দেওয়ালের এক ফাঁক দিয়ে একটি বুনো বিড়াল বেরিয়ে এসে ম্যাঁও ম্যাঁও করতে লাগল।

'এটা নিশ্চয় কিছু বলছে। কী যে বলছে তা আমাদের বুড়ো পুরুত ঠাকুর বলতে পারবে।' মনে মনে বলে বেব্বো মন্দিরের বাইরে এসে চিৎকার করে জাতভাইদের ডাকল। ডাক শুনে জাতভাইরা সবাই ছুটে এল।

বেব্বোর লোকজন সেইসময় বনে-বাদাড়ে গাছ পাতা যা পাচ্ছিল তাই খাচ্ছিল। ওদের আসার পর বেব্বো ওদের উদ্দেশ্যে বলল, 'অরণ্যদেবতা আমাদের দিকে মুখ তুলে

তাকিয়েছেন। কোথায় আমাদের বুড়ো পুরুত ঠাকুর?'

বেব্বোর কথা শুনে ওরা ভাবল, দেবতা বুঝি মন্দিরের ভেতরে অসংখ্য হরিণ অথবা অন্য কোনো জন্তু লুকিয়ে রেখেছে। দেবতা খুশি হয়ে এখন সেগুলো বের করে দিচ্ছে। ওদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'বেব্বো, অরণ্যদেবতা ক-টা হরিণ দিচ্ছে?'

নিজের প্রশ্নের জবাব না পেয়ে বেব্বো বিরক্ত হয়ে ওদের বলল, 'ওরে আমি যা বলেছি তোরা আগে সেটা শুনবি তো। আমি জানতে চাই, বুড়ো পুরুত ঠাকুর কোথায়? তাকে না পেলে কোনো কাজ করা যাবে না। আমার কথার জবাব না দিয়ে তোমাদের যার যা মুখে আসছে তাই বলছ। অরণ্যদেবতার সামনে দাঁড়িয়ে আমি যা দেখেছি, যা শুনেছি তার অর্থ যে কী তা একমাত্র পুরুত ঠাকুর বলতে পারে। তোমরা এক্ষুনি তাকে যেখান থেকে পার ডেকে নিয়ে এসো। না থাক। খবর দাও, আমি যাব।'

পুরুত ঠাকুর একটা গাছের নীচে হেলান দিয়ে বসে ঝিমোচ্ছিল। তাকে দেখেই ওরা ছুটে গিয়ে খবর দিল। শুনেই বেব্বো পুরুত ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলল সমস্ত ব্যাপার। শুনে পুরুত ঠাকুর চুপ করে রইল। তার ওইভাবে থাকাতে বেব্বো মনে মনে বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওহে পুরুত ঠাকুর, আমি যা দেখেছি, যা শুনেছি তাতে কি আমরা এই আশা করতে পারি যে অরণ্যদেবতা কোনো-না-কোনো জন্তুজানোয়ার আমাদের খাওয়ার জন্য এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন?'

পুরুত ঠাকুরের ঝিমোনি যেন তখনও কাটেনি। কোনো কথা বলার আগ্রহ যেন তখনও ছিল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'পুরুত ঠাকুর হিসেবে তো আমার চুল পেকে ঝরে গেল। আজ পর্যন্ত অরণ্যদেবতা কোনো কথাই তো পরিষ্কার বলেননি। তবে তুমি যা দেখেছ, যা শুনেছ তার অর্থ হল এই যে দেবতা আমাদের বলে দিচ্ছেন জন্তুজানোয়ার যখন পাবে না তখন অন্য অরণ্যবাসীদের মতো, চাল ফুটিয়ে ভাত খাবে, ফল-মূল খাবে। এসব খেয়ে বাঁচার চেষ্টা করবে। বাঁচতে হলে এসব খেতে হবে।'

পুরুত ঠাকুরের কথা শেষ হতে-না-হতেই বিরক্ত হয়ে বেব্বো একটা লোকের হাত থেকে ছড়ি কেড়ে নিয়ে বুড়োকে শাসিয়ে বলল, 'ওরে পাজি বুড়ো, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তুমি কি জানো না যে মাংস ছাড়া আমাদের আর কিছু খেতে নেই?' বলে বুড়োর পিঠে এক ঘা বসিয়ে দিল।

ঘা পড়তেই পুরুত ঠাকুরের যেন ঝিমুনি কেটে গেল। সে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'হে অরণ্যদেব, এখনও তুমি আছ? ওরে বেব্বো, কী যেন বলছিলি বল। তোমার ঘা খেয়ে আমার মাথা খুলেছে। এতক্ষণ খিদের জ্বালায় কথা বলতে পারছিলাম না।' বলে এক লাফে একটি গাছের ডাল ধরে বানরের মতো ঝুলতে লাগল।

বেব্বোর নির্দেশে দু-তিন জন বুড়োকে ধরে গাছ থেকে নামাল। তারপর বেব্বো মন্দিরের ভেতরের ঘটনা আবার বুড়োকে প্রথম থেকে বলল।

এবার পুরুত ঠাকুর সব কথা কান পেতে শুনে বুড়ো মাথা ওপরের দিকে তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ নুয়ে একমুঠো মাটি তুলে নিয়ে মন্ত্র পড়ে সেখানে যত জন ছিল প্রত্যেকের মাথায় ছড়িয়ে দিল। তারপর সবাইকে শুনিয়ে চিৎকার করে সে বলল, 'এখানে গাছপালা যা আছে তোমরা তাড়াতাড়ি নিয়ে এসে আগুন জ্বালো। বিরাট একপাত্র জল গরম কর। ওই মন্দিরে ঢুকে সেখানে যে পাহাড়ি পাখি, হরিণ এবং বুনো বিড়াল আছে সব ধরে নিয়ে এসো।'

বেব্বো বলল, 'এখনও কি ওই মন্দিরের ভেতরে বুনো বিড়াল বসে আছে? তবে পাহাড়ি পাখি আর হরিণ দুটোই হয়তো এতক্ষণে মরে গেছে। যা হোক— ওই দুটোকে আনছি।'

তার কথা শুনে বুড়ো চোখ পাকিয়ে বলল, 'বুনো বিড়ালটাকে না পাওয়া গেলে সেটা যে-পাথরের উপরে বসেছিল সেই পাথরটা আনতেই হবে। সেই পাথরটাকে গরম জলে চোবাতে হবে।'

'অরণ্যদেবতা হঠাৎ পাহাড়ি পাখি, হরিণ, বুনো বিড়াল এসব আমার চোখের সামনে তুলে ধরলেন কেন? আমরা কি দু-একদিনের মধ্যে অনেকগুলো জন্তুজানোয়ার পাব?' বেব্বো বলল।

এই প্রশ্ন শুনে পুরুত ঠাকুর হঠাৎ চিৎকার করতে করতে দু-তিন বার লাফাল। তারপর দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ টলতে লাগল। তাকে দেখে মনে হল কেউ তার উপর ভর করছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বুড়ো বড়ো বড়ো চোখ করে বলল, 'তোমরা চেন আমাকে? আমি হলাম অরণ্যদেবতা। আমি যদি দয়া করি শুধু জন্তুর মাংস নয়, মানুষের মাংসও পাইয়ে দিতে পারি তা জানো? এখন যাও, এখান থেকে সরে পড়। যাও বলছি।'

পরক্ষণেই একটা মস্তবড়ো উনুন বানিয়ে বিরাট আয়তনের একটি জলের পাত্র সেই উনুনের উপর বসানো হল। সবাই মহা উৎসাহে উনুনে কাঠ জোগাতে লাগল। দাউদাউ করে উনুন জ্বলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা অঞ্চলের রূপ বদলে গেল। আকাশে আগুন ও সাদা ধোঁয়া দেখা গেল।

ঠিক এমন সময় মায়া সরোবরেশ্বর যে রথে ছিল সেই রথটি একপাল শকুন ঘিরে ফেলল। শকুনগুলো হংসরথের সামনের দিকে বসতেই হংসরথ সামনের দিকে ঝুলে পড়ল। অঙ্গরক্ষক রথের এককোণে ধরে ঝুলতে লাগল। রথের চালক, কনকাক্ষ রাজার মেয়ে এবং মায়া সরোবরেশ্বর রথ থেকে গড়াতে গড়াতে বিভিন্ন জায়গায় পড়ে গেল।

আগুন লাগে যেখানে ঝড় বয়ে যায় সেখানে। অত বড়ো উনুনে যে আগুন জ্বলছিল তার ফলে ঝড় উঠেছিল। ওই ঝড়ের তোড়ে এক-এক জন এক-এক দিকে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে গেল।

আকাশ থেকে মানুষকে পড়তে দেখে বুড়ো চিৎকার করে বলল, 'খিদের জ্বালায় আমরা যে মরে যাচ্ছি তা অরণ্যদেবতা টের পেয়েছেন। তিনি মানুষকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন আমাদের খাওয়ার জন্য। মানুষ, পাহড়ি পাখি, হরিণ এবং বুনো বিড়াল প্রভৃতিকে প্রথমে অরণ্যদেবতার কাছে নৈবেদ্য হিসাবে রাখতে হবে। তারপর আমরা অনেক মাংস পাব।'

বুড়োর কথা শুনে প্রত্যেকে মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকাল। হংসরথ থেকে মায়া সরোবরেশ্বরকে পড়তে দেখল। মায়া সরোবরেশ্বর জলে পড়ে উপরে উঠে চারদিকে তাকিয়ে ভীষণ ভয় পেল। বুড়ো পুরুত হাসতে হাসতে তার কাছে এসে বলল, 'অরণ্যদেবতা বেছে বেছে বেশ স্বাস্থ্যবানকেই পাঠিয়েছেন। রথ থেকে সোজা জলের পাত্রেই ফেলেছেন। ভাগ্যিস জলটা এখনও বেশি গরম হয়নি। হলে তো এতক্ষণে মরে যেত।'

পুরুতের কথা শুনে মায়া সরোবরেশ্বর পরিষ্কার বুঝতে পারল কাদের হাতে সে পড়েছে। এখন কি যে করবে তা সে ভেবে পেল না। বিরাট অঞ্চল যার অধীনে, যত সময় যাচ্ছিল, তত তার মনে ভয় বাড়ছিল। জলে পড়ার সময় জলটা সামান্য গরম ছিল বটে কিন্তু এখন বেশ গরম হয়ে গেছে। এতক্ষণে সে বুঝতে পারল সে যে জলে নেমেছে সেটা ডোবার জল নয়, একটি পাত্রের জল। এবং ওই পাত্রের নীচে উনুন আছে।

মায়া সরোবরেশ্বর জলের পাত্র থেকে উপরে উঠে আসার চেষ্টা করতেই বুড়ো পুরুত জ্বলন্ত কাঠ এনে তাকে শাসিয়ে বলল, 'ওহে শোনো, তুমি এমনি আসনি। অরণ্যদেবতার ইচ্ছায় তুমি এখানে এসেছ। এই যে জলের পাত্রে পড়েছ এও তাঁরই ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছা

ছাড়া এখানে কিছু হয় না। এখন তুমি যদি ছটফট কর, জল থেকে উঠে আসতে চাও তাহলে কিন্তু আগুনে পুড়ে যাবে। আগুনে পুড়ে মরবে। খুব সাবধান!'

তার কথা শুনে মায়া সরোবরেশ্বর পরিষ্কার বুঝতে পারল তার মৃত্যু অবধারিত। সে মনে মনে ঠিক করল, গরম জলে তিলে তিলে পুড়ে মরবে না। যেকোনোভাবে ওই জলপাত্র থেকে সে উঠে আসবে। কিন্তু কীভাবে যে উঠে আসবে তা কিছুক্ষণ ভাবতেই তার মাথায় একটি বুদ্ধি এল। সে পুরুতকে ইশারায় কাছে ডেকে ফিসফিস করে বলল, 'তুমিই তো অরণ্যদেবতার পুরুত, তোমাকে একটি গোপন কথা বলছি শোনো। শুধু আমাকে নয়, তোমাদের দেবতা আকাশপথে আরও তিন জনকে পাঠিয়েছেন।'

পুরুত তার কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, 'ওরা কোথায়? ওরা তোমার সঙ্গে পড়েনি কেন?'

'ওরা ওইদিকে পড়েছে। এই সামনে গিয়ে ডাইনে বেঁকে। অত কেন, তোমরা আমাকে নিয়ে গেলেই তো পার। আমি চটপট ওদের খুঁজে বের করতে পারতাম।' মায়া সরোবরেশ্বর বলল।

এই কথা পুরুত ঠাকুরের বিশ্বাস হল। সে মায়া সরোবরেশ্বরকে তাড়াতাড়ি গরম জল থেকে তুলে বেঝোর কাছে খবর পাঠাল। তারপর চার জনকে সঙ্গে নিয়ে মায়া সরোবরেশ্বরের সঙ্গে অরণ্যের অন্য প্রান্তের দিকে পা বাড়াল।

সূর্যাস্ত পর্যন্ত ওরা খুঁজল। কিন্তু কোথাও অন্যদের পাওয়া গেল না। একটি গাছের নীচে মল পাওয়া গেল। মল দেখে মায়া সরোবরেশ্বর বুঝতে পারল যে সেগুলো রথের চালকের। রথচালক গাছের উপরে থাকবে ভেবে সে গাছের উপরে চোখ ফেরাল। তারপর সে ওদের বলল, 'আমার ধারণা, এই গাছের ওপরেই রথচালক পড়েছে।' সকলে গাছের ওপরের দিকে তাকাল। ওদের নজরে পড়ল হংসরথ।

ঠিক সেইসময়ে একরাশ ধোঁওয়া দেখে সিদ্ধ সাধক, মকরকেতু মানুষখেকোদের আস্তানার দিকে আসছিল। সিদ্ধ সাধক নিজের যোগ্য বাহন নরদানবকে আরও তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য হেঁকে চিৎকার করে উঠল, 'জয় মহাকাল!' তার গর্জন শুনে গাছের পাতাগুলো যেন নড়ে উঠল। মায়া সরোবরেশ্বর তো বটেই, এমনকী তার সঙ্গের মানুষখেকোরাও ভয়ে কাঁপতে লাগল।

পঁচিশ

সিদ্ধ সাধক 'জয় মহাকাল' বলে চিৎকার করে উঠেছিল। সেই চিৎকার শুনে মায়া সরোবরেশ্বর ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে চারিদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগল।

তার ভাবগতিক দেখে নরখাদকদের পূজারি খুব আশ্চর্যান্বিত হল। পূজারির সঙ্গে যে দু-চার জন জংলি নরখাদক ছিল তারা যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল সেদিকে এগিয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ মায়া সরোবরেশ্বর পূজারিকে বলল, 'তোমার লোকজন যেদিকে এগোচ্ছে সেদিকে এগোনো নিরাপদ নয়। কারণ যে লোকটা চিৎকার করে উঠছে সে মহাকালের ভক্ত। ওর মন্ত্রশক্তির কাছে তোমাদের ক্ষমতা নেই দাঁড়াবার।'

তার কথা শুনে পূজারি হো-হো করে হেসে বলল, 'শোনো হে, আমরা নরখাদক ওসব মন্ত্রতন্ত্রে আমরা ভয় মোটেই পাই না। তোমার ওই মহাকালের ভক্ত আসছে শুনে আমাদের আনন্দ বেড়ে গেছে। আমরা আর একটি মানুষকে মহানন্দে খেতে পাব। অরণ্যদেবতার অশেষ করুণা যে আমরা খাওয়ার জন্য আর একটি তরতাজা নাদুসনুদুস মানুষকে পেলাম।' পূজারির কথা শুনে ভয়ে সরোবরেশ্বরের হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাবার উপক্রম। বলে কি! এরা দেখছি বাঘের চাইতেও হিংস্র। মায়া সরোবরেশ্বর যে কি করে কি করবে ভেবে ভেবে কূল পেল না।

কিন্তু পূজারির কথা শেষ হতে-না-হতেই যে চার জন এগিয়ে গিয়েছিল তাদের আর্তনাদ শোনা গেল। পরক্ষণেই ওরা পূজারির কাছে এসে আছড়ে পড়ে বলল, 'ঠাকুরমশাই, আমরা আর বাঁচব না। হাতির মতো একটা বড়ো নরদানবের পিঠে বসে যমের মতো একটা লোক হুংকার দিতে দিতে এগিয়ে আসছে।'

ওদের কথা শুনে ময়া সরোবরেশ্বর এবং পূজারি ভয়ে কাঁপতে লাগল। দেখতে দেখতে নরদানবের পিঠে চেপে তীব্রগতিতে সিদ্ধ সাধককে ওরা আসতে দেখল।

সেই দৃশ্য দেখে বুড়ো পূজারি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'ওহে, এবার পালাতে হবে। কেউ একজন ছুটে গিয়ে খবর দাও। মনে হচ্ছে, এ যদি আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের বংশে বাতি দিতে কেউ আর থাকবে না।'

মায়া সরোবরেশ্বর আর পূজারির দাঁতে দাঁতে কত্তাল বাজতে লাগল। দু-জনেরই একবার একছুটে পালাবার মতলব হল। কিন্তু পালাতে গিয়ে কেউই পায়ে এতটুকু জোর পেল না। দু-জনেরই তখন একেবারে কাঁদো কাঁদো অবস্থা।

ততক্ষণে সিদ্ধ সাধক আরও কাছে এসে চিৎকার করে বলল, 'জয় মহাকাল! ওহে শোনো, কেউ পালাবে না। সবাই শোনো। তোমরা কে বল? কাঞ্চনমালা নামে এক রাজকুমারী হংসরথ থেকে তোমাদের এই জায়গায় কোথাও পড়েছে। তোমরা যদি কেউ দেখে থাক তো এখুনি বল। তা না হলে তোমাদের পরিণাম ভয়ংকর হবে এ-কথা জেনে রাখ।'

সিদ্ধ সাধকের কথা পূজারি অথবা তার সঙ্গী কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারল না। পূজারি এদিক-ওদিক তাকিয়ে লক্ষ করল, মায়া সরোবরেশ্বর গাছের আড়ালে গিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে। তৎক্ষণাৎ সে সাধককে বলল, 'এই লোকটাই ওপর থেকে আস্তানায় পড়েছে। এ ছাড়া আর কেউ ওপর থেকে পড়েনি। তবে তোমার ইচ্ছে হলে ওকে জিজ্ঞেস করে সব কথা জানতে পার।'

এতক্ষণ সিদ্ধ সাধক মায়া সরোবরেশ্বরকে দেখতে পায়নি। গাছের আড়ালে তাকে দেখতে পেয়ে সাধক পরিহাস করে বলল, 'ওরে ব্যাটা, তুই এখানে লুকোচ্ছিস? তোর সাজপোশাক দেখে মনে হচ্ছে তুই-ই মায়া সারোবরেশ্বর। তা হ্যাঁরে ব্যাটা, পালাচ্ছিস কেন? সাবধান! চোরের মতো পালানোর চেষ্টা করিসনি, একেবারে বেঘোরে মারা পড়বি।'

সাধকের কথা শুনে মায়া সরোবরেশ্বর ভীষণ রেগে গেল। হঠাৎ তার মনে হল— সেও তো একটা রাজ্যের রাজা বটে। এ লোকটা আর যা হোক রাজা তো নয়। রাজার সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয় সে এই বদমাইসটাকে শিখিয়ে দেবে। সে ক্ষুব্ধ হয়ে তরবারির বাঁটে হাত দিল। তারপর সোজা দাঁড়িয়ে বলল, 'ওহে, আমাকে তুমি ঠিকই চিনতে পেরেছ, তবে তোমার সাজপোশাক দেখে আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না যে তুমি কে। তা— তুমি যেই হও জেনে রাখ, আমার তরবারির সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা কারোর নেই।'

'আমি হলাম সিদ্ধ সাধক, মহাকালের ভক্ত। তোমার সঙ্গে মোকাবিলা করার ইচ্ছা আমার নেই। আমার অধীনে যারা আছে তারাই তোমার মোকাবিলা করতে পারবে। কাঞ্চনমালাকে খুঁজে বের করতে আমি তাদের আশেপাশে পাঠাচ্ছি।' এই কথা বলে সাধক চিৎকার করে উঠল, 'কইরে জলরাক্ষস, তোদের শত্রু মায়া সরোবরেশ্বর এখানে আছে। শীঘ্র চলে আয়। তোরা যা করার কর এসে। এ ব্যাটা দেখছি খুব তড়পাচ্ছে।'

তার চিৎকার শুনে জলরাক্ষস চিৎকার করতে করতে আসতে লাগল। আসতে আসতে সে বলছিল, 'কই, কোথায় সে ব্যাটা? আজই ওকে শেষ করে ফেলব।'

জলরাক্ষসের চিৎকার শেষ হতে-না-হতেই মকরকেতু জলগ্রহের উপর চেপে সেখানে পৌঁছে গেল। সে ওই রাক্ষসের পথ আগলে দাঁড়াল। জলগ্রহ ভয়ংকর আওয়াজ করে শুঁড় ওপরের দিকে তুলে আবার নামিয়ে জলরাক্ষসকে ধরতে গেল। এমন সময় সুযোগ বুঝে মকরকেতু জলরাক্ষসের মাথায় আঘাত করল। 'ওরে জলরাক্ষস, তোকে এখনই পরলোকে পাঠাচ্ছি, দাঁড়া।' এই কথা বলে তরবারি দিয়ে এক কোপে তার গলা কাটতে গেল। কিন্তু ঝট করে জলরাক্ষস একপাশে সরে যাওয়ায় তরবারির আঘাত জলরাক্ষসের গলায় না পড়ে, পড়ল গিয়ে তার কাঁধে।

আড়াল থেকে সাধক এই দৃশ্য দেখে নরদানবকে নিয়ে সে একটা কিছু করার জন্য প্রস্তুত হতে তার চোখে যা পড়ল তাতে সে অবাক হল। সে দেখতে পেল প্রত্যেকটা গাছের আড়ালে নরখাদকরা দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে ওদের নেতা বেব্বো চিৎকার করে পূজারিকে বলল, 'ওহে পূজারি, আজ তো আমাদের বড়ো আনন্দের দিন। অরণ্যদেবতা আজ এতগুলো মানুষকে আমাদের ভোজ খাওয়ার জন্য দয়া করে পাঠিয়েছেন।'

নেতার কথা শুনে নরখাদকরা আনন্দে নাচানাচি করতে লাগল। চারদিকের অবস্থা দেখে সিদ্ধ সাধক ভাবল, যেকোনো মুহূর্তে তার বিপদ হলেও হতে পারে। তাই সে তৎক্ষণাৎ নরদানবকে মকরকেতু যেখানে ছিল সেইদিকে অতি দ্রুত যাওয়ার নির্দেশ দিল।

এদিকে মকরকেতু জলগ্রহের পিঠ চাপড়ে সেটাকে মায়া সরোবরেশ্বরের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, 'হে মায়া সরোবরেশ্বর! আপনি দয়া করে এই জলগ্রহের পিঠে বসুন। এই সিদ্ধ সাধক যথেষ্ট লম্ফঝম্ফ করে বটে, আসলে খুব একটা ক্ষতিকারক নয়। একে তত ভয় করার কিছু নেই। তা ছাড়া এর যে বন্ধু জয়শীল সে আসলে যেকোনো বিপদগ্রস্তের বন্ধু। কাজেই এদের কাউকে তেমন একটা ভয় করার কিচ্ছু নেই। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই জয়শীল আমাদের বৈদ্যদেবকে নিয়ে হংসরথে চেপে এদিকে আসবে।'

মায়া সরোবরেশ্বর তো জানত না ওই হংসরথ কোথায় পড়ল, কীভাবে পড়ল, তাই তার কাছে মকরকেতুর কথা অস্পষ্ট লাগল। তবু সে বুঝতে পারল যে এভাবে থাকার চাইতে জলগ্রহের পিঠে চেপে বসে থাকা নিরাপদ। এদিকে জলরাক্ষস আঘাত পেয়ে অতিকষ্টে সাধককে বলল, 'আমি কি এখন যেতে পারি?'

সাধক তাকে বলল, 'দেখ তুমি এমন কিছু আঘাত পাওনি। তোমার যাওয়ার সময় এখনও হয়নি। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে।' বলে মকরকেতুর দিকে তাকিয়ে সাধক বলল, 'ওহে মকরকেতু, এখন তুমি বলতে পার, কে কার ক্ষতি করতে পারে? অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শত্রু মিত্র হয়, মিত্র শত্রু হয়। এই নরখাদকরা ভাবছে আমাদের সবাইকে ওদের দেবতা খাদ্য হিসাবে ওদের কাছে পাঠিয়েছে। আমাদের এখন প্রথম কর্তব্য হবে এদের খপ্পর থেকে মুক্ত হওয়া।'

তার বক্তব্য শুনে মকরকেতু তরবারির খাপে হাত দিয়ে এমন ভাব করল যেন সে যেকোনো রকমের ভয়ংকর অবস্থার মোকাবিলার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত।

তার মনোবল দেখে সাধক বলল, 'কেতু, তোমার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না। আমরা কোনোদিন ভাবতে পারিনি যে কনকাক্ষ রাজার হাতে তার ছেলে-মেয়েদের তুলে দেওয়ার আগে এই ধরনের নরখাদকদের হাতে পড়ব। আমরা প্রথমে এদের বোঝানোর

চেষ্টা করব। তবে ভালো কথায় যদি কাজ না হয়, আমাদের যদি এরা ক্ষতি করতে চায়, তখন বাধ্য হয়ে আমাদের এদের ওপরে, প্রচণ্ড আক্রমণ চালাতে হবে। তখন আর আমাদের এদের মধ্যে কে মেয়ে কে পুরুষ, কে বাচ্চা কে বুড়ো এসব দেখা মোটেই চলবে না। বুঝেছ আমার কথা?'

এতক্ষণ নরখাদকদের পূজারি এমন ভাব করেছিল যেন ভালো করে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। এখন সে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে বলল, 'ওহে বেকুবগুলো, আমাদের প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। তোমরা আর এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। ঢের হয়েছে, আর নয়, এবার চল অরণ্যদেবতার মন্দিরে। আগে দেবতার ভোগে দিয়ে তারপর আমরা দেবতার প্রসাদ খেয়ে থাকি।

ওদের কথায় একটুও না ঘাবড়ে সাধক ত্রিশূল তুলে ওই পূজারিকে বলল, 'ওহে, তোমরা ভুল করছ। আমরা কেউ তোমাদের আহার নই। তোমাদের খাদ্য হওয়ার জন্য আমাদের কেউ পাঠায়নি। আমাদের লোক হংসরথ থেকে পড়ে গেছে এই অরণ্যে। তাদের খুঁজে বের করার জন্য আমরা এসেছি। যাকে আমাদের প্রথমেই দরকার ছিল তাকে পেয়ে গেছি। সে হল এই ধূর্তশিরোমণি মায়া সরোবরেশ্বর। এখন আমরা নিজেদের পথে চলে যাচ্ছি। আমাদের এখন অনেক কাজ, তোমরা এখন তোমাদের কাজে চলে যাও।'

'বা! আমরা আমাদের খিদে মেটাবো কী করে? আমরা আজ বহুদিন ধরে কিচ্ছুটি না খেয়ে আছি।' ওদের নেতা বেব্বো সাধককে বলল।

পূজারি বলল, 'আমরা যে পাত্রে জল ফোটাচ্ছিলাম অরণ্যদেবতা ঠিক সেই পাত্রে একটি মানুষকে নাবালো। এ নির্ঘাত আমাদের খাওয়ার জন্য।'

তার কথা শেষ হওয়ার পর সাধকের ভীষণ রাগ হল। তার নির্দেশে নরদানব বেব্বোকে দু-হাতে তুলে ওপরের দিকে সোজা তুলে ফেলল। অন্য দিক দিয়ে জলগ্রহ এগিয়ে এসে পূজারিকে কোমরে শুঁড় দিয়ে কষে লাগালো এক হ্যাঁচকা টান।

বেব্বো শুনতে পেল গণচারি বলছে, 'সাবধান! বেব্বো এদের কিছুতেই ছাড়া যাবে না। অরণ্যদেবতা এদের পাঠিয়েছেন আমাদের খাদ্য হিসাবে।'

ওর কথা শুনে সাধকের মেজাজ আরও গরম হয়ে গেল। ও বলল, 'ওহে জলরাক্ষস, দেখছ কী, তোমার যতটা ক্ষমতা আছে এইবার প্রয়োগ কর। তুমি যে কত বড়ো ক্ষমতাবান তা দেখানোর এটাই তো সুবর্ণ সুযোগ।'

'জয় সিদ্ধ সাধকের জয়' বলতে বলতে জলরাক্ষস তার পাথরের গদা তুলে নরখাদকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নরখাদকরা না খেতে পেয়ে ছিল দুর্বল। ওরা যথাসাধ্য প্রতিরোধের চেষ্টা করল। ওদের চিৎকার আর আর্তনাদে গোটা অরণ্য থরথর করে কেঁপে উঠল।

সিদ্ধ সাধক লক্ষ করল, অতি অল্প সময়ের মধ্যে জলরাক্ষস বহু নরখাদককে প্রচণ্ডভাবে ঘায়েল করেছে। এতে সিদ্ধ সাধক যথেষ্ট সাহস পেল। তখন 'জয় মহাকাল' বলে সাধকও নরদানবের সাহায্যে নরখাদকদের আক্রমণ করল।

এই বনভূমি তখন তোলপাড় হতে লাগল। নরখাদকরা সংখ্যায় এদের চাইতে বহু বেশি। কিন্তু বুদ্ধি এবং বুদ্ধির সঙ্গে সাহস থাকলে সংখ্যায় কম হলেও যুদ্ধ জয় করা যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা শুনতে পেল কারা যেন বলছে 'হিরণ্যপুরের মহারাজাধিরাজ কনকাক্ষ মহারাজের নির্দেশ— তোমরা এক্ষুনি যুদ্ধ থামাও।'

সাধক লক্ষ করল ঘোড়ায় চড়ে কয়েক জন লোক এই কথাগুলো ঘোষণা করছে। মায়া সরোবরেশ্বর বলল, 'আর নয়, এবার চলো মায়াসরোবরে।'

কিন্তু পরক্ষণেই তার বুকে ত্রিশূল ধরে সাধক বলল, 'দাঁড়াও!'

ছাব্বিশ

সিদ্ধ সাধক মায়া সরোবরেশ্বরের বুকে তার ত্রিশূল ধরার সঙ্গেসঙ্গে সে প্রাণের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'এটা কিন্তু ঘোরতর অন্যায়, এ একেবারে অধর্ম। যে সত্যিকারের বীর সে শত্রুকেও নিরস্ত্র অবস্থায় কখনো অক্রমণ করে না।'

সঙ্গেসঙ্গে সাধক ত্রিশূলটাকে মাটিতে পুঁতে বলল, 'আমি বীরদের বীর। আমি তোমাকে অসহায় অবস্থায় আক্রমণ করতে চাই না। নাও, এসো তোমার সঙ্গে তাহলে তরবারিতেই

যুদ্ধ করি।'

মায়া সরোবরেশ্বর তার তরবারি দিয়ে সাধকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগেই তার অনুগত অনুচর মকরকেতুর দিকে একবার তাকাল। এমন সময় অশ্বারোহী ওদের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল। ওদের নায়ক মায়া সরোবরেশ্বর ও সাধকের মাঝখানে হঠাৎ গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সাধক ভীষণ রেগে গিয়ে তাকে বলল, 'কে তুমি? তুমি কেন আমাদের দু-জনের মধ্যে নাক গলাচ্ছ?'

অশ্বারোহীদের নায়ক তার প্রশ্ন হেসে উড়িয়ে দিল। কিন্তু হঠাৎ তার চোখে পড়ে গেল জলগ্রহ ও নরদানব। ওদের দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়ে সে সাধককে বলল, 'আমি যে কে, আমাকে যে কে পাঠিয়েছে, তা আমাদের আসার শব্দ শুনেই তোমার বুঝে নেওয়া উচিত ছিল।'

'আমি এর ওপরই নজর রেখেছি। যেকোনো মুহূর্তে এ জাদুর সাহায্যে পালিয়ে যেতে পারে। তাই তোমাকে আবার প্রশ্ন করছি, এই ঘোড়া না গাধা কীসের ওপর উঠে এখানে যে এসেছ, কে তুমি? কী তোমার পরিচয়? সত্যি করে বল।' সাধক জিজ্ঞেস করল।

তার প্রশ্নের জবাব সঙ্গেসঙ্গে না দিয়ে অশ্বারোহীদের নায়ক সাধককে ভালোভাবে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, 'তোমাকে কিন্তু আমি চিনি। তুমি তো সেই হিরণ্যপুরের লোক? শ্মশানের পাহারাদারের মুণ্ডু কাটার অপরাধে আর একজনের সঙ্গে বন্দি হয়েছিলে।'

'তাহলে তুমি ভালো করেই জানো আমি কে? এখন তোমাকে যেন একটু চেনা চেনা লাগছে। তবে তোমার নাম-ধাম ঠিক মনে পড়ছে না।' সাধক বলল।

'আমার নাম ধীরসেন। কনকাক্ষ রাজার অপহৃত রাজকুমার ও রাজকুমারীকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে তোমার সঙ্গে জয়শীলও বেরিয়েছিল। সে কোথায়? তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না।' নায়ক বীরসেন সিদ্ধ সাধকে বলল।

'জয়শীল হয়তো এখন হংসরথে চেপে আকাশপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি এবার একটু সরে যাও এখান থেকে। আমি এই অহংকারী বীরটাকে একহাত দেখে নি।' বলে সাধক ত্রিশূল তুলে মায়া সরোবরেশ্বরকে আক্রমণ করতে গেল।

এমন সময় বীরসেন দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'শোনো— এখানে রক্তপাত হোক এটা আমি চাই না।' তারপর সে নিজের অশ্বারোহীদের ডেকে কাছে আনল।

অশ্বারোহীরা তার দিকে এগিয়ে আসতেই সাধক চারদিকে তাকিয়ে বীরসেনকে বলল, 'আমাদের চারদিকে নরখাদকরা গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। ওরা অনেকদিন খেতে পায়নি।

এখন যদি আমরা শক্ত না হই, এক হয়ে ওদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য প্রস্তুত না হই তাহলে কিন্তু যেকোনো মুহূর্তে আমরা ওদের খাদ্য হয়ে যেতে পারি, এ-কথা মনে রেখো।'

'ওসব আমি জানি। কনকাক্ষ রাজা ভালোভাবেই জানেন যে এখানে কত জন নরখাদক আছে এবং তাদের ক্ষমতা কতখানি। এখন আমার সঙ্গে সবাই চলে এসো।' বীরসেন বলল।

সাধক রেগে গিয়ে রক্তচক্ষু করে বলল, 'এ্যাঁ— বলি আমাকে কি হুকুম করা হচ্ছে? আমি জগতের মকাকাল ছাড়া আর কারও হুকুম মানি না।'

এদিকে জলরাক্ষস বুঝতে পারল যে তার মালিক সাধক অশ্বারোহীদের নায়কের উপর চটে গেছে। তাই সাধকের তর্জন-গর্জন শুনে সেও একটা বড়ো পাথর তুলে নিয়ে হুংকার ছাড়তে লাগল। নরদানব এমন চিৎকার করল যে সারা অরণ্যে যেন তার চিৎকার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল। এইসব দেখে অশ্বারোহীদের একটি ঘোড়া ভীষণ ভয় পেয়ে পেছনের দুটো পায়ের ওপর সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল আর পরমুহূর্তে ঘোড়ার পিঠের আরোহী ধপাস করে নীচে পড়ে গেল।

এসব দেখে বীরসেনও একটু ঘাবড়ে গিয়ে সাধককে বলল, 'সাধক, আসলে তুমিও হিরণ্যপুরের নাগরিক। আমারই মতো তুমিও হিরণ্যপুরের মানুষ। মহারাজা কনকাক্ষ অদূরেই আছেন। তাঁর সামনে হাজির হতে কার না ইচ্ছে করে। আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি তাই তোমাকে ডাকলাম। তুমি কী বলতে কী শুনে ভাবছ আমি তোমাকে হুকুম করেছি।'

এই কথা শুনে সাধক যেন একেবারে গলে গেল। সে বলল, 'এই তো, এভাবে বললে সব কিছু পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। ঠিক আছে, চল। তবে নরখাদকদের আর ওই মায়া সরোবরেশ্বর নামক দূরাত্মাকেও নিয়ে যেতে হবে।' বলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সাধক দেখে মকরকেতু বা মায়া সরোবরেশ্বর কেউ সেখানে নেই। ভয় পেয়ে সাধক বলল, 'ওরা গেল কোথায়? দেখতে না দেখতে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল!'

সঙ্গেসঙ্গে অনেকগুলো নরখাদক একসঙ্গে হেসে উঠল। তারপর নরখাদকদের নেতা এগিয়ে এসে সাধককে বলল, 'তোমরা দু-জনে এখানে কথার লড়াই চালাচ্ছিলে আর ওরা সুযোগ বুঝে আস্তে আস্তে গাছের আড়ালে গিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। তবে পালাবে কোথায়। আমাদের অরণ্যদেবতা যে খাদ্য এখানে পাঠিয়েছে সে খাদ্য অত সহজে আমাদের হাতছাড়া হবে না। গোটা অরণ্য তন্ন তন্ন করে খুঁজে আমাদের লোক ওদের ধরে আনবে।'

'ওদের যতক্ষণ না ধরতে পারছি ততক্ষণ এই দু-জন, এই নরখাদকদের নেতা আর ওদের পূজারি এই দু-জনই আমাদের কাছে বন্দি থাকবে। ওহে জলরাক্ষস, দু-জনকে ধরে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে বেঁধে ফেল।' সাধক যা বলল তাই করার জন্য জলরাক্ষস এগিয়ে গেল। নরখাদকদের নেতা এবং তাদের পুরুতকে ধরে এনে একজন অশ্বারোহীকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিয়ে ওই দু-জনকে ঘোড়ার পিঠে খুব কষে বেঁধে দিল।

তারপর সাধক তীক্ষ্নদৃষ্টিতে বীরসেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার তুমি কনকাক্ষ রাজার কাছে যেতে পার।'

তারপর সাধক নরখাদকদের নেতা ও পুরুতকে বলল, 'শোনো ভালো করে, মায়া সরোবরেশ্বরকে তোমার লোক যদি খেয়ে ফেলে তাহলে কিন্তু তোমাদের মেরে ফেলা হবে। একটু এদিক-ওদিক হলে তোমরা দু-জনেই এই নরদানবের পেটে যাবে।' কথাটা ওদের দু-জনকে বললেও আশেপাশে যে নরখাদকরা ছিল তাদের কানে কথাগুলো ভালো করেই গেল।

ঘোড়ার পিঠে বাঁধা অবস্থায় থেকে ওরা বার বার আপন মনে বলতে লাগল, 'হে অরণ্যদেবতা, ভেবেছিলাম তুমি আমাদের জন্য লোভনীয় খাদ্য পাঠিয়েছ। কিন্তু এখন দেখছি আমাদেরই প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়েছে।'

বীরসেন কনকাক্ষ রাজা যেখানে ছিলেন সেদিকে রওনা হল। তার পেছনে অন্যেরা রইল। সবার শেষে নরদানবের পিঠে চেপে সাধকও রওনা দিল। ওরা যখন যাচ্ছিল সেইসময় অরণ্যের এক জায়গায় এক যুবতীকে বাঘ তাড়া করছিল। যুবতী অতি দ্রুত বিভিন্ন গাছের আড়ালে ছোটাছুটি করে শেষে একটি ডাল ধরে গাছের ওপরে উঠে গেল।

এই দৃশ্য চোখে পড়ে গেল জয়শীল ও তার সঙ্গীদের। ওরা তখন হংসরথে চেপে আকাশপথে অরণ্যের বিভিন্ন অঞ্চল আঁতিপাঁতি করে ঘুরে ঘুরে দেখছিল।

দৃশ্যটি প্রথমে চোখে পড়ল বৈদ্যদেব নামধারী দেবশর্মার। অনেকদূর থেকে বাঘ দেখেও দেবশর্মার মনে ভয় ঢুকল। সে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে জয়শীলকে বলল, 'জয়শীল, দেখতে পাচ্ছ, যুবতীটি বাঘের থাবা থেকে বাঁচার জন্য কীভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আমার ধারণা, ওই যুবতী কনকাক্ষ রাজার কন্যা কাঞ্চনমালা ছাড়া আর কেউ নয়।'

দেবশর্মা যেদিকে তাকাতে বলল জয়শীল সেদিকে তাকিয়ে ওই দৃশ্য দেখে রথচালককে বলল, 'ওহে চালক, ওই যে বাঘটাকে দেখছ ওখানে রথটাকে নামাও।'

রথচালক নীচের দিকে তাকিয়ে ঘন গাছের মধ্যে রথটা নামানো অসম্ভব ভেবে জয়শীলকে বলল, 'আজ্ঞে, এখানে তো রথটাকে নামানো যাবে না। ওই যে একটা জায়গা দেখা যাচ্ছে মাঠের মতো সেখানে রথটা নামালে সুবিধা হবে।'

তার কথা শুনে জয়শীল রেগে গিয়ে বলল, 'ওরে বোকা, ওইখানে তোমার রথ নামাতে নামাতে এদিকে রাজকুমারী বাঘের পেটে চলে যাবে। তাড়াতাড়ি রথটাকে নীচে নামাও। একটু নামলেই আমি যেকোনো গাছের ওপর লাফ দিয়ে নামব। তারপর ডালে ডালে ধরাধরি করে যেকোনোভাবে নেমে রাজকুমারীকে বাঁচানোর চেষ্টা করব।'

সঙ্গেসঙ্গে রথ নীচের দিকে নামতে লাগল। গাছের ওপরে আসতে না আসতেই জয়শীল একলাফে নেমে গাছের ডাল ধরে সেই ডালসুদ্ধ লাফ দিয়ে নীচে পড়ল। অত বড়ো ডাল নিয়ে নীচে পড়াতে বিরাট বিপদ ঘটতে পারত। কিন্তু জয়শীল এমন কায়দা করে পড়ল যে তার গায়ে আঘাত লাগল না। ঠিক সেইসময় কাঞ্চনমালাকে বাঘটা প্রায় ধরে ফেলেছিল। কিন্তু অত বড়ো একটা গাছের ডাল নীচে পড়ায় বাঘটাও থমকে দাঁড়িয়ে পেছনের দিকে তাকাল। বাঘ পেছনের দিকে তাকাতেই কাঞ্চনমালা গাছের আরও ওপরে উঠে গেল। এদিকে বাঘ মুখের গ্রাস হাতছাড়া হওয়াতে রাগে গর্জন করতে লাগল। দু-এক বার গর্জন করে বাঘটা উপরের দিকে লাফ দিয়ে কাঞ্চনমালাকে ধরতে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে জয়শীল বাঘের পেছনের পা ধরে দু-এক বার ঘুরিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

গাছের শিখরে একটি ডালে ঝুলতে ঝুলতে জয়শীলের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে কাঞ্চনমালা বলল, 'আপনি এখন না এলে আমি কিছুতেই বাঁচতে পারতাম না। আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। আমি অপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ।'

কাঞ্চনমালার দিকে তাকিয়ে জয়শীলের মনে হল সে যেন এক অপ্সরীকে দেখছে। মনে মনে তার দারুণ ভালো লাগছিল। যে কনকাক্ষ রাজার কন্যাকে উদ্ধার করার জন্য এতদিন ধরে সে ঘোরাঘুরি করেছে, বিভিন্ন বিপদে পড়েছে সেই রাজকুমারী কাঞ্চনমালা আজ তার সামনে। একে যখন পাওয়া গেল আশা করা যায় এর দাদা কাঞ্চনবর্মাকেও পাওয়া যাবে।

'তোমার নাম যে কাঞ্চনমালা, তুমি যে কোন দেশের রাজকুমারী আমি তা জানি। তোমার দাদা কাঞ্চনবর্মা কোথায়? তুমি তো হংসরথ থেকে নীচে পড়ে গিয়েছিলে। অত উঁচু থেকে পড়ে তুমি বাঁচলে কী করে?' জয়শীল বলল।

গাছ থেকে নেমে জয়শীলের মুখে নিজের নাম শুনে কাঞ্চনমালা রীতিমতো অবাক হয়ে গেল। সে জয়শীলের দিকে অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমার বাঁচার কোনো আশা ছিল না। সম্ভবও হত না। তবে সৌভাগ্যবশত আমি জলে পড়েছি তাই বেঁচে গেছি। আমার ধারণা, ওই রথ থেকে সরোবরেশ্বর এবং রথের চালক আশেপাশে কোথাও পড়ে গেছে। আমার দাদা কাঞ্চনবর্মাকে ওরা মায়াসরোবরের একটি ঘরে আটকে রেখে দিয়েছে।'

'মায়া সরোবরেশ্বরের খোঁজখবর আমি কিছুটা জানি। ওর অনুচর সর্পনখা, সর্পস্বরা ছাড়াও আর একটা বড়ো অনুচরও আমার চেনা। এখন যেকোনোভাবে মায়াসরোবর থেকে তোমার দাদাকে মুক্ত করতে হবে। কিন্তু তার আগে আমার একজন সঙ্গী সিদ্ধ সাধককে খুঁজে বের করতে হবে। ওকে পেতে বেশি কষ্ট পেতে হবে না। সিদ্ধ সাধক নিশ্চয়ই এই গভীর অরণ্যের আশেপাশে কোথাও আছে।' জয়শীল কাঞ্চনমালাকে বলল।

আঘাত পেয়ে অদূরে পড়ে থাকা বাঘ গর্জন করছিল। রাগে ফুলতে ফুলতে বাঘটা দাঁড়ানোর চেষ্টা করে আবার ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল।

'কী ভয়ংকর বাঘ এটা। আপনার আসতে আর একটু দেরি হলে আমাকে খেয়ে ফেলত।' কাঞ্চনমালা বলল।

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ মায়া সরোবরেশ্বর এবং মকরকেতু ওদের লক্ষ করছিল। জলগ্রহের পিঠে চেপে ছিল মায়া সরোবরেশ্বর আর ঘোড়ার পিঠে বসেছিল মকরকেতু। মায়া সরোবরেশ্বর ফিসফিস করে বলল, 'মকরকেতু, জয়শীলকে বন্দি করার এই হল সুবর্ণ সুযোগ। তোমার দড়ির ফাঁস ছুড়ে জয়শীলের গলায় পরিয়ে দাও।'

'প্রভু, এই জয়শীল যে কি পারে আর না পারে তা আমি আজও বুঝতে পারলাম না। আমাদের সামান্য ফাঁস দিয়ে একে জব্দ করে বন্দি করা যাবে না। এর বিরোধিতা করলে অপকার ছাড়া উপকার হবে না।' মকরকেতু ভয়ে ভয়ে বলল।

'তোমার মতো ভীতু আর দেখিনি। দাও— দড়িটা আমার হাতে দাও।' বলে মকরকেতুর হাত থেকে লম্বা দড়িটা নিয়ে ফাঁস তৈরি করে কয়েক বার হাওয়ায় ঘুরিয়ে দড়িটাকে জয়শীলের দিকে ছুঁড়ল মায়া সরোবরেশ্বর।

সাতাশ

জয়শীল হঠাৎ এভাবে গলায় ফাঁস লেগে যাওয়ায় অবাক হয়ে গেল। পেছনের দিকে সরে গিয়ে লক্ষ করল, জলগ্রহের পিঠে বসে রয়েছে মায়া সরোবরেশ্বর। পাশে আছে মকরকেতু। মকরকেতুও ঘোড়ায় চেপে বসেছিল। জয়শীল তার তরবারি দিয়ে সাপলার মতো দড়িটাকে এক কোপে দু-টুকরো করে কাটতে গেল। ততক্ষণে দড়ির ফাঁসে আরও টান পড়ল।

'তুমিই কি সেই বীর জয়শীল? তা থেমে গেল কেন? তরবারি দিয়ে ফাঁস কেটে ফেলতে যাচ্ছিলে, ক্ষমতা থাকে তো কাট।' মায়া সরোবরেশ্বর গম্ভীর গলায় অসহায় জয়শীলকে ব্যঙ্গ করে বলল।

'হুঁ। এখন বুঝতে পারছি তুমিই তাহলে মায়া সরোবরেশ্বর। আমি না-হয় ফাঁস তরবারি দিয়ে কাটিনি, তুমিই বা ফাঁসটাকে জোরে টেনে আমাকে মেরে ফেলছ না কেন? আমার

প্রাণ এখন তো তোমার হাতে। টানো। মেরে ফেল আমাকে।' জয়শীল বলল।

'দেখ, আমি হলাম মায়া সরোবরেশ্বর। তোমার মতো একটা সাধারণ মানুষের প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমি প্রয়োজন বোধ করি না।' এবারেও ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে জয়শীলকে বলল মায়া সরোবরেশ্বর।

জয়শীল কী যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় কাঞ্চনমালা মায়া সরোবরেশ্বরকে বলল, 'আপনি পুষ্পরথ থেকে মাটি পড়ে গেছেন। আমার খুব ভয় করছিল। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না আপনার অবস্থা কি হবে। এখন আপনাকে দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। তবে আপনাকে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ— এই যুবকের কোনো ক্ষতি করবেন না। ইনি না থাকলে আমি এতক্ষণে নিশ্চয় ওই প্রকাণ্ড হিংস্র বাঘের পেটে চলে যেতাম।'

'দেখ কাঞ্চন, এই যুবক কীভাবে যে তোমাকে বাঁচিয়েছে আমি তা আড়াল থেকে লক্ষ করেছি। ফাঁস পরিয়ে আমি একে মেরে ফেলতে চাই না। আমি একে জ্যান্ত অবস্থায় মায়া সরোবরে নিয়ে যেতে চাই।' মায়া সরোবরেশ্বর রাজকুমারী কাঞ্চনমালাকে সব কথা বুঝিয়ে বলল।

তারপর কাঞ্চনমালা জয়শীলকে বলল, 'মায়া সরোবর একবার দেখে আসতে পারেন তো। বন্দি করে নিয়ে যেতে হবে কেন। অমন সুন্দর জায়গা নিজের চোখে দেখতে ইচ্ছে করে না?'

'কাঞ্চন, এখন আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর কিছু নির্ভর করছে না। আমি ভবিছি, ইনি আমাকে পরাজিত করে বন্দি করে নিয়ে যাচ্ছেন। তা যদি না ভাবতাম আমি তো অনেক আগেই তরবারি দিয়ে ফাঁস কেটে পালানোর চেষ্টা করতাম।' জয়শীল বলল।

জয়শীলের কথা শুনে কিছুক্ষণ ভেবে মায়া সরোবরেশ্বর মকরকেতুকে বলল, 'কেতু, তুমি জয়শীলের ওপরে নজর রেখ। বন্দি করা যে কাকে বলে আমি তা ফাঁসে টান দিয়ে দেখিয়ে দেব।

মায়া সরোবরেশ্বরের কথা শুনে মকরেকতু এমন ভাব করল যেন এই ধরনের কোনো কিছু সে করুক তা সে চায় না। তবে মায়া সরোবরেশ্বরকে বারণ করার মতো ক্ষমতাও তার ছিল না।

এমন সময় কাঞ্চনমালা এগিয়ে গিয়ে জয়শীলের গলায় জড়ানো দড়িটা ধরে মায়া সরোবরেশ্বরকে বলল, 'শুনুন, ফাঁসে টান দিয়ে এঁকে কষ্ট দেওয়ার আগে আমাকে আপনি মেরে ফেলুন। আমি বেঁচে থাকতে আপনি এর কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না।'

'আশ্চর্য ব্যাপার! এইটুকু সময়ের মধ্যে জয়শীলের ওপর তোমার এত টান কী করে হল? ঠিক আছে, আমি ওকে কষ্ট দেব না, তবে আমি যা বলব একে তা করতে হবে।'

বলে মায়া সরোবরেশ্বর জয়শীলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জয়শীল তুমি চেষ্টা করলে হয়তো তোমার গলার ফাঁস কেটে ফেলতে পারবে। কিন্তু এখান থেকে কিছুতেই পালাতে পারবে না। বিশেষ করে এই জলগ্রহের সামনে থেকে পালানো অত সহজ নয়। আমার ছোট্ট ইশারায় জলগ্রহ তোমাকে মাড়িয়ে গুঁতিয়ে শেষ করে ফেলতে পারে।'

জয়শীল তৎক্ষণাৎ তরবারি বের করে গলার ফাঁসটা কেটে ফেলার কথা ভাবতেই ফিসফিস করে মকরকেতু তাকে বলল, 'জয়শীল, যা করবে মাথা ঠান্ডা করে কর। মায়া সরোবরেশ্বর কেন যে তোমাকে মায়া সরোবরে নিয়ে যেতে চাইছেন তার পেছনে ছোটো রহস্য আছে। তা ছাড়া মায়া সরোবর দেখার ইচ্ছাও তো তোমার অনেকদিন ধরে আছে। যাইহোক— যা করবে ভেবেচিন্তে মাথা ঠান্ডা করে কর, আমার অনুরোধ।

জয়শীলের মনে হল, মকরকেতু ভালো কথাই বলছে। কনকাক্ষ রাজার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শুধু মেয়ের খোঁজ পাওয়া গেছে। ছেলের খোঁজ না পাওয়া গেলে ফেরা যাবে না। রাজকুমার এখনও মায়া সরোবরে বন্দি। সেখানে না গেলে তাকে মুক্ত করে আনার কোনো প্রশ্ন আসে না। এদিকে কাঞ্চনমালা মায়া সরোবরেশ্বরের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছে যেন সে নিজের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কথা বলছে। এই অবস্থায় তার পক্ষে সরোবরে যাওয়াই উচিত।

'হে মায়া সরোবরেশ্বর, আমি যে দুর্বল সেটা এখন প্রমাণ হয়ে গেছে। তোমার হাতে মারা যাওয়ার চেয়ে তোমার কাছে নত হওয়া এখন অনেক ভালো। আমি কথা দিচ্ছি, এখন থেকে তুমি যা বলবে তাই করব।' জয়শীল বলল।

জয়শীলের কথা শুনে, তার দিকে তীকষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে মায়া সরোবরেশ্বর বলল, 'হঠাৎ তুমি যে এত নরম হয়ে গেলে কেন সে কথাটা আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। এর পেছনে কোনো রহস্য নেই তো?'

'রহস্যের কি আছে। আমি এখন টের পেয়েছি যে আমি দুর্বল। এর পরেও আমি সবলের মতো আচরণ করব কী করে। যে সৎ সে নিজের অবস্থা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে। আমার ক্ষমতা তো মকরকেতুর জানা আছে।' জয়শীল মায়া সরোবরেশ্বরকে বলল।

'আমি যে জানি সে-কথা ওনাকে জানিয়েছি।' মকরকেতু বলল।

'মকরকেতু, এখানে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। জয়শীলের মতলব যদি খারাপ থাকে তা একদিন না একদিন প্রকাশ পাবেই পাবে। এর আগে আমরা অনেককে দেখেছি ভবিষ্যতেও দেখব। তারজন্যে আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই।' সরোবরেশ্বর বলল।

'তাহলে এই ফাঁসটা কি এইভাবেই থাকবে?' জয়শীল জিজ্ঞাসা করল।

সরোবরেশ্বর কোনো জবাব দেওয়ার আগেই কাঞ্চনমালা হাসতে হাসতে জয়শীলের গলার ফাঁস খুলে বলল, 'এটা মেরে ফেলার ফাঁস নয়। এটাকে বলা চলে সাপলার হার।'

'মহারাজ, এখন তাহলে কী করবেন?' মকরকেতু প্রশ্ন করল।

'এখন আমরা সবাই সরোবরে যাব। তুমি আমাদের সামনে চল।' বলল সরোবরেশ্বর।

মকরকেতু জয়শীলের দিকে একবার তাকিয়ে সরোবরেশ্বরকে বলল, 'জয়শীল কি পায়ে হেঁটে যেতে পারবে?'

'ঠিক আছে— কাঞ্চনমালা আমার পেছনে জলগ্রহের উপরে চড়বে। তুমি আর জয়শীল ঘোড়ার উপের চেপে এসো।' সরোবরেশ্বর বলল।

কাঞ্চনমালাকে আবার সরোবরে নিয়ে যাওয়ার কথা উঠতেই জয়শীল চমকে উঠল। মকরকেতুকে বলল, 'কেতু, কাঞ্চনমালাকে আবার সরোবরে নিয়ে যাওয়া হোক এটা আমি চাই না। আমি কনকাক্ষ রাজাকেকে কথা দিয়েছি যেকোনোভাবেই হোক— আমি রাজকুমার ও রাজকুমারীকে নিয়ে যাব।'

বলতে বলতে জয়শীল লক্ষ করল, সরোবরেশ্বর ও কাঞ্চনমালা তীকষ্নদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের দৃষ্টি দেখে মনে হয় ওরা ভীষণ চটে গেছে।

'আমাকে এবং আমার দাদাকে যে অপহরণ করা হয়েছে এটা সত্য। তবে এখন আমরা কারও হাতে বন্দি নয়। আমি একা কোথাও ফিরে যাব না। বাবা-মার কাছে যখন ফিরব তখন আমরা ভাই-বোন একসঙ্গে ফিরব।' বলতে বলতে কাঞ্চনমালা জলগ্রহের কাছে গিয়ে মায়া সরোবরেশ্বরের হাত ধরে সটান হাতির পিঠে উঠে পড়ল।

জয়শীল অবাক হয়ে মকরকেতুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেতু, অপহরণ সত্য। অথচ অপহরণকারীর প্রতি এত টান— সেটাও কম আশ্চর্যজনক নয়।'

'আগে চুপিচুপি এসে ঘোড়ার পিঠে বস। সময় হলে সব কিছু জানতে পারবে।' জয়শীলকে মকরকেতু বলল।

জয়শীল আর কথা না বাড়িয়ে সোজা গিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসল। মায়া সরোবরে গিয়ে তিরবেগে বিচিত্র হাতি জলগ্রহ ছুটে চলল। আবার ছুটে চলল মকরকেতুর ঘোড়া। হঠাৎ জয়শীলের মনে পড়ে গেল সিদ্ধ সাধকের কথা। একসঙ্গে অনেকদিন ওরা দু-জনে ছিল। অনেক বিপদ-আপদের মোকাবিলা করেছে ওরা। সাধককে খবর না দিয়ে এভাবে যাওয়া হয়তো ঠিক হচ্ছে না। এলোমেলো কথা ভাবতে ভাবতে জয়শীল আপনমনে বলল, 'সাধক আমাকে অনেকদিন দেখতে না পেয়ে হয়তো ভাববে আমি মরে গেছি। ভাবে ভাবুক, এখন এই অবস্থায় আমি কী-বা করতে পারি।'

জয়শীল যখন সাধকের কথা ভাবছিল তখন সাধক ছিল কনকাক্ষ রাজার কাছে জয়শীল ও সাধক ফিরছে না দেখে কনকাক্ষ রাজা সাধককে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ছেলে-মেয়েদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব তুমি নিয়েছিলে। তোমরা কেউ ফিরলে না, কোনো খবর পাঠালে না। আমার ছেলে-মেয়েরা যে কোথায় আমি তা এখনও জানি না। শেষপর্যন্ত দেশের কাজকর্মের দেখাশোনার ভার মন্ত্রীদের উপরে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হলাম। সারা অরণ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছি কিন্তু কোথাও ওদের কোনোরকম সন্ধান এখনও পাইনি।'

'মহারাজ, যুবরাজ ও রাজকুমারীকে যারা অপহরণ করেছে তারা আছে মায়া সরোবরে। বিচিত্র ধরনের মানুষ ওরা। জলে স্থলে ওরা সমানভাবে চলতে পারে। ওদের কয়েক জনকে আমরা ধরেছিলাম। ওদের রাজার নাম মায়া সরোবরেশ্বর। তাকে ধরতে পেরেছিলাম আমরা। নরখাদকদের হাতে সে ভালোভাবেই ধরা পড়েছিল কিন্তু বিশেষ মুহূর্তে সুযোগ বুঝে আবার পালিয়ে গেল। তবে কোথায় পালাবে। ওর সরোবর যে কোথায় তা জানে আমার এই জলরাক্ষস। এই জলরাক্ষসের সাহায্যে সরোবরের সন্ধান আমরা নিশ্চয়ই পেয়ে যাব।' সাধক বলল।

'পেয়ে গেলে ভালোই। কিন্তু আমি ভাবছি সেই যুবকের কথা— জয়শীলের কথা।' কনকাক্ষ রাজা বললেন।

'জয়শীলের কোনো ভয় নেই। সে যত বড়ো বিপদেই পড়ুক না কেন ঠিক কেটে বেরিয়ে আসতে পারবে। তা ছাড়া ওর সঙ্গে মায়া সরোবরের দু-জন লোক আছে। আর ওদের সঙ্গে আছে একটি হংসরথ।' সাধক রাজাকে বলল।

হংসরথের কথা শুনে কনকাক্ষ রাজা ও তাঁর সঙ্গে অরণ্যে যারা এসেছিল তারা অবাক হয়ে গেল। রাজা বললেন, 'হংসরথ! হংসরথ আছে নাকি?'

'শুধু হংসরথ কেন মহারাজ। এই জলরাক্ষস, নরদানব এদের ক্ষমতা সাধারণ ক্ষমতা নয়। এদের অসীম ক্ষমতা আছে। এই অরণ্যেরই একপ্রান্তে পেয়েছি বেঁটে বেঁটে মানুষ, এমন গাছ পেয়েছি যা মানুষ সহ যেকোনো প্রাণীকে টেনে ধরে খেয়ে নেয়। আমরা নগরের জীবন দেখেছি কিন্তু অরণ্যে যে কত ভয়ংকর বৈচিত্র্য আছে তা এখানে না ঢুকলে কোনোদিনই বুঝতে পারতাম না।' সাধক রাজাকে বলল।

অদূরে রাজার লোকের সঙ্গে নরখাদকদের জোর বাগবিতণ্ডা লেগে গেল। ওদের বক্তব্য হল ওরা একটা রহস্যের সন্ধান পেয়েছে। নরদানবের পিঠে চেপে তাড়াতাড়ি গেলে ওরা সেই বিচিত্র রহস্যের সন্ধান পেতে পারে। তাই ওরা এখন নরদানবকে নিয়ে যেতে চায়।

রাজার লোক নরখাদকদের জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কারা? তোমরা এখানে কেন এসেছ?'

সাধক ওদের ডেকে পাঠাল। নরখাদকরা সাধকের কাছে এসে বলল, 'আমাদের পুরুত ঠাকুর আর নেতাকে ছেড়ে দিলে তোমাদের আমরা একটা বিরাট রহস্যের সন্ধান দেব।'

রাজার লোক সাধকের ইশারায় নরখাদকদের বন্ধন খুলে দিল। পূজারি এবং ওদের নেতাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ওদের মুক্ত করে সাধকের সামনে আনা হল। নরখাদকরা যা চেয়েছিল তা করার পর সাধক ওদের বলল, 'এখন তো তোমরা খুশি। এখন বল, তোমরা কোন রহস্য জানাতে চাও।'

নরখাদকরা সাধককে বলল, 'শুনুন তাহলে বলছি একদিন যে কুমিরমুখো লোকটা তোমাদের খপ্পর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল তাকে, একটি সুন্দরী মেয়েকে, তোমাদের মতন একজন মানুষকে, অদ্ভুত ধরনের হাতিকে একসঙ্গে ওই পাহাড়ের দিকে আমরা যেতে দেখেছি। ওরা ওই হাতি এবং ঘোড়ার পিঠে চেপে যাচ্ছিল। আর একটা রহস্যজনক ঘটনা আমরা লক্ষ করেছি, হংসরথ থেকে যারা পড়ে গেছল তাদের মধ্যে কয়েক জনকে কী যেন খোঁজাখুঁজি করতে দেখেছি। ওরা ঠিক কি যে খুঁজছে তা অবশ্য আমরা বুঝতে পারিনি।'

আঠাশ

নরভক্ষকরা এমনভাবে ঘটনার বর্ণনা করল যে সিদ্ধ সাধক পরিষ্কার বুঝতে পারল, তার সঙ্গী জয়শীল সরোবরেশ্বরের কবলে পড়ে গেছে। কিন্তু সাধক অনেকক্ষণ ভেবেও বুঝতে পারল না সরোবরেশ্বর জয়শীলের সঙ্গে কোন যুবতীকে ধরে নিয়ে গেছে।

নরভক্ষকরা যা বলল তা শুনে অবাক হয়ে গেল রাজা। রাজাকে সাধক বলল, 'মহারাজ, এবার আমাকে বিদায় দিন। আমার সঙ্গী জয়শীলকে সরোবরের পশুগুলো বন্দি করে নিয়ে গেছে। আমি ভেবে পাচ্ছি না অত বড়ো বীর ওদের হাতে কীভাবে ধরা পড়ল। যেভাবেই সে ধরা পড়ুক, সে যেখানেই থাকুক তাকে আমায় উদ্ধার করতেই হবে। আমি যদি উদ্ধার

করতে না যাই তাহলে আমার পাপ হবে। আমি যাচ্ছি।' বলে সে নরদানবের পিঠে চেপে বসতে গেল।

রাজা কনকাক্ষ তাকে শান্ত করে বললেন, 'সাধক, জয়শীলকে উদ্ধার করা আমারও কর্তব্য। কয়েক জন অশ্বারোহী নিয়ে আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে মায়া সরোবরেশ্বর যে কোথায় তা আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। তোমার সঙ্গী ওই জলজ প্রাণীটিকে জিজ্ঞেস করে নাও মায়া সরোবর যাওয়ার রাস্তা কোন দিকে।'

সাধক মাথা নেড়ে রাজি হয়ে জলরাক্ষসকে বলল, 'ওহে, তুমি ছাড়া আমার এখন গতি নেই। তোমাকে নিয়ে একজায়গায় যেতে চাই। কিন্তু তার আগে তোমার কাছ থেকে একটি সত্যি কথা জানতে চাই। তুমি কি এখনও মনে মনে মায়া সরোবরেশ্বরকেই শ্রদ্ধা কর নাকি আমাদের প্রতি তোমার ভক্তিশ্রদ্ধা আছে? আর যদি আমাকে বিপদে ফেলার জন্য আমার সঙ্গে ভিড়ে থাক তাহলে অন্তত তুমি সত্যি কথাটা বল। সেই বুঝে আমি তোমাকে দিয়ে কোনো কাজ করাব কি না ভাবব।' সাধকের কথা শুনে রাক্ষস তার পাথরের গদা রেখে বলল, 'প্রভু, আমার জাতের লোক মিথ্যা কথা বলে না। আপনার জন্য আমি যেকোনো মুহূর্তে জীবন দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।'

'তাহলে এখন একটি সত্যি কথা বল। মায়া সরোবর কোথায় আছে?' সাধক জিজ্ঞেস করল।

'প্রভু, আগেই জানিয়েছিলাম, সরোবরের ঠিকানা জানানোর সঙ্গেসঙ্গে আমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। আমার জাতের কোনো লোক যদি কাউকে জানায় তাহলে তারও মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। আমাদের উপর সরোবরেশ্বরের দেয়া এই একটাই হল অভিশাপ।'

তার কথা শুনে সাধক হো-হো করে হেসে বলল, 'তোমার সরোবরেশ্বরের এমন ক্ষমতা নেই যে তার অভিশাপ লেগে যাবে। যার রথ আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে যায়, যে নরভক্ষকদের কবল থেকে নিজের শক্তিবলে মুক্ত করতে পারে না তার অভিশাপে কিছু হয় না। মনে রেখো, শকুনের অভিশাপে গোরু মরে না।'

জলরাক্ষস কেমন থতমত খেয়ে বলল, 'প্রভু, মনে হচ্ছে আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না। শেষে কি আমায় মরতেই হবে? একটা কাজ করি, মুখে না বলে ইশারায় জানিয়ে দিই।' বলে সে গাছ থেকে ছোটো শুকনো কাঠি ভেঙে আনল।

'ওহে আমি তোমায় অভয় দিচ্ছি তোমার কোনো ভয় নেই। আমি হলাম মহাকালের ভক্ত। কোনো কারণে তোমার যদি মৃত্যু ঘটে, মুহূর্তের মধ্যে আমি তোমাকে স্বর্গে পাঠিয়ে

দেব। তুমি যাতে স্বর্গসুখ ভোগ কর তার ব্যবস্থা করব।' সাধক ত্রিশূলটাকে উপরে তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল।

জলরাক্ষস কাঠি দিয়ে মাটির উপর ঘর কাটতে কাটতে বলল, 'প্রভু, আমার মনে হচ্ছে আমার মাথায় ফাটল ধরেছে। আর কিছুক্ষণ পরেই হয়তো মাথা চৌচির হয়ে যাবে। প্রভু আমার বুক ধড়ফড় করছে।'

কনকাক্ষ রাজা জলরাক্ষসের কাছে এসে সাধককে বললেন, 'আমার ছেলে-মেয়েকে উদ্ধার করতে গিয়ে কতরকমের বিপদেই না তোমাদের পড়তে হচ্ছে। যদি এই প্রাণীটির মাথা ফেটে যায় তাহলে সত্যি বড়ো দুঃখের বিষয় হবে।'

'মহারাজ, এ হল আস্ত মূর্খ, মহাকালের ভক্তের আশীর্বাদ পেলে কারও অভিশাপে কোনো ক্ষতি হয় না।' বলতে বলতে সাধক জলরাক্ষসের কাটা দাগগুলো দেখছিল। কিছুক্ষণ দেখে সে বলল, 'ওহে, শুধু দাগ কেটে গেলেই কি হবে? তোমার এই সোজা দাগগুলো কীসের চিহ্ন? আর এই আঁকাবাঁকা দাগগুলো দিয়ে কী বোঝাতে চাইছ? কোনো কথা না বলে শুধু এঁকে গেলে বুঝব কী করে?'

ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে মাথা না তুলেই সে বলল, 'প্রভু, এগুলো হল পাহাড়ের চিহ্ন। আর এইগুলো হল অরণ্যের বড়ো বড়ো গাছের চিহ্ন। এ যে সবচেয়ে বড়ো দাগ এটি বড়ো গাছের চিহ্ন। এই গাছটি আছে একটি পাহাড়ের উপরে। এই গাছে উঠে শিখরে পৌঁছে একবার পুব দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই পশ্চিমে এবং উত্তর দিকে তাকালেই মায়া সরোবর নজরে পড়বে।' বলেই সে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'প্রভু, আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে। আমার বড়ো কষ্ট হচ্ছে। মরে যাব।' বলতে বলতে সে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ সাধক নুয়ে তার নাক চেপে ধরে শ্বাস প্রশ্বাস চলছে কি না পরীক্ষা করে দেখল। তারপর রাজাকে বলল, 'মহারাজ, এ যে কত বড়ো মূর্খ আপনাকে কী বলব। যেহেতু ওর দাগ কাটা শেষ হয়ে গেছে সেইহেতু ওর ধারণা হয়েছে ও মরে গেছে। ভয়ে এর বুক ধড়ফড় করছে। আসলে এ কিন্তু বেঁচে আছে। সরোবরেশ্বরের অভিশাপে যে কোনো কাজ হয় না এটাই তার প্রমাণ।' তারপর সাধক নরখাদকদের উদ্দেশ্যে বলল, 'ওহে, তাড়াতাড়ি কয়েক ঘড়া জল নিয়ে এসো।'

নরখাদকরা জলরাক্ষসকে হাঁ করে দেখছিল। ওদের অবস্থা দেখে সাধক ত্রিশূল তুলে নির্দেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'কিরে শুনছিস, আমার নির্দেশ যদি না শুনিস তাহলে আমি তোদের এক্ষুনি শেষ করে ফেলব।' বলে রক্তচক্ষু করে সাধক নরখাদকদের দিকে তাকাল।

নরখাদকদের নেতারা ইশারা পেয়ে বুড়ো পূজারি কাছে এসে কনকাক্ষ রাজাকে প্রণাম করে বলল, 'মহারাজ, আমরা বনে পড়ে থাকি। আপনাকে যে কীভাবে সসম্মানে রাখতে হয় আমরা তা জানি না। শুনেছি এই অরণ্য আপনার অধীনে আছে। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এই জলরাক্ষসদের আমাদের হাতে তুলে দেন তাহলে অনেক উপকার হবে।'

তার কথা শেষ হতে-না-হতেই সাধক এসে পূজারির চুলের মুঠি ধরে বলল, 'ওহে, নরখাদক, জানোয়ার, তুমি কি চাও এই ত্রিশূলটা তোমার বুকে বিঁধে ফেলি।'

সাধক পূজারিকে ত্রিশূল দিয়ে মারতে যাবে এমন সময় জলঘোড়ায় চেপে সর্পনখা আসতে আসতে বলল, 'হে সাধক, শোনো সাধক, শোনো, এখন আমাদের আর উপায় নেই। জলরাক্ষসদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ অবধারিত। ওদের বিরুদ্ধে লড়ার সময় নরখাদকরা যাতে সাহায্য করে তা চেষ্টা করতে হবে।'

ওই চিৎকার শুনতে শুনতে সাধক ত্রিশূলটা মাটিতে নামিয়ে মুহূর্তকাল কী যেন ভাবতে গেল। এই সুযোগে বুড়ো পূজারি নরখাদকের মধ্যে ঢুকে ওদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে লাগল।

সর্পনখা সাধকের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে মাটিতে পড়ে থাকা জলরাক্ষসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাধক, একে কি পরলোকে পাঠিয়ে দিয়েছ? তুমি না একদিন বলেছিলে এ তোমার খুব বিশ্বাসী? দেখলে তো কীরকম বিশ্বাসী?'

'এ এখনও আমার কাছে বিশ্বাসী। তবে এর বিশ্বাস, সরোবরেশ্বর যা বলে তাই ঘটে। মায়া সরোবরে পথঘাট চেনানোর জন্য দাগ কাটতে কাটতে শুয়ে পড়ল। এর ধারণা এ মরে গেছে।' সাধক বলল।

ততক্ষণে জল আনল রাজার লোক। জল ঢালার পর জলরাক্ষস এ-পাস ও-পাশ ফিরে চোখ খুলে ড্যাবড্যাব করে তাকাল। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, 'আমি কোথায় আছি, নরকে না সরোবরে?' আরও অনেক কথা সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল। সাধক কষে এক লাথি মেরে তাকে বলল, 'ওহে, উঠে পড়, অভিশাপ থেকে তোমাকে মুক্ত করেছি। আর কোনো ভয় নেই উঠে পড়।'

সাধকের কথা শুনে জলরাক্ষস উঠে পড়ল। তার হাবভাব দেখে সর্পনখা যেন খুশি হয়ে একবার রাজা এবং অন্য বার তার লোকজনের দিকে তাকিয়ে বলল, বৈদ্যদেব হংসরথে যখন ছিলেন তখন রাজার কথা শুনেছিলাম। ইনি কি সেই হিরণ্যপুরের রাজা কনকাক্ষ?'

রাজা কনকাক্ষ সর্পনখার বিচিত্র পোশাক লক্ষ করছিলেন। তার পোশাক এবং ঘোড়া লক্ষ করে রাজা বললেন, 'বৈদ্যদেব কে? সে কি আমারই দেশের?'

সর্পনখা সঙ্গেসঙ্গে জবাব দিল, 'মহারাজ, আমি তা জানি না। তবে আমার পেছনে তাকেও আসতে দেখেছি। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে সে এসে পড়বে।'

'সাধক, তুমি কি বৈদ্যদেবকে চেন?' কনকাক্ষ রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

তাঁর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে সাধক বলল, 'মহারাজ, বৈদ্যদেব যে কে তা মায়া সরোবরের বাসিন্দা, সরোবরেশ্বরের অনুচররা জানে না। তবে সে যে জয়শীলের মতোই অমরাবতীর নাগরিক সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

'কি বলছ তুমি, জয়শীল অমরাবতীর নাগরিক? ওই দেশের রাজা রুদ্রসেন আমার শত্রু। আমি বিপদে পড়েছি শুনে রুদ্রসেন নাকি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এক জয়শীল ছিল, তার সঙ্গে আবার বৈদ্যদেব জুটল।' রাজা কনকাক্ষ বললেন।

'মহারাজ, জয়শীল, আর যাই হোক বিশ্বাসঘাতক নয়। তার কথার অনেক দাম। সে যা বলে তাই করে। আপনাকে যখন কথা দিয়েছে তখন কথা সে রাখবেই। আমি ওর সঙ্গে ঘুরে লক্ষ করেছি, জয়শীলের মতো মানুষ হয় না। হলপ করে বলতে পারি।' সাধক বলল।

সাধক রাজার সঙ্গে কথা বলতে বলতে লক্ষ করল, নরখাদকদের মধ্যে কয়েক জন ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সাধকের ইশারায় ওদের নেতা এসে বলল, 'তোমাদের মতো চার জন মানুষ জলরাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। আমরাও যদি ওদের বিরুদ্ধে লড়ি কিছুদিনের জন্য আমাদের খাদ্য জুটে যায়।'

পরক্ষণেই সর্পনখা একলাফে নিজের ঘোড়ার পিঠে চেপে বলল, 'সাধক বুঝতে পেরেছি ওরা কারা। বৈদ্যদেব আর আমার ভাইও আছে ওই দলে। রাজার অঙ্গরক্ষকও ওই দলে ছিল। চলি!'

'জয় মহাকাল! বলে সাধক নরদানবের পিঠে চেপে বসে রাজা কনকাক্ষকে বলল, 'মহারাজ, জলরাক্ষসদের হাত থেকে এক্ষুনি ওদের বাঁচাতে হবে।' বলেই সে সর্পনখাকে অনুসরণ করল।

'হে অরণ্যদেবতা, তুমিই পার আমাদের খাদ্যের সন্ধান দিতে।' বলে নরখাদকরা সাধককে অনুসরণ করল।

সর্পনখা ও সিদ্ধ সাধক গিয়ে দেখল, সর্পস্বরা ঘোড়ায় চেপে জলরাক্ষসদের সঙ্গে লড়াই করছে। তরবারি দিয়ে ওদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছে। ওর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে জলরাক্ষসগুলো চেষ্টা করছে, বৈদ্যদেব নামধারী দেবশর্মা, হংসরথের চালক মঙ্গলবর্মা প্রভৃতিকে ধরার। কিন্তু দেবশর্মা হাতের লাঠিটা এদিক-ওদিক নেড়ে বলছে, 'শোনো তোমরা আমার কাছে আসবে না। এই লাঠির ডগায় কিন্তু বিষ আছে।'

কনকাক্ষ রাজার লোক সেখানে পৌঁছে গেল। ওদের দেখেই জলরাক্ষসদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিল। ওরা যে ভয় পেয়েছে তা বুঝে নিয়ে ওদের নেতা বলল, 'তোমরা দাঁড়াও। আমাদের রাজার নির্দেশ মনে রেখ। জ্যান্ত না আনতে পারলে, দেবশর্মার মৃতদেহও আনতে বলেছিলেন রাজা। মনে আছে? বলেই সে দেবশর্মাকে মারতে গেল।

তৎক্ষণাৎ দেবশর্মা এক-পা পেছিয়ে বলল, 'না তোমার মৃত্যু আমার হাতেই দেখছি!' বলে লাঠি দিয়ে তার গায়ে খোঁচা মারল। তৎক্ষণাৎ সে মাটিতে পড়ে আর্তনাদ করতে করতে মারা গেল। দেবশর্মা লাঠিটা তুলে বলল, 'ওহে, শোনো, সরোবরেশ্বরের মেয়ে পদ্মমুখী অথবা কাঞ্চনবর্মার যদি ক্ষতি হয় তাহলে কিন্তু সবাইকে শেষ করে ফেলব।'

এই ঘোষণা শুনে জলরাক্ষসদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। কেউ কেউ পালাল। সর্পনখা দেবশর্মার কাছে এসে বলল, 'বৈদ্যদেব, কি ঘটবে তা ঠিকভাবে না জেনে সরোবরে যাওয়া কি ঠিক হবে?' তার কথার জবাবে কিছুক্ষণ ভেবে দেবশর্মা বলল, 'সেটা তোমরা দুই ভাই আর সরোবরেশ্বরের অঙ্গরক্ষক ভালোভাবেই জানো।' তারপর জলঘোড়ায় চেপে সর্পনখা ও সর্পস্বরা এগিয়ে গেল। হংসরথও উড়ল আকাশে। নরখাদকরা জলরাক্ষসদের ধরার জন্য মহানন্দে চিৎকার করতে করতে ছুটল।

উনত্রিশ

নিজেদের খিদে মেটানোর জন্য নরভক্ষকরা জলরাক্ষসদের ধরতে তাদের পেছনে পেছনে ছুটছিল। এইসময় তারা লক্ষ করেনি ছুটতে ছুটতে কোথায় যাচ্ছে। দুটো জলরাক্ষস গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কিছু লক্ষ করছিল। ওরা নেতার নির্দেশে সারাদিন গাছের আড়ালে থেকে সব কিছু লক্ষ করছিল।

অনেক উঁচু গাছে উঠে ডালপালার আড়ালে ওরা আরও দূরের ঘটনা লক্ষ করছিল। একজন অন্যজনকে বলল, 'আমাদের শত্রুর সংখ্যা বাড়ছে।'

দ্বিতীয় রাক্ষস ওর কথা কানে তুলল না। সে দেখতে পেল জলরাক্ষসদের পেছনে নরখাদকরা ছুটছে। আর নরভক্ষকদের পেছনে ছুটছে হিরণ্যপুরের সেনাবাহিনী। ওই বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে মঙ্গলবর্মা।

জলরাক্ষস মঙ্গলবর্মাকে দেখিয়ে বলল, 'এই লোকটাকে ধরে আমাদের রাজার কাছে নিয়ে গেলে কেমন হয়? আমার ধারণা, একে গোটাকয়েক রদ্দা দিলেই এর বাহিনীতে কত জন আছে কীসের জন্য এরা এখানে এসেছে সব জানা যাবে।

'তোমার কথাটা ভালোই। তবে মায়া সরোবরের দিকে যারা যাচ্ছে তারা তো একটা দলে যাচ্ছে না। অনেক দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এত লোক যে মায়া সরোবরে যাচ্ছে এই খবরটা আগেভাগে রাজার কাছে জানানো কি উচিত নয়?' দ্বিতীয় জলরাক্ষস বলল।

তার কথায় আগ্রহ না দেখিয়ে অন্য রাক্ষস বলল, 'ওসব যা করার তুমি করগে যাও। আমি এই লোকটাকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে যাবই যাব।' এই কথা বলে প্রথম জলরাক্ষস সন্তর্পণে গাছ থেকে নেমে মঙ্গলবর্মাকে অনুসরণ করল।

যারা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল তারা অনেকদূর এগিয়ে গেল। দেখতে দেখতে, কিছু দূর যাওয়ার পর মঙ্গলবর্মা পেছিয়ে পড়ল। পিছনদিক দিয়ে যে আক্রান্ত হতে পারে এমন ধারণা তার ছিল না। আসল জিনিস হল সাহস। বুকে সাহস থাকলে যেকোনো যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায়।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে মঙ্গলবর্মা হাঁটছিল। এমন সময় পেছনদিক দিয়ে জলরাক্ষস তার কাছে পৌঁছে গেল। ঝট করে ধরার প্রবল আগ্রহের ফলে পথের দিকে না তাকিয়ে চোখ-কান বুঁজে মঙ্গলবর্মাকে ধরার জন্য ধাবিত হল ওই রাক্ষসটা। ফলে হঠাৎ সে পড়ে গেল এক গর্তে। তার পা ভেঙে গেল। সে আর্তনাদ করতে লাগল।

পেছনের দিকে তাকিয়ে মঙ্গলবর্মা বুঝল যে সে বিরাট বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। জলরাক্ষসকে খাদে পড়তে দেখে মঙ্গলবর্মা তার কাছে গিয়ে বলল, 'কী হে, খুব তো আমাকে ধরতে আসছিলে, এখন যে পা ভেঙে পড়ে আছে। কেমন মজা? এখন তোমাকে ওষুধ দেবে কে? তোমার রাজা তো আর তোমার ডাকে আসবে না। এর আগেও তো অনেকের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছ। তার ফলভোগ করবে কে? অন্যের ক্ষতি করতে চাইলে এই হয়। দাঁড়াও দেখি— কী করতে পারি। শেকড়-বাকড় লাগিয়ে তুমি যাতে আবার হাঁটতে পার তার ব্যবস্থা করি।'

এসব লক্ষ করে অন্য জলরাক্ষসটা গাছ থেকে নেমে পাথরের গদাটাকে উপরের দিকে তুলে চিৎকার করে বলল, 'দাঁড়াও! তোমাকে এই মুহূর্তে একেবারে স্বর্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' এই কথা বলে ছুটতে ছুটতে মঙ্গলবর্মার দিকে এগিয়ে এল।

রাক্ষসটাকে ছুটতে ছুটতে আসতে দেখে মঙ্গলবর্মা হাতের অস্ত্রটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে উপরের দিকে তুলল। সঙ্গেসঙ্গে তার ভেতর থেকে একটি ঝকঝকে তরবারি বেরিয়ে এল। মঙ্গলবর্মা ওই তরবারি মাটিতে পড়ে থাকা জলরাক্ষসের গলায় ঠেকিয়ে যে রাক্ষসটা আসছিল তার উদ্দেশ্যে বলল, 'ওহে দুরাত্মা— আমি এক, দুই, তিন বলার সঙ্গেসঙ্গে তুমি তোমার গদা মাটিতে ফেলে দাও। মাথা নীচু করে খালি হতে তুমি আমার কাছে আসবে। তা যদি না কর তাহলে কিন্তু তোমার এই সঙ্গীটির গলা ঘ্যাচাং করে কেটে ফেলব। দেখতে পাচ্ছ তরবারিটা ওর গলায় ঠেকিয়ে রেখেছি। একটু টান দিলেই ওর গলা কাটা যাবে। যাও এবার বলছি। এক দুই...।'

মঙ্গলবর্মার মুখ দিয়ে 'তিন' বেরোনোর আগেই ওই জলরাক্ষস পাথরের গদাটিকে দূরে ফেলে দিল। সে নুয়ে সবিনয়ে বলল, 'আমার বন্ধুকে মেরে ফেল না।'

'না, তোমার দেখছি দয়ামায়া আছে। বন্ধুকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও। শুধু বাঁচালেই হবে? বন্ধুর ঠ্যাং যে ভেঙে গেছে, সেটা ঠিক করতে হবে না? এসো আমার সঙ্গে। গাছগাছালির ওষুধ দিয়ে সারানোর চেষ্টা করি।' বলে মঙ্গলবর্মা ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগল।

কিছু দূর যাওয়ার পর মঙ্গলবর্মা কায়েকটি লতাপাতা ছিঁড়ে দ্বিতীয় জলরাক্ষসের হাতে দিয়ে বলল, 'এর রস তোমার বন্ধুর পায়ে লাগাও। যেখানে আছে সেখানেই অন্তত বারো ঘণ্টা থাক। নড়াচড়া যেন না করে। এই ওষুধ লাগানোর পর নড়াচড়া না করলে পা জোড়া লেগে যাবে। আর নড়াচড়া করলে ভাঙা পা ভাঙাই থাকবে। শেষে হয়তো পা কেটে বাদ দিতে হবে।'

মঙ্গলবর্মার কথা শুনে ওই দুই রাক্ষসের মুখ ঝুলে গেল। কোথায় কী ঘটছে তা লক্ষ রাখার জন্যই তাদের পাঠানো হয়েছিল। এখন যদি এক জায়গায় বসে থাকতে হয় তাহলে অন্য জায়গায় কী ঘটছে তা জানা যাবে না। এদিকে মঙ্গলবর্মা ভাবল, এরা যে এখানে কেন আছে তা এদের জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ হবে না। কারণ এরা সত্যকথা বলবে না। জিজ্ঞেস করার তেমন আগ্রহও ছিল না মঙ্গলবর্মার। কারণ তাকে বাধ্য হয়ে একবার মায়া সরোবরে থাকতে হয়েছিল। কোন পথে গেলে মায়া সরোবরে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে তা সে জানে। কিন্তু অতটা পথ হেঁটে যাওয়া তার পক্ষে কষ্টকর।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে মঙ্গলবর্মা আস্তে অস্তে হাঁটছিল। এমন সময় উঁচু গাছ থেকে সে শুনতে পেল, 'মঙ্গলবর্মা!' শুনে সে চমকে উঠল। ভাবল অরণ্যে নানারকম জীবজন্তু শুধু নয়, অনেক রকমের ভূত পিশাচও থাকতে পারে। কিন্তু যাই থাক, যেদিক থেকে ডাক শোনা গেছে সেদিকে না তাকিয়ে পারল না। গাছপালার আড়ালে, অনেকক্ষণ লক্ষ করার পর সে দেখতে পেল একটি মানুষের মুখ। এই সেই লোক যে মায়া সরোবরেশ্বরের

হংসরথ চালায়। রথটা আকাশ থেকে উলটে পড়ার সময় লোকটাও রথ থেকে গড়িয়ে পড়েছিল। তবে সৌভাগ্যক্রমে সে মাটিতে না পড়ে পড়ল উঁচু গাছের ডালপালার উপর। ফলে সামান্য চোট পেলেও মারা গেল না।

তাকে চিনতে পেরে মঙ্গলবর্মা হাতে নেড়ে বলল, 'তাহলে তুমি বেঁচে আছ! খুব খুশি হয়েছি। তা গাছের উপর বসে আছ কেন? নামলে তো পারতে।'

হংসরথের চালক ইশারা করে আস্তে কথা বলতে বলে থেমে থেমে বলল, 'মঙ্গল, অত জোরে কথা বলো না। স্বয়ং যম এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নরদানবের উপর চেপে তাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি! এদিকেই সে আসছে। তার সঙ্গে আছে কিছু সৈনিক। আমার ধারণা এরাই আমাদের শত্রু জয়শীল এবং সিদ্ধ সাধক।'

তার কথা শুনে মঙ্গলবর্মা খুব খুশি হল। ভাবল, যারা আসছে তাদের মধ্যে নিশ্চয় বৈদ্যদেব নামধারী দেবশর্মা আছে। এখন ওদের সঙ্গে মিশে গেলে খুব তাড়াতাড়ি মায়া সরোবরে পৌঁছানো যায়।

এই কথা ভেবে মঙ্গলবর্মা উপরের দিকে মুখ রেখে হংসরথের চালককে বলল, 'ওহে শোনো, এখন কিন্তু ওরা আমাদের শত্রু নয়। শত্রু যে নয় এটুকু জানি; তবে মিত্র কি না বলতে পারি না। স্বয়ং মায়া সরোবরেশ্বর নাকি জয়শীলকে নিয়ে সরোবরে গেছে। তুমি যাদের ওপর থেকে দেখেছ তাদের মধ্যে হয়তো বৈদ্যদেব আছে। আমার তো পায়ের এই অবস্থা। এক পায়ে আমি তো গাছে উঠতে পারি না। তুমি তো ওপরেই আটকে পড়ে আছ। যারা এদিকে আসছে হাততালি দিয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর। তাদের এদিকে আসার জন্য ইশারা কর।'

ওই দলে বৈদ্যদেব থাকতে পারে শুনে রথের চালকের আনন্দ হল। সে ভালোভাবে লক্ষ করল। তার মনে হল নরদানবের পিঠে যে আছে তার পেছনে রয়েছে বৈদ্যদেব। এইভাবে গাছের উপর দিনের পর দিন আটকে পড়ে থাকলে শেষপর্যন্ত জলরাক্ষস অথবা নরভক্ষকদের পেটে যেতে হবে। ওরা এলে হয়তো এখান থেকে মুক্তি পাওযা যেতে পারে।

রথের চালক চিৎকার করে বলল, 'এই যে এদিকে এদিকে তাকান। এই এখানে গাছের উপর আমি আটকে পড়ে আছি। আমাকে দয়া করে উদ্ধার করুন! আমাকে বাঁচান!'

অনেকদূর থেকে আওয়াজটা এলেও প্রথমেই তা শুনতে পেল নরদানব। ডাক শুনেই থেমে গিয়ে মাথা তুলে সাধককে ইশারা করল। দূর থেকে তা লক্ষ করে রথের চালক আবার প্রাণপণে চিৎকার করল, 'বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!'

এবারে রথের চালকের আর্তনাদ সবাই শুনতে পেল। দেবশর্মা বলল, 'গলাটা যেন চেনা চেনা লাগছে। হয়তো সে এই রথের চালক। হংসরথ থেকে লোকটা বোধ হয় এই অঞ্চলেই পড়ে গিয়েছিল।'

'তাহলে তো আর কোনো অসুবিধেই রইল না। ওর সাহায্যেই আমরা মায়া সরোবরে খুব তাড়াতড়ি পৌঁছে যেতে পারব। একবার জয়শীলের দেখা পেলেই সবাইকে একসঙ্গে গাছে বেঁধে বলি দিতে পারব।' সাধক এই কথা বলে নরদানবকে দ্রুত সেদিকে যাওয়ার জন্য তাড়া দিল।

নরদানব মুহূর্তে সেই গাছের কাছে পৌঁছে গেল। তখন মঙ্গলবর্মা সাধকের কাছে এসে বলল, 'সাধক, যেকোনোভাবে গাছের মগডালে আটকে থাকা ওই লোকটাকে নীচে নামিয়ে আনতে হবে।'

সাধক চিৎকার করে বলল, 'জয় মহাকাল!' তারপর একটু থেমে চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'সব কিছু দেখে-শুনে আমার অবাক লাগছে। মায়া সরোবরেশ্বর শুধু যে কনকাক্ষ রাজার ছেলে-মেয়েকে অপহরণ করেছে তাই নয় তার সাহস এতদূর বেড়ে গেছে যে আমার বন্ধু জয়শীলকেও সে নিয়ে গেছে। কেউ কেউ বলে, এই জঘন্য অপহরণকারী নাকি আবার আমাদের মিত্রও হতে পারে।'

তৎক্ষণাৎ দেবশর্মা এগিয়ে এসে তাকে শান্ত করার জন্য বলল, 'এখন আমাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু হল জলরাক্ষস। এখন সবাই মিলে আমরা যদি ওদের বিনাশ না করি তাহলে কিন্তু যেকোনো মুহূর্তে কনকাক্ষ রাজার ছেলে-মেয়ের মৃত্যু ঘটবে। কারণ, মায়া সরোবর

এখন কিন্তু মায়া সরোবরেশ্বরের হাতে নেই। সেটা এখন রয়েছে ওই জলরাক্ষসদের দখলে।'

দেবশর্মার কথা শেষ হতে-না-হতেই কয়েক জন সৈন্য নিয়ে কনকাক্ষ রাজা সেখানে পৌঁছে গেল।

গাছের উপর থেকে হংসরথের চালক চিৎকার করে বলল, 'আমার কথা কি সবাই ভুলে গেছ? একটা বিরাট পাখি পাহাড় থেকে উড়ে এসে আমার উপর বসতে যাচ্ছে। আমাকে বাঁচাও।'

তার আর্তনাদ শুনেই সাধক নরদানবকে বলল, 'ওই যে গাছের শিখরে দেখতে পাচ্ছ একটা লোক— ওই লোকটাকে যেকোনোভাবে নীচে নিয়ে এসো।'

চোখের পলকে নরদানব গাছের ডগায় উঠে গেল। একহাতে সে রথের চালককে ধরে অন্যহাতে পাহাড়ি পাখিটিকে ঠেকাল। নরদানবকে দেখে রথের চালক ভয়ে কাঁপতে লাগল। কয়েকটি ডাল নামার পর সে নরদানবকে বলল, 'এবার আমাকে ছেড়ে দাও। আমি নিজেই এখন নামতে পারব।'

এমন সময় জলরাক্ষসদের দল পাথরের গদা নিয়ে সেদিকে ছুটে এসে মহানন্দে চিৎকার করতে লাগল।

জলরাক্ষসদের নেতা এগিয়ে এসে মহানন্দে বলল, 'চারদিক থেকে এদের ঘিরে ফেল। এদের একটাও যেন ছিটকে পালাতে না পারে। অনেকদিন পরে এত খাদ্য একসঙ্গে পাওয়া গেছে। এদের সবাইকে বেশ মজা করে খাওয়া যাবে।'

গাছের উপর থেকে জলরাক্ষসের নেতার এই কথা শুনে নরদানব প্রচণ্ড চিৎকার করে হাতে থাকা পাহাড়ি পাখিটিকে জলরাক্ষসদের নেতার উপর ছুড়ে দিল।

ত্রিশ

জলরাক্ষসগুলো বুঝতে পারল যে তাদের নেতা আক্রান্ত হতে পারে। এটা বুঝতে পেরেই জলরাক্ষসগুলো দল বেঁধে এসে নরদানবকে চারদিক থেকে আক্রমণ করতে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে কনকাক্ষ রাজা তার সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন। সাধক ত্রিশূলটাকে উপরের দিকে তুলে হাতের কাছে যে জলরাক্ষসকে পেল তাকেই আক্রমণ করল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জলরাক্ষসদের বিরুদ্ধে সাধক, রাজার সেনাবাহিনী ও নরদানবের প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে গেল। এমন সময় জলরাক্ষসদের নেতা এগিয়ে এসে চিৎকার করে বলল, 'ওহে শোনো, তোমরা কি জানো আমি কে? আমি হলাম এখন মায়া সরোবরের সর্বেসর্বা। সেখানে যত জন বন্দি হয়ে আছে তাদের মধ্যে একমাত্র পদ্মমুখী বাদে সবাইকে শেষ করে

ফেলব। দেখছ, আমার এই পাথরের গদা। এর এক-একটা আঘাতে এক-একজনের জীবন শেষ হয়ে যাবে।'

সাধক চড়া গলায় বলল, 'কইরে তোরা সব কোথায়? কী বলছে শোনো।'

সাধকের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নরদানব আনন্দে লাফাতে লাগল। লাফাতে লাফাতে সে হাতের কাছে যে দু-চারটি জলরাক্ষসকে পেল ধরে ওপরের দিকে তুলে নীচে আছড়ে মেরে ফেলল।

তার ওইভাবে হঠাৎ ক্ষেপে যাওয়াতে সাধক ত্রিশূল তুলে বলল, 'ওহে নরদানব, এবার তুমি শান্ত হও। যাকে-তাকে ওভাবে মেরো না। আজ যে পর কাল সে আপন হতে পারে। এদের অনেকেই আমাদের পক্ষে আসবে। যদি পার জলরাক্ষসদের নেতাকে ধর। দেখছ, ও বোধ হয় মায়া সরোবরের দিকেই যাচ্ছে।'

বৈদ্যদেব নামধারী দেবশর্মা সাধকের কাছে এসে বলল, 'সাধক, ওই মায়া সরোবর এখান থেকে বেশি দূরে নেই। আমি সেখানে যাওয়ার পথ চিনি, তোমরা সবাই আমাকে অনুসরণ কর।'

সাধক মাথা নেড়ে দেবশর্মার কথা অনুসারে কাজ করার সম্মতি জানাল। রাজা কনকাক্ষ দেবশর্মার পাশে ছিলেন। তিনি দেবশর্মাকে বললেন, 'শর্মা, জলরাক্ষসদের নেতা পদ্মমুখী বাদে সবাইকে শাস্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করল। এর কারণ তুমি কিছু জানো?'

'মহারাজ, আমরা যা শুনছি আর যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে মায়া সরোবরের অনেকখানি এখন জলরাক্ষসদের কবলে। পদ্মমুখীকে বাঁচিয়ে রাখার কারণ একটাই। জলরাক্ষসের একটি ছেলে আছে। তার সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য।' দেবশর্মা বলল।

'তাহলে তো আমার মেয়ে কাঞ্চনমালাকেও কোনো রাক্ষস বিয়ে করতে চাইতে পারে।' রাজা কনকাক্ষ অত্যন্ত উদবিগ্ন হয়ে বললেন।

'মহারাজ, আপনি অহেতুক এতটা উদবিগ্ন হবেন না। আমাদের একমাত্র ভরসা জয়শীল। জয়শীল এবং সরোবরেশ্বর অনেক আগেই মায়া সরোবরে পৌঁছে গেছে। তাদের চোখের সামনে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে না।' বলল দেবশর্মা।

রাজা কনকাক্ষকে এই ধরনের কথা বলে দেবশর্মা তাঁর মনে সাহস জোগাচ্ছিল। অন্যদিকে ঠিক সেইসময় জয়শীল তার সঙ্গীদের নিয়ে মায়া সরোবরে পৌঁছে গেল। ওই সরোবরটা ছিল বিরাট আকারের। সরোবরের চারদিকে ছিল পাহাড়। পাহাড়ের উপর থেকে সরোবরের তীর পর্যন্ত ঘন বন ছিল।

সরোবরের তীরে পৌঁছে জয়শীল তরবারি দিয়ে জল ঘাঁটতে ঘাঁটতে বলল সরোবরেশ্বরকে, 'তাহলে এটাই তোমার মায়া সরোবর? এই সরোবরের অধিকারী হয়ে তুমি আমার গলায় ফাঁস পরাতে গিয়েছিলে? কাঞ্চনমালাকে ধরে এনেছ? আমি ভেবে পাচ্ছি না এই মুহূর্তে তোমাকে শত্রু না মিত্র হিসেবে দেখব।'

মায়া সরোবরেশ্বর মুখ কাঁচুমাচু করে কাঞ্চনমালার দিকে তাকিয়ে কী যেন বলতে যাবে এমন সময় কাঞ্চনমালা হাঁকপাঁক করে বলল, 'জয়শীল, এখানে এখন যারা আছে তাদের মধ্যে কেউ আপনার শত্রু নয়। মকরকেতুর কাছে আমি শুনেছি ঠাকুরের আশীর্বাদে আপনার তরবারির ক্ষমতা অসীম। এই তরবারির আঘাতে আপনি অনেককে জব্দ করেছেন। তরবারি আপনার হাতে থাকলে কেউ যে আপনার ক্ষতি করতে পারে না তাও আমি মকরকেতুর কাছে শুনেছি। এখন আপনাকে কিন্তু একটা কাজ করতে হবে। জলরাক্ষসদের নেতার হাতে বন্দি হয়ে রয়েছে কাঞ্চনবর্মা এবং মায়া সরোবরেশ্বরের মেয়ে পদ্মমুখী। এই দু-জনকেই উদ্ধার করতে হবে।

'আমি একা জলরাক্ষসদের অত বড়ো বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারব এতটা ক্ষমতা আমার আছে? দেখি চেষ্টা করে। তোমার বাবা রাজা কনকাক্ষকে আমি কথা দিয়েছি প্রয়োজন হলে জীবন দিয়েও তোমাকে এবং কাঞ্চনবর্মাকে উদ্ধার করব। এই দু-জনের উদ্ধারের দায়িত্ব আমি আগেই নিয়ে বসে আছি। এর সঙ্গে যুক্ত হল পদ্মমুখী। ঠিক আছে দেখি কী করতে পারি।' জয়শীল বলল।

জয়শীলের কথা শেষ হতে-না-হতেই মায়া সরোবরেশ্বর এগিয়ে এসে জয়শীলের দুটো হাত ধরে সবিনয়ে বলল, 'জয়শীল, আমি কনকাক্ষ রাজার ছেলে এবং মেয়েকে তুলে এনেছি এটা সত্য। কিন্তু আমি মনে করি না যে আমি কোনো অপরাধ করেছি। অবশ্য মকরকেতু ও-কে পাঠিয়েছিলাম কাঞ্চনবর্মাকে ধরে আনতে। কিন্তু ওর যা বুদ্ধি ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। একজনকে আনতে বললাম ও দু-জনকে ধরে আনল।'

'অপরাধ করোনি মানে। কাঞ্চনবর্মাকেই বা তুমি ধরে আনতে পাঠালে কেন? নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য ছিল।' জয়শীল মায়া সরোবরেশ্বরকে বলল।

'উদ্দেশ্য একটা ছিল বটে কিন্তু সেটা বিরাট বড়ো কিছু নয়। আমার বড়ো ইচ্ছা ছিল কাঞ্চনবর্মার সঙ্গে আমার মেয়ে পদ্মমুখীর বিয়ে দেওয়া। মেয়ের একটা গতি করে মায়া সরোবর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারলে বাঁচি। কিন্তু যা ভেবেছিলাম তা হল না। কারণ কাঞ্চনবর্মাকে আমার মেয়ের পছন্দ হয়নি। সে তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। আর আমিও মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এসব কাজ করতে চাইনি।' সরোবরেশ্বর জয়শীলকে বলল।

সরোবরেশ্বরের কথা জয়শীলের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হল। সে কাঞ্চনমালার দিকে তাকাল। কাঞ্চনমালা সরোবর থেকে একটি শাপলা তুলে এনে সেটা জয়শীলের কপালে এমনভাবে ঠেকাল যেন সে তার কপালে টিপ পরিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে বলল, 'সরোবরেশ্বর যা বললেন তা সম্পূর্ণ সত্য। এখন সরোবরের একটি রহস্য আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। এই যে শাপলার জলের ফোঁটা আপনার কপালে লাগালাম এর ফলে আপনি জলের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে পারবেন, শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারবেন। এককথায় জলের গভীরে বাস করতে আপনার অসুবিধা হবে না।'

'তাই নাকি! তাহলে— দেখি পরীক্ষা করে।' বলে জয়শীল একলাফে সরোবরের গভীরে চলে গেল।

তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সরোবরেশ্বর, কাঞ্চনমালা এবং মকরকেতু এক দুই তিন চার করে গুণতে লাগল। ওদের ধারণা ছিল দু-এক মুহূর্ত পরেই জয়শীল উঠে পড়বে। কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও যখন উঠল না তখন কাঞ্চনমালা উদবিগ্ন হয়ে বলল, 'এ তো দেখছি হিতে বিপরীত হল। কী করা যায়। জলরাক্ষস হয়তো জলের গভীরে আমাদের জব্দ করার জন্য বসে আছে। ওকে যদি একবার ধরতে পারে আর আস্ত রাখবে না।'
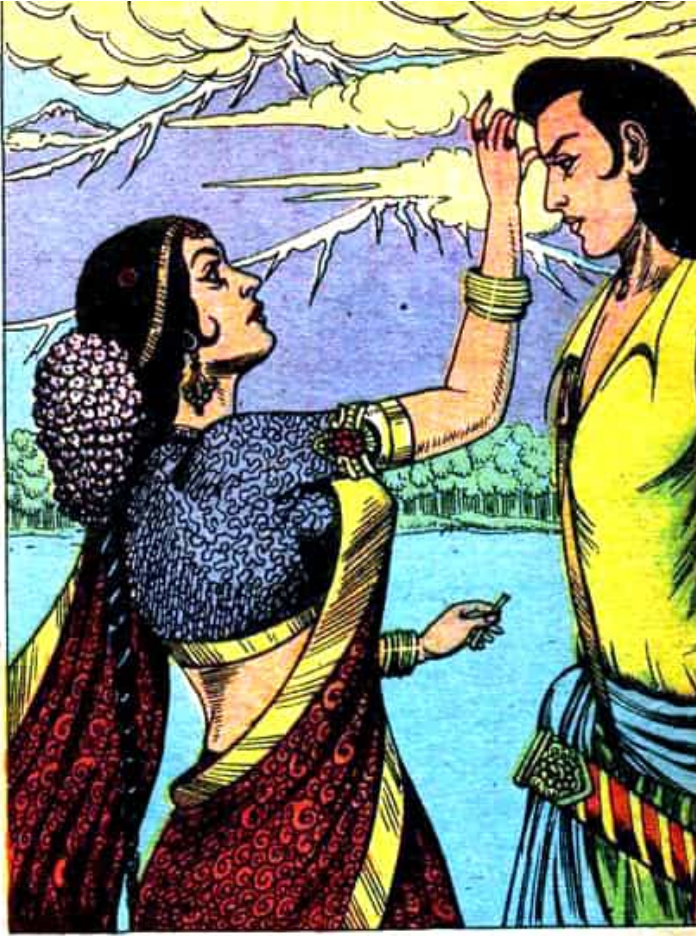
কাঞ্চনমালার কথা শেষ হতেই জয়শীল এক যুবক জলরাক্ষসকে ধরে জলের উপরে উঠল। তীরে উঠে ওকে টানতে টানতে সরোবরেশ্বরের কাছে আনতেই মকরকেতু মহানন্দে বলল, 'এই তো, একেই তো আমরা খুঁজছিলাম। এ হল জলরাক্ষসদের নেতার ছেলে। এর বাবা আমাদের দলের যাদের ধরে নিয়ে গেছে তাদের কোনো ক্ষতি করে যদি আমরাও এর ক্ষতি করতে পারব। আমাদের একজনকেও যদি মেরে ফেলে আমরা একে আস্ত রাখব না।'

'কি রে! তুই বোধ হয় সরোবরের তীরে জলে ডুবে

আমাদের কথা শুনছিলি? কে পাঠিয়েছে তোকে? তোর বাবা? উঁ? তোর বাবা এখন কোথায়?' মায়া সরোবরেশ্বর অস্ত্র নাড়তে নাড়তে তাকে জিজ্ঞেস করল।

'আমার বাবা এখন কোন এক রাজাকে জব্দ করতে গেছে। ওই রাজার সঙ্গে একজন কাপালিকও আছেন। ওদের তাড়িয়ে অথবা মেরে ফেলে বাবা এখানে আসবে। তারপর তোমাদের কেটে টুকরো টুকরো করে, তোমাদের মাংস কাক আর শুকুনকে খাওয়াবে।' যুবরাক্ষস সরোবরেশ্বরকে বলল।

'তাই নাকি! তাহলে তো বড়ো ভয়ের কথা! আচ্ছা ঠিক আছে ওসব ব্যাপার পরে ভাবা যাবে। আচ্ছা বলতে পার কাঞ্চনবর্মা আর পদ্মমুখী এখন কোথায় আছে?' জয়শীল জিজ্ঞেস করল।

'ওদের যে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা একমাত্র বাবাই জানে।' যুবরাক্ষস বলল।

এমন সময় দূর থেকে অনেকের গলা শোনা গেল। জয়শীল মকরকেতুকে বললল, 'কেতু, তোমার জলগ্রহকে বল শুঁড় দিয়ে যুবরাক্ষসকে ধরে দু-এক বার উপর নীচ করতে।'

সঙ্গেসঙ্গে মকরকেতু বলল, 'জলগ্রহ, নাও যুবরাক্ষসকে ভালো করে ধর! দু-এক বার নাড়িয়ে দাও ওকে।'

মকরকেতুর কথানুযায়ী জলগ্রহ যুবরাক্ষসকে ধরে কয়েক বার ওপরের দিকে তুলল আর নামাল আর ঝাঁকাল।

জলগ্রহ যখন যুবরাক্ষসকে ধরে তুলছিল এবং নামাচ্ছিল তখন জয়শীল দেখতে পেল সদলবলে নরদানব, সাধক ও সেনাবাহিনীসহ রাজা কনকাক্ষ সেদিকে এগিয়ে আসছেন।

যুবরাক্ষসকে ওই অবস্থায় দেখে রাক্ষসদের নেতা এবং অন্য রাক্ষসরা আর্তনাদ করে উঠল। ওদের নেতা বলল, 'শুনুন শুনুন ওভাবে হাতির কবলে আমার ছেলেকে ছেড়ে দেবেন না। আমার ছেলেকে মেরে ফেলবেন না। আমি এখন আপনাদের শত্রু নই। আপনাদের যে ক-জন আমার হাতে বন্দি আছে সবাইকে আমি ছেড়ে দেব।'

জয়শীলের কাছে রাজা কনকাক্ষ এসে দাঁড়াতেই কাঞ্চনমালা তাঁকে জড়িয়ে বলল, 'বাবা, দোহাই তোমরা সরোবরেশ্বরের কোনো ক্ষতি করো না। যা ঘটে গেছে তার জন্য সে অনুতপ্ত।'

জয়শীল হাসতে হাসতে রাজাকে বলল, 'এর মেয়ে পদ্মমুখী আর একটু হলে আপনার বউমা হয়ে যেত। একটুর জন্য হল না।'

কথার পিঠে কাঞ্চনমালা হাসতে হাসতে বলল, 'পদ্মমুখী যে কাকে পছন্দ করে আমি তা ভালো করেই জানি। সে দেবশর্মাকে বিয়ে করতে চায়।'

দেবশর্মা জয়শীলকে বলল, 'জয়শীল, জলরাক্ষসের নেতা কাঞ্চনবর্মা এবং পদ্মমুখীকে এখানে আনতে তার অনুচরদের পাঠিয়েছে। অনুচররা যদি না আনে, এই নেতা যদি আমাদের ধোঁকা দেয়, তাহলে আমাদের কী হবে?'

'ধোঁকা দিলে জলগ্রহ যেভাবে এর ছেলেকে তুলছে আর নামাচ্ছে ঠিক সেইভাবে রাক্ষসদের নেতাকে তুলবে আর নামাবে। আর আমাদের নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে মাটিতে আছড়ে ফেলে মেরে ফেলবে।' এমন সময় দেখা গেল কয়েকটি জলরাক্ষস কাঞ্চনবর্মা ও পদ্মমুখীকে নিয়ে এগিয়ে আসছে।

এতক্ষণ সাধক কোনো কথা বলেনি। এখন সে বলল, 'যা শুনেছি যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে দেবশর্মার সঙ্গে পদ্মমুখীর বিয়েটা হবেই।'

রাজা কনকাক্ষ জয়শীলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি ঘোষণা করেছিলাম যে, আমার ছেলে-মেয়েকে যে উদ্ধার করবে তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব এবং তাকে আমার রাজ্যের অর্ধেক ভাগ দেব। জয়শীল যে শুধু আমার ছেলে-মেয়েদের উদ্ধার করেছে তাই নয়, তার বীরত্বের ফলে বহু জঘন্য পাপী উপযুক্ত শাস্তিও পেয়েছে।'

সাধক হাসতে হাসতে কাঞ্চনমালাকে বলল, 'তাহলে একজন বীরের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। এই তো?'

কাঞ্চনমালা লজ্জা পেয়ে বাপের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। সাধক গুরুগম্ভীর গলায় বলল, 'তাহলে আমি ঘোষণা করছি কিছুদিনের মধ্যেই রাজধানীতে জয়শীলের সঙ্গে রাজকন্যা কাঞ্চনমালার এবং পদ্মমুখীর সঙ্গে দেবশর্মার খুব ঘটা করে বিয়ে হবে।'

জয়শীল প্রশ্ন করল, 'সাধক, তুমি তাহলে কোথায় থাকবে?'

'আমি এখন থেকে এই সরোবরের কাছাকাছি কিছুকাল ধরে উপাসনা করব ভাবছি।' এই বলে সাধক ত্রিশূলটাকে এমনভাবে তুলে ধরল দেখে মনে হয় যেন সে শপথ করছে।

তারপর রাজা কনকাক্ষ, জয়শীল, মায়া সরোবরেশ্বর, জলরাক্ষসদের নেতা এবং তার অনুচর ও সেনাবাহিনী সহ রাজধানীতে ফিরলেন। রাজার সঙ্গে কাঞ্চনবর্মা এবং কাঞ্চনমালাকে দেখে প্রজারা খুব খুশি হল।

আরও দুটি বই.....

চাঁদমামা
সেরা গল্প সমগ্র

Table of Contents